সুচিত্রা ভট্টাচার্য

ভাঙনকাল

www.boiRboi.blogspot.com

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

পর্দার ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে ছেলেকে দেখছিল অনুরাধা। শুধু ছেলেকে নয়, ছেলেকে নিয়ে গড়ে ওঠা ছোট্ট পরিমণ্ডলটাকেও। ছায়ামাখা হিমহিম ঘর, ঘরের কোণে চেয়ারটেবিল, টেবিলে কাটগ্লাসের বাতিদান, বাতিদান থেকে বিচ্ছুরিত আলোর বলয়, টেবিলময় স্তূপীকৃত বইখাতা, দেওয়ালে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাপসা স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর পায়ের কাছে বই-এ মুখ গুঁজে ধ্যানমগ্ন রাজা। ছেলের এই আত্মস্থ রূপ অনুরাধার ভীষণ প্রিয়। এ সময়ে প্রবল ঝঞ্ঝা এলেও বাইরে তাকাবে না রাজা, ভূমিকম্প হলেও চেয়ার ছেড়ে নড়বে না এতটুকু; বাড়িতে আগুন লাগলেও বই থেকে মুখ তুলবে না ছেলে। অনুরাধা জানে। এ ভাবেই রাজাকে গড়ে তুলছে অনুরাধা।

একত্রিশে ডিসেম্বরের রাত। পর পর কদিন আকাশ মেঘলা ছিল, দু-চার ফোঁটা ঝিরঝিরও ঝরেছিল কাল বিকেলে। আজ সকাল থেকে আকাশ একেবারে তকতকে। সূর্য পাটে বসার পর শীত মেজাজে ফিরতে শুরু করেছে। হু হু করে পারা নামছে তাপমাত্রার।

অনুরাধার হঠাৎ নজর পড়ল রাজার ঘরের একটা জানলা হাট করে খোলা। ওফ্, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এত গরম গরম বাতিক!

—জানলাটা খুলেছিস কেন?

ধ্যানস্থ রাজা বাঁ করতল কপালে চাপল—সব বন্ধ থাকলে দম আটকে যায়।

রাজার কণ্ঠস্বর এখনও কৈশোরকে পুরোপুরি ছাড়েনি। ঠিক মিষ্টিও নয়, হেঁড়েও নয়, কিছুটা ভাঙাভাঙা। সামনের এপ্রিলে ষোলো পূর্ণ করবে সে। এর মধ্যেই তার হাবভাব বেশ গম্ভীর গম্ভীর। পাকা পাকা। পূর্ণবয়স্কদের মতো।

অনুরাধা স্নিগ্ধ ধমক দিল, হোক দমবন্ধ। ওটা উত্তরের জানলা। ঠাণ্ডা ঢুকছে। শেষে সর্দিকাশি বাধিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

—আহ্ মা, যাও তো। আমার ঠাণ্ডা লাগছে না।

—শালটা তা হলে ভাল করে জড়িয়ে নাও। কান ঢাকো।

অনুরাধা পর্দা ছেড়ে রান্নাঘরে গেল। বেশ বড়সড় রান্নাঘর। টানা সিমেন্ট র‍্যাকে পর পর এক জোড়া গ্যাসস্টোভ। র‍্যাকের তলায় সুরক্ষিত সার সার চারটে গ্যাস সিলিন্ডার। ফাঁকা। ভর্তি। সকালের দিকে একসঙ্গে চারটে

ওভেন না জ্বললে অনুরাধা সামাল দিতে পারে না। চন্দনের পাঁচবার চা, শাশুড়ির খাওয়ার জন্য উষ্ণ উষ্ণ গরম জল, তার সঙ্গে জলখাবার তৈরি, অফিসের ভাত তো আছেই। তাও রাজার টেস্ট হয়ে গেছে বলে স্কুল এখন বন্ধ, বাথরুমেও নতুন গিজার বসেছে, নইলে চারখানা বার্নারেও হিমশিম খেতে হয় অনুরাধাকে। রান্নাঘরের অন্য প্রান্তে, তাকে মিক্সারগ্রাইন্ডার, অটোমেটিক টোস্টার, ননস্টিক বাসনসম্ভার। দেওয়ালের খোপে খোপে স্টিলের বাসনকোসন, মশলাপাতি রাখার সুদৃশ্য পলিজার। কোণায় ঢাউস সিঙ্ক। সিঙ্কের পাশে একখানা কিচেন সেল্‌ফ্‌ কেনা পড়ে আছে, এখনও লাগানো হয়নি।

এত জিনিসে ঠাসা তবু গড়িয়ার বাড়ির দমচাপা ভাবটা এ ঘরে টের পায় না অনুরাধা। কেন যে পায় না! পশ্চিমে অত বড় জানলা আছে বলে! নাকি জানলার ওপারে ফালি উঠোনটুকুর জন্য! নাকি এগজস্ট পাখাটার জন্য!

হয়তো এর কোনওটাই নয়। হয়তো সবটাই অনুরাধার বিভ্রম। গড়িয়ার বাড়ির রান্নাঘর অনেক বড় ছিল। বাড়িটাই একদম পছন্দ ছিল না অনুরাধার। কেমন গ্রাম্য! কলোনিটাইপ! পিছনে নোংরা ডোবা। মশা। ছাইগাদা। কচুবন। বড় কষ্টে অনুরাধা এক যুগ কাটিয়েছে সেখানে। ছেলে নিয়ে। নিজেকে নিয়ে।

অনুরাধা গ্যাসে খানিকটা গরম জল বসাল। আটটা বাজে, এর মধ্যেই শীত বেশ চেপে ধরছে, একটু কফি খেলে মন্দ হয় না।

রান্নাঘর থেকেই অনুরাধা গলা ওঠাল,—রাজা, কফির জল বসিয়েছি, তুই খাবি?

রাজা সাড়া দিল না।

অনুরাধা ঠোঁট টিপে হাসল। নিরুত্তর থাকার অর্থ ছেলে কফি খাবে। রাজার জন্য কফিতে দুধ একটু বেশি দিতে হয়, চিনিও। এমনিতে ছেলে দুধ ছোঁবে না কিন্তু চা কফি দুধ ঢেলে সাদা করে দাও, তাতে আপত্তি নেই।

ছেলের সাড়া না পেলেও লাঠির ঠুকঠুক কানে বাজল অনুরাধার। প্রতিভা। কোমর নড়ে না, হাঁটু চলে না, চোখে ছানি কিন্তু কান তীক্ষ্ণ হচ্ছে দিন দিন।

—ও অনু, আমি একটু কফি খাব।

—এমনি তো রাত্তিরে ঘুম হয় না, এখন আটটার সময় কফি খাবেন?

—খাই। বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। বিকেল থেকে হাঁটু দুটোও জ্বালাচ্ছে।

—ঠিক আছে। ঘরে যান। দিচ্ছি।

প্রতিভা তবু নড়লেন না, জোরে জোরে নাক টানলেন দু তিন বার, —কী সুন্দর বাস বেরিয়েছে গো!

অনুরাধা হেসে ফেলল। বেকিং ওভেনে কেক করা আছে, এখনও বার করা

www.boiRboi.blogspot.com

হয়নি, একবার ঢাকা খুলে দেখেছিল শুধু। ওই খোলাতে যেটুকু গন্ধ বেরিয়েছিল তা প্রায় বাতাসে নেইই আর। বুড়ি তবু ঠিক গন্ধ পেয়ে গেছে!

অনুরাধা বলল, —কেকের গন্ধ। খাবেন? এখনও গরম আছে।

—না থাক্‌। ময়দা আছে, ডিম আছে...এখন খেলে আমার হজম হবে না।

—অল্প একটু খান। বচ্ছরকার দিনে করলাম...

—খুব অল্প দিয়ো। এক চিলতে। আঙুল তুলে মাপ দেখালেন প্রতিভা, —রাজা খেয়েছে?

অনুরাধা বেকিং ওভেন খুলল। প্লেটে একটা ছোট্ট টুকরো তুলে এগিয়ে দিল প্রতিভার দিকে, —আপনার নাতির তাড়নাতেই তো কেক করা। চকোলেট কেক, চকোলেট কেক করে মাথা খেয়ে ফেলছিল আমার।

রান্নাঘরের সামনে লম্বাটে ডাইনিং স্পেস। এক পাশ কাচের শার্শি দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে ডিম্বাকৃতি টেবিল ঘিরে ছখানা চেয়ার। একদম সামনের চেয়ারটায় বসে খুঁটে খুঁটে কেকের টুকরো শেষ করছেন প্রতিভা, —সংক্রান্তির দিন একটু পিঠে পায়েস কোরো তো দেখি। চাঁদু আমার বড় পিঠে খেতে ভালবাসে। সে একবার খুব মজার কাণ্ড হয়েছিল জানো? চাঁদু তখন ইস্কুলে। লাজু হয়নি। তোমার শ্বশুর গরম গরম খাবেন বলে রাঙালুর পিঠে ভাজছি...ভাজছি আর ছানচা করে তুলে পাশের রসে ফেলছি...ও-ও মা! কিছুক্ষণ পর দেখি ডেকচির রস যেমন ছিল টলটল করছে, পিঠে প্রায় নেইই! কী হল? কী হল? না ছেলে আমার আসছে যাচ্ছে আর টুকুস করে খাবলা দিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে। বড় হয়েও...সে কথা তো তোমারও মনে আছে! সেই যে গো যখন মুর্শিদাবাদে পোস্টেড ছিল! শনি রোববারের ছুটিতে এসে ওর জন্য চোসি রাখা হয়নি বলে সে কী-মেজাজ!

প্রতিভার কথায় কান ছিল না অনুরাধার। সে তখন কাচের বাসন রাখার ক্যাবিনেট থেকে নতুন কফিমগ বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। পরশুই লাজু গোটা ছয়েক উপহার দিয়ে গেছে। টুকটুকে লাল রঙ। এই লালটাই অনুরাধা বেশি ভালবাসে। রাজাও। লাজু জেনেবুঝেই এই রঙ কিনেছে। বৌদিকে তেল মারার চেষ্টা! সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে বলেই কি লাজু দাদা বৌদির দিকে ঝুঁকতে চাইছে! ঘাড়ে চেপে বসার আগাম নোটিস! গতমাসে অনুরাধার জন্য একটা ফোমের ব্যাগ কিনে আনল। কদিন আগে রাজার জন্য টিশার্ট। টিশার্টটা বেশ খেলো। দেখেই বোঝা যায় ফুটপাতের মাল। ব্যাগটাও। পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশি শার্টটার দাম হবে না। ব্যাগটা বড় জোর চল্লিশ। সাত্যকি এখন ভালই কামায়, পকেটে সব সময় কাঁচা টাকা তবু লাজুর রুচির মান বাড়ল না এতটুকু। সারাক্ষণ নজর খালি সস্তাগণ্ডার দিকে। একদম বাবার স্বভাব বসানো! খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরেই যখন দিব্যি কেটে যাচ্ছে, চটকদারির দরকারটা কি বৌমা! অকারণ বিলাসিতা জীবনকে

লোভী করে তোলে ! হুঁহ্, অক্ষমের ফাঁকা বুলি ! নিজে জোটাতে পারিনি তাই কাউকেই পেতে দেব না !

প্রতিভাকে কফি দিয়ে অনুরাধা ছেলের ঘরে ঢুকল, —এই নাও তোমার দুধকফি। ঠাণ্ডা কোরো না।

রাজা ঘাড় না তুলেই ফিক করে হাসল, —শুধু কফি দিলে ?

—মিষ্টি খাবি ?

—কী মিষ্টি ?

—ফ্রিজে এক বাক্স সরপুরিয়া রাখা আছে। তোর বাবা কাল এনেছিল।

রাজা নাক কুঁচকোল, চলবে না। এক পিস্ কেক দিয়ে যাও।

—এখন কেক খেলে রাত্তিরে খেতে পারবি ?

—দশটার আগে তো খাব না।

রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল অনুরাধা, দরজায় বেল শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চন্দন ফিরল নাকি ! নিউইয়ার্স-ইভে এত তাড়াতাড়ি !

দরজা খুলতেই মোড়ের দোতলা বাড়ির টুকুন। রাজার সঙ্গেই মাধ্যমিক দেবে এবার। হুটহাট চলে আসে রাজার পড়ার সময়।

অনুরাধা নকল হাসি ফোটাল মুখে, কী রে ?

—মাসিমা, রাজা আছে ?

—কেন বল্ তো ?

—রাজার স্যার রাজাকে কয়েকটা জিওমেট্রির এক্সট্রা কষে দিয়ে গেছেন, রাজা আমাকে দেখাবে বলেছিল।

অনুরাধার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হল না, রাজা তো এখন নেই রে। পিসির বাড়ি গেছে। পরে আসিস্।

ভাগ্যিস রাজার ঘর এখান থেকে দেখা যায় না ! অনুরাধা তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করল। ছেলেটার বদ অভ্যাসগুলো কিছুতেই আর ছাড়ানো গেল না। ছোটবেলা থেকেই দাতা কর্ণ ! অনুরাধা ছেলেকে ভাল ভাল টিফিন দিচ্ছে আর ছেলে সেই চিকেন স্যান্ডুইচ, পেস্ট্রি, আপেল, কমলালেবু দু হাতে বিলি করে যাচ্ছে স্কুলের বন্ধুদের ! বাবা দামি পেনসিল্ বক্স এনে দিল, ছেলে অবলীলায় বান্ধবীকে দান করে এল ! চোরের মার মেরেও রাজাকে শোধরানো যায় না। আরে তুই মোটা টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউটরদের কাছে পড়ছিস, সেই স্যারেদের দেওয়া নোট তুই বন্ধুদের দিবি কেন ! এই দুনিয়ায় যোগ্যতম হতে গেলে অন্যদের যোগ্যতর হতে না দেওয়াটাও যে কী ভীষণ জরুরি, সে কথা রাজার মাথায় কিছুতেই ঢোকাতে পারল না অনুরাধা !

এক টুকরো কেক নিয়ে অনুরাধা রাজার ঘরে ফিরল। রাজা চেয়ারে বাবু হয়ে বসে ডটপেন চিবোচ্ছে। টুকুনের আবির্ভাব ও প্রস্থান সে টের পায়নি। এ সময় রাজা স্যারেদের দেওয়া মডেল কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করে। অথবা মাধ্যমিকের টেস্টপেপার। ঘড়ি ধরে উত্তর লেখে। এভাবেই সময়

www.boiRboi.blogspot.com

মেপে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে হবে রাজাকে। তিন তিন জন প্রাইভেট টিউটর দুবার করে আসছেন সপ্তাহে, একজন লাইফসায়েন্স, একজন ইতিহাস ভূগোল, আরেক জন ফিজিকাল সায়েন্স, অঙ্ক। এ ছাড়াও দু দিন বিকেলে ইংরিজি বাংলার টিউটোরিয়াল। এর পরও যদি উত্তর লিখতে গিয়ে থমকে যায় !

অনুরাধা ছেলের খাতার দিকে ঝুঁকল, কীরে, আটকে যাচ্ছে ?

—কই না তো !

—তা হলে পেন চিবোচ্ছিস যে !

রাজা চমকে মুখ থেকে ডটপেন নামাল, এমনিই।

ছেলের চমকানিতে মজাই পেল অনুরাধা। রাজা তা হলে এখনও তাকে বেশ ভয় পায় ! বছর দুয়েক আগে যা জোর ঘাবড়ে দিয়েছিল একদিন ! কোন্ বেপাড়ায় ক্রিকেট খেলতে গিয়ে সন্ধে পর্যন্ত বেপাত্তা, অঙ্কের স্যার এসে বসে থেকে থেকে চলে গেলেন, অনুরাধা সেদিন ঠাস করে একটা চড় মেরেছিল রাজাকে। অমন চড় তো কতই মেরেছে কিন্তু সেদিন এক চড়েই দৌড় ছেলে। পাঁইপাঁই গৃহত্যাগ। কাঁকুলিয়া থেকে লেকের পাড়। চন্দন আর অনুরাধা রাস্তায় রাস্তায় চরকি মেরে অনেক রাতে উদ্ধার করেছিল ছেলেকে। মাঘের রাত, গায়ে শুধু একখানা হাফসোয়েটার আর শর্টস, লেকের হিমেল হাওয়ায় সিঁটিয়ে গেছে রাজা, তবু কী জেদ ! যাব না যাব না যাব না। কিছুতেই বাড়ি যাব না। মা কেন এখনও আমার গায়ে হাত তুলবে ? কেন ?

পাগল। একেবারে পাগল। অনুরাধা ছেলের মাথায় হাত রাখল। ঝাঁকড়া মোটা মোটা রুক্ষ চুল। চন্দনের মতো। ওই চুলে হাত বোলালে অদ্ভুত এক প্রশান্তি নামে শরীরে।

—কী পেপার সলভ করছিস রে ?

রাজা মাথা থেকে হাত সরিয়ে দিল, —তখন কে বেল বাজাল ?

ও কেউ না, কেবল টিভির লোক। ছেলের মঙ্গলের জন্য মিথ্যে বলতে চোখের পাতাও কাঁপে না অনুরাধার, কী পেপার করছিস্ বললি না তো ?

—নরেন্দ্রপুরের ইংলিশ পেপার। রাজা ঘুরে অনুরাধার কোমর জড়িয়ে ধরল, মা, আমি খেয়ে উঠে আজ আর পড়ব না। টিভি দেখব।

সাধারণত অনুরাধা ছেলের এই ধরনের আবদারকে প্রশ্রয় দেয় না। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা, জীবনের মূল সোপান এবারই শুরু। এখন পর পর সিঁড়ি ভাঙতে হবে রাজাকে। ভেঙেই যেতে হবে। ধাপের পর ধাপ। এই সোপানে কোনও চাতাল নেই, জানলা নেই, বাতাস নেই, শুধু ক্ষুরধার খাড়াই। সামান্য অসতর্ক হলেই অনিবার্য পতন। আর সিঁড়ির শেষে এক অবিচ্ছিন্ন মসৃণ জীবন। প্রাচুর্য। আনন্দ। সুখ। অনুরাধার এ জন্মের তৃপ্তি।

না। তৃপ্তি নয়। তৃপ্তি শব্দটাতে এক ধরনের নির্জীবতা আছে। বরং বলা যায় অনুরাধার জীবনের একটা মাইলস্টোন।

অনুরাধা কী ভেবে আজ একটু নরম হল, সে নয় দেখো। কিন্তু এরকম করলে কি চলবে ? আর কদিন বাকি পরীক্ষার ?

রাজা মনে মনে হিসেব করছিল, তার আগে অনুরাধাই বলে দিল, উনসত্তর দিন। ঠিক ?

রাজা তর্কে গেল না।

অনুরাধা আবার ছেলের মাথায় হাত রাখল, হ্যাঁ রে রাজা, তোর বড় কিছু হতে ইচ্ছে করে না ?

—করবে না কেন ! নিশ্চয়ই করে।

—কী হতে ইচ্ছে করে ?

এ প্রশ্ন অনুরাধা প্রায় রোজই করে ছেলেকে। প্রতিবারই রাজার উত্তর বদলে যায়। আজ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তো কাল ডাক্তার, পরশুদিন আই এ এস, আই এফ এস্। এর চেয়ে সাধারণ কিছু হওয়ার চিন্তা ছেলেকে করতেই দেয় না অনুরাধা। ছোটবেলায় ছেলে বলত, মিনিবাসের ড্রাইভার হব। এই টিকটিকি, সাইড মার্ সাইড মার্। আরে ও পেরাইভেট্, হঠবি না ভিড়িয়ে দেব ? নাতির মুখে অবিকল ড্রাইভারের ভাষা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তেন অদ্রিনাথ আর প্রতিভা। অনুরাধা চোয়াল শক্ত করে রাগ চাপত। চন্দনকে আড়ালে বলত, এই জন্যই বলি বাড়ি বদলাও। এখানে থাকলে ছেলের নজরটাই নিচু হয়ে যাবে।

চন্দন বলত, ওরে ব্বাস্। এ বাড়ি ছাড়ার কথা বাবাকে কে বলবে ? একবার যশোর থেকে শিকড় উপড়ে এখানে এসে বসেছেন, আবার এখান থেকেও ?

—বাবা কেন যাবে ? তুমি যাবে। তুমি বাবার খাও, না পরো ? তুমি যা রোজগার করো তাতে আমরা স্বচ্ছন্দে আলাদা থাকতে পারি।

চন্দন গা করত না। যা যমের মতো ভয় পেত বাবাকে ! তিনি মারা যাওয়ার পর তবে ছেলের সাহস হল বাড়ি বদলানোর। রাজার তখন বয়স দশ।

অনুরাধা আবারও ছেলেকে প্রশ্ন করল, বললি না তো কী হবি ?

আজ রাজা উত্তরটা যেন ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না, খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, উকিল হলে কেমন হয় মা ? বেশ কালো কোট পরে হাইকোর্টে ঘুরব ! বাড়িতে চেম্বার থাকবে !

অনুরাধার মনঃপূত হল না, —উকিল কেন ? জজ হওয়ার কথা ভাবতে পারিস্ না ?

—উকিলদের হেভি রোজগার। জজরা সে তুলনায় ভিখিরি মা। দীপের বাবা ক্রিমিনাল লইয়ার। তিন তিনটে গাড়ি। দুটো মারুতি, একটা কনটেসা। ওদের বাড়ির ইনটিরিয়ার ডেকরেশান দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

অনুরাধা বলতে যাচ্ছিল, সে তোর বাবাও করতে পারে। করে না। কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

কেন করে না তা কি ছেলেকে বলা যায় ? চারদিকে এত শকুনের চোখ ! এত গাত্রদাহ !

রাজা বলল, দীপের পকেটে সবসময় কত টাকা থাকে জানো ? দুশো পাঁচশো কোনও ব্যাপারই নয়, হাত ঝাড়লে পড়ে যায়।

—সে তো তোমাকেও দেওয়া হয়। একশো দুশো যখন যা চাইছ। অনুরাধা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ, —উকিল হতে ভাল লাগবে ? দিন রাত চোর গাঁটকাটা খুনী নিয়ে কারবার ! সারাক্ষণ ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলা !

—মিথ্যে কথা বলা দেখিয়ো না মা। পুজোর আগে তোমার ঘাড়ে ব্যথা হল, বড় ডাক্তার ঝাঁ করে বলে দিল স্ক্যান করুন। করে কী পেলে ? লবডঙ্কা। পাঁচ হাজার টাকা ফুঁকে গেল। ডাক্তার কেন স্ক্যান করাতে বলেছিল জানি না ? ওর থেকে তো ডাক্তাররা কমিশন পায়...তাই জেনেশুনে মিথ্যে করে...এই যে গতবার আমরা সাউথ ইন্ডিয়া গেলাম, বাবা তো অসুখ বলে ছুটির দরখাস্ত করেছিল, সেটা মিথ্যে নয় ?

রাজার মুখে ধূর্ত হাসি, অনুরাধা বেজার হল, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। উকিলই হোয়ো। এখন পড়ো। খাবার দিয়ে ডাকব।

অনুরাধা ড্রয়িংরুমে এল। শব্দ বন্ধ রেখে টিভি চালিয়েছে। এ বছরের সব থেকে জনপ্রিয় সিরিয়াল শুরু হবে। দুই বিত্তশালী পরিবারের সংঘর্ষের কাহিনী। শব্দ না থাকলেও অনুরাধার অসুবিধে হয় না। সে ছবিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দু বাড়ির আসবাব, শৌখিন বিলাস সামগ্রী, নতুন ধরনের পোশাকআশাক, ক্ষণে ক্ষণে বিজ্ঞাপনের আমন্ত্রণী ঝলক। ইসস, তার আটত্রিশ বছরের জীবনে এখনও কত কিছু পাওয়া বাকি। সব পেতে হবে। সব।

দ্রুত হাতে অন্য চ্যানেলগুলো ঘুরিয়ে দেখে নিল অনুরাধা। সর্বত্রই আজ বর্ষশেষের রঙবেরঙি অনুষ্ঠান। অফুরন্ত আনন্দসম্ভার। ছোট্ট শ্বাস ফেলে অনুরাধা সিরিয়ালে ফিরল। এত প্রমোদ, অথচ অনুরাধার চোখ মাত্র দুটো ! কোন্‌টা যে দেখে !

ছোট সোফায় বসল অনুরাধা। এখান থেকে রাজার ঘর স্পষ্ট দেখা যায়। রাজাকেও। ও ঘরে রাজার টেবিল আর এখানে এই ছোট সোফা ওইজন্যই পাতা। সময় কাটানো বলো সময় কাটানো, ছেলের ওপর নজরদারি বলো নজরদারি। রঙিন পর্দায় চোখ রেখেও অনুরাধা দেখতে পাচ্ছিল রাজাকে। অনুরাধার কালো শালে আবৃত রাজার লম্বা বাদামী পিঠ, পিঠের মাঝখানে গভীর খাত, একটু ঠেলে ওঠা কণ্ঠা, ধূসর কালো চোখের মণি, বুকে লোমের আভাস, কচি ঘাসে ভরা রাজার মায়াবী মুখ সবই যেন স্পষ্ট চোখের সামনে। যেন ছেলের শরীরের অংশ নয়, যেন নিজেরই দেহের অন্য ভাগ। নিজের অস্তিত্বের ভিন্ন এক অবয়ব। তাই কি এত মায়া ? এত উদ্বেগ ?

রাত্রি ক্রমশ হিমায়িত হচ্ছিল। শহর জুড়ে আজ এলোমেলো আতসবাজির উচ্ছ্বাস। মহানগরী এখন উৎসবে মাতোয়ারা। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে

রাস্তাঘাটে আলোর রোশনাই। জরতী কলকাতা আলোর রুজ লিপস্টিক মেখে ফিরে পেতে চাইছে হারানো যৌবন। আলটপকা বাজির শব্দে চমকে জেগে উঠছে হাজার হাজার ফুটপাথবাসী। পথের শিশু কেঁপে উঠছে ছেঁড়া কাঁথার নীচে। এত আলো এত শব্দেও শীতের কামড় তাদের ছাড়ে না এতটুকু।

রাজা শুয়ে পড়েছে। খেয়ে উঠে টিভির সামনে বসেছিল, বেশিক্ষণ চোখ খুলে রাখতে পারেনি। বর্ষশেষের অনুষ্ঠান দেখার শখ এগারোটার মধ্যেই শেষ।

অনুরাধা টুকটাক হাতের কাজ সারছিল। তরকারির বাটি ফ্রিজে তুলল। মাংসটা তুলতে গিয়েও কী ভেবে সাজিয়ে রাখল টেবিলে। যদি চন্দন এসে খায়! কেকটা পাতলা কাগজে মুড়ে রাখল ভাল করে। হাতের কাজ সেরে ড্রয়িংরুমে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল অনুরাধা। প্রতিভা বাথরুমে যাচ্ছেন। দেওয়াল ধরে ধরে। সত্তরেই একদম জড়ভরত।

অনুরাধা দু পা এগোল, একি লাঠি নেননি কেন? আমি ধরব?

—না না ঠিক আছে। আমি পারব। প্রতিভা সঙ্কুচিত হলেন, কবে পূর্ণিমা গো অনু? ব্যথা এত বাড়ল?

—ব্যথা বেড়েছে তো বার বার ওঠার কী আছে? এই তো শোওয়ার আগে বাথরুমে গেলেন!

—আবার পেল যে। প্রতিভা কথা ঘোরাতে চাইলেন, চাঁদু ফিরেছে?

অনুরাধা 'না' বলতে গিয়ে চেপে গেল। বুড়ি যদি একবার শোনে ছেলে ফেরেনি, পাঁচ মিনিট অন্তর জ্বালিয়ে মারবে অনুরাধাকে। সে আবার আরেক যন্ত্রণা।

বয়সের তুলনায় প্রতিভার গোলগাল ফর্সা মুখে বলিরেখা কম। ফোলা শরীরে বেঁটে মানুষটাকে আরও ছোটখাটো লাগে। চোখের নীচে সাদা সাদা দুটো চামড়ার থলি। লিভার গেছে। চোখের থলিতে ভাঁজ ফেলে ড্রয়িংরুমের দিকে তাকালেন প্রতিভা, চাঁদু বুঝি টিভি দেখছে?

ড্রয়িংরুমে টিভি চলছেই। দু চোখ ভরা ছানি তবু রঙিন আলোর ঝলকানি ঠিক নজরে এসেছে বুড়ির!

অনুরাধা বলল, টিভি আমি দেখছি। আপনি যান, বাথরুম সেরে শুয়ে পড়ুন।

জবাব নয়, নির্দেশ। প্রতিভা গুটগুট করে বাথরুমে চলে গেলেন।

সোফায় পা তুলে ভাল করে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসল অনুরাধা। এগারোটা চল্লিশ। চন্দন আজ নির্ঘাত পার্ক স্ট্রিটে বসেছে। নয়তো ক্লাবে। অথবা অভিষেকের বাড়িতে। তা বসুক, বাড়িতে হইহল্লা না করলেই হল।

এ বাড়িতে উঠে আসার পর প্রথম প্রথম কয়েকটা আসর বাড়িতেই বসিয়েছিল চন্দন। প্রতিভা নিতান্তই সাধাসিধে মানুষ, ছেলে বাড়িতে মদ্যপান করছে এরকম চিন্তা তাঁর মস্তিষ্কেই আসে না। কোনও সুরার গন্ধই তাঁর চেনা

www.boiRboi.blogspot.com

নেই, চেনার সুযোগও হয়নি কখনও। অনুরাধাকেই বন্ধ করতে হয়েছিল ড্রয়িংরুমের আসর। বাধ্য হয়ে।

রাজার তখন ক্লাস ফাইভ। একদিন বাবার বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর ক্যাবিনেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে গ্লাসের তলানি খাচ্ছিল রাজা। কী লজ্জা! কী লজ্জা! যতই হোক ছেলের সামনে বাবাকে বাবা সেজে থাকতে হয়। মাকে মা।

চন্দনও তারপর থেকে যথেষ্ট সতর্ক। সে সহজে মাত্রা ছাড়ায় না, বেহেড তো খুব কমই হয়, বছরে এক আধদিন। ওসব খেয়ে টেয়ে এলে সাবধানে বেল বাজায়। ভেতরে ঢুকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে রাজা কী করছে। তারপর সুড়ুত করে বাথরুম। জামাকাপড় বদলে পা সোজা রেখে ছেলের দরজায় দাঁড়ায় একবার, ঘড়ঘড়ে কিন্তু স্থির স্বরে প্রশ্ন করে, হ্যালো প্রিন্স! কদ্দুর?

চোখ নয়, রাজার মুখ ফেরে বাবার দিকে, লাজুক হাসে, —জগিং বিফোর দা বিগ লিপ।

—এখনও জগিং? দৌড়োও, দৌড়োও। মাইলস্, টু গো বিফোর ইউ স্লিপ।

রাজা মাথা চুলকোয় ক্ষণকাল, পর মুহূর্তে ডুবে যায় অক্ষরের পৃথিবীতে। চন্দন নিয়ম রাখতে খাবার-টেবিলে বসে, একটা কি দুটো রুটি খোঁটে, কি খোঁটে না, চলে যায় বেডরুমে। উহুঁ, একবার থামে। প্রতিভার ঘরের দিকে তাকায়, মা আজ কেমন? এনি প্রবলেম? বলেই সোজা ঘর। বিছানা। ঘুম। নাকডাকা। সব মিলিয়ে পনেরো সেকেন্ড।

চন্দন আজ দলে পড়ে বেহেড হয়ে যাবে না তো? অনুরাধা ত্রস্ত হল। মাতাল হয়ে এলে চন্দনের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়বে। দুলে দুলে গান গাইবে, মন যে আমার কেমন কেমন করে। প্রাণেতে সয় না সখি...। অনুরাধাকে চোখ টিপে শোওয়ার ঘরে ডাকবে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! তারপরই শুরু হবে ভেউ ভেউ কান্না। বমি। অনুরাধা তখন পড়িমরি করে একবার রাজার ঘর বন্ধ করতে ছুটছে; একবার প্রতিভার দরজা।

টিভিতে নাচগানের খিচুড়ি প্রোগ্রাম চলছে, অনুরাধা উঠে শোওয়ার ঘরে এল। চন্দনের পাজামা পাঞ্জাবি আগেই বাথরুমে রেখে আসবে। যদি চন্দন আজ সজ্ঞানে না ফেরে!

আলমারি খুলতেই খয়েরি খামটায় চোখ পড়ে গেল অনুরাধার। চন্দন কাল রাত্রে দিয়েছিল, তখন টাকাটা লকারে তোলা হয়নি। মাসে এরকম বিশ পঁচিশটা খাম আনে চন্দন। আগে খামের মুখ বন্ধ থাকত, আজকাল যারা দেয় তারা আর মুখ আটকানোর প্রয়োজন বোধ করে না। আঠার খরচ বাঁচায়।

খাম খুলে অনুরাধা টাকাগুলো গুনল। নশো। আঠেরোটা পুরনো পুরনো

পঞ্চাশ টাকার নোট। নীপা সেদিন বলছিল অভিষেক নাকি মাঝেমধ্যে একটা করে কিউব কিনে রাখছে আজকাল।

অনুরাধা নির্বোধের মতো জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিল, —কিসের কিউব ?

—গোল্ড ! পঞ্চাশ গ্রাম। একশো গ্রাম। তোমরা কেনো না ? কেনে অনুরাধাও। গয়না হিসেবে। তবে অত নয়। নীপার কথার ছিরি দেখে গা জ্বলছিল অনুরাধার। নতুন ডিভিশানে পোস্টিং পাওয়ার পর থেকে অভিষেকের খুব রমরমা। ওইটুকু ছেলে, চন্দনের থেকে পাঁচ বছরের জুনিয়ার, তার নাকি জলহস্তীর হাঁ। এই সব ছোটখাটো খাম তার মুখে পড়লে ফুলকপির মতো হারিয়ে যায়। চন্দনের মতো নিয়মমাফিক মাসোহারায় ওই হাঁ বন্ধ হওয়ার নয়। যেখানে সেখানে গুঁতোচ্ছে, যখন তখন খাবলা মেরে পার্টিদের কাছ থেকে টাকা বার করছে ! সে সোনা বানাবে না তো কি চন্দন বানাবে ? নীপাটাও দু কান কাটা। আমার বর ভাই দু হাজার না হলে বাড়িই ফেরে না ! সবার সামনে বলে ! আশ্চর্য ! রাখঢাক গুড়গুড় নেই ! টেরটি পাবে যেদিন ভিজিলেন্স ক্যাঁক করে ধরবে। গত বছরের আগের বছর কী করে যে ভিজিলেন্স সামলেছে চন্দন ! মাত্র দু মাসে চোদ্দো হাজার টাকা জলের মতো গলে গেল। তারপরও কী টেনশান ! তার চেয়ে বাবা বাঁধা পথের মাসিক বন্দোবস্তই ভাল। অথবা অফিসের আনুপাতিক ভাগ।

বাথরুমে জামাকাপড় রেখে বন্ধ কাচের জানলার এপারে এসে দাঁড়াল অনুরাধা। কাচের গায়ে হাল্কা বাষ্প জমেছে, হাত দিয়ে ভাপটুকু মুছে নিতেই বাইরেটা স্বচ্ছ। জানলার ওপাশে ছোট্ট পাঁচিল, পাঁচিলে বসে একটা বেড়াল জুল জুল করে চারদিক দেখছে, শীতে আশ্রয় খুঁজছে বোধহয়। পাঁচিলের পর রাস্তা। রাস্তার ওপারে এক বিশাল বহুতল হর্ম্য। অনুরাধা তার একতলা থেকে ওপর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঠাণ্ডায় সব ফ্ল্যাটের জানলাই প্রায় বন্ধ, শুধু ন তলার ব্যালকনি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোকরশ্মি। আহা, ওরকম উঁচুতে যদি থাকা যেত ! পিছনের উঠোনটুকু হয়তো থাকত না কিন্তু কত উঁচু থেকে দেখা যেত পৃথিবী। পুতুলের মতো ছোট হয়ে যাওয়া মানুষ। বাস। ট্যাক্সি। গাড়ি। মিছিল। পাশের গলি হয়ে যেত সরু সুতো। চওড়া রাস্তা মনে হত শুয়ে থাকা ইস্পাতের পাত।

অনুরাধাদের পাড়াতেই প্রচণ্ড জোরে বোমা ফাটল একটা। উদ্দাম বাজি ফাটা শুরু হয়েছে। দুমদুম দুম দুম্। পুরনো বছর শেষ। নতুন বছর শুরু। খিদিরপুর ডকে জাহাজগুলো কি একসঙ্গে ভোঁ বাজাচ্ছে এখন ? ছোটবেলায় জাহাজের ডাক পরিষ্কার শোনা যেত। এখন চারপাশে এত বড় বড় বাড়ি ! এত পটকার আওয়াজ !

দরজাতেও বেল বাজছে। চন্দন ফিরল এতক্ষণে। দরজা খুলে অনুরাধা চমকে উঠেছে। চন্দন নয়, চন্দনদের এক পার্টি। নরেন্দ্র শর্মা। এত রাতে এই লোকটা কেন !

www.boiRboi.blogspot.com

—নমস্তে ভাবীজি। আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম।

অনুরাধার বুক ধড়াস করে উঠল, কী হয়েছে, কী ব্যাপার ? চন্দন কোথায় ?

—না না, ঘাবড়াবেন না। চন্দনবাবু ঠিক আছেন। লোকটা হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প, চন্দনবাবুকে...একটা জরুরি কাজে...কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে...হোঁচট খেতে খেতে আচমকাই বাক্যের গতি বাড়াল লোকটা, উনি আজ ফিরতে পারবেন না।

—সেকী ! সকালে তো কিছু বলে যায়নি !

লোকটা যেন চন্দনের হয়ে কৈফিয়ত দিল, —না...মানে...খুব সাডেন তো...

—ফোন করতে পারত !

—চেষ্টা করেছিলেন, লাইন পাননি। তা ছাড়া দুফুর বেলাতেই তাড়াতাড়ি ছুটতে হল তো ! লোকটা ঝট করে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল।

—কিচ্ছু ভাববেন না ভাবীজি। দাদা কাল এসে যাবেন।

অনুরাধা আরও কিছু জানার আগেই লোকটা প্রায় দৌড়ে চলে গেছে। গেটের ওপাশে সপাটে একটা গাড়ি বন্ধ করার আওয়াজ হল। ঝড়ের গতিতে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

দরজা বন্ধ করেও অনুরাধার ঘোর কাটেনি। কী এমন কাজ পড়ল ! কোনও বড় রেইড ! সদর দপ্তর থেকে টিম এসেছে ! আগের বার বার্লিয়া গ্রুপে হানা দেওয়ার খবরটা আগে থেকে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল বলে অগ্রিম সাবধানতা ! কিন্তু চন্দন তো কখনও বাড়িতে না বলে যায় না ! দুপুরে ফোন করেছিল, পায়নি ! অনুরাধা তো আজ সারাদিনই বাড়িতে !

কোণার ঘরের দরজা খুলে গেছে, প্রতিভা পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে, তাই বলো। চাঁদু তা হলে তখন ফেরেনি ?

অনুরাধা শুনতে পেল না। বাইরে একটানা বাজি ফেটেই চলেছে। কলকাতার বাতাস শীতে আর বারুদে মাখামাখি।

নতুন বছর এসেছে।

দুই

—শুনছেন, আমার টাকাটার তা হলে কী হবে ?

সাত্যকি নিবিষ্টমনে একটা সাইট্ প্ল্যান নাড়াচাড়া করছিল। বাইপাসের ধারে তিন বিঘা জমি, ছোট ছোট প্লটে ভাগ করা। কটেজ বানাতে হবে। কুঁড়েঘরের ছদ্মবেশে মধ্যবিত্তের স্বপ্নপুরী।

মুখ তুলে সাত্যকি ভদ্রলোককে দেখল, ঠিক চিনতে পারল না। এই সমস্ত লোক যারা তার অফিসে আসে সবারই প্রায় এক রকম চেহারা। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স। প্রতীক্ষিত মুখচোখ। মাঝে মাঝে স্বপ্নে উদ্ভাসিত, পরক্ষণে ম্লান।

সাত্যকি উদাস ভাবে বলল, —আপনার কোন্‌টা বলুন তো ?

—বাহ্‌, তাও ভুলে মেরে দিয়েছেন ! মহাবীরতলায় আপনাদের যে ফ্ল্যাট হওয়ার কথা ছিল...আমি থার্ডফ্লোরে ওয়েস্টেরটা বুক করেছিলাম...

সাত্যকির মনে পড়ল গতমাসেও ভদ্রলোক খোঁজ নিতে এসেছিলেন। সম্ভবত স্ত্রীকে নিয়ে। বেচারা ! ওই জমিটা নিয়ে এমন আইনি মারপ্যাঁচ শুরু হয়েছে, খুব শিগ্‌গির ওখানে কমপ্লেক্স তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজল কত নিয়েছিল লোকটার কাছ থেকে ? তিরিশ ? চল্লিশ ? সাত্যকি গলা ওঠাল, —শম্ভু, সাত নম্বর ফাইলটা দিয়ে যা তো।

ম্যাজেনাইন ফ্লোরে ছোট্ট নতুন অফিস। দুটো স্টিলের আলমারি বসিয়ে পার্টিশান করা। একদিকে সাত্যকি কাজল, অন্যদিকে ড্রাফটস্‌ম্যান, টাইপিস্ট আর ক্লার্ক কাম আলাদিনের প্রদীপ শম্ভু। সাত্যকিদের জিন। হুকুম করলেই তামিলের জন্য প্রস্তুত।

শম্ভু একটা মোটা গার্ড ফাইল সাত্যকির টেবিলে এনে ফেলল। যে কোনও সমস্যার সময় এই ফাইলটা আনাই দস্তুর। ট্যাক্স রিসিট, বিভিন্ন বিল, টুকিটাকি চিরকুট আর হাবিজাবি কাগজে ঠাসা।

কপট মনোযোগে ফাইল উল্টোতে শুরু করল সাত্যকি। টেলিফোনের বিলে এসে থেমে গেল। বাকি পড়ে আছে, দেওয়া হয়নি।

—হুঁ, আপনার প্ল্যানটা তো...করপোরেশানে আটকে আছে বুঝলেন...এত করাপশান ! আপনি কত টাকা দিয়েছিলেন যেন ? তিরিশ ?

—তেতাল্লিশ।

ওরকম একটা বেখাপ্পা অঙ্কের টাকা নিয়েছিল কাজল ! বাপের পয়সায় শিকড় গজিয়ে গেছে তবু কাজলটা টাকা পয়সার ব্যাপারে সবসময় এমন উশখুশ করে ! কী করে এত টাকা নিয়ে ! সাত্যকি পার্টনারের ফাঁকা চেয়ারের দিকে তাকিয়ে নিল, আপনি তা হলে আর ওয়েট করতে রাজি নন ? ফাইনাল ?

—হ্যাঁ। আমার টাকাটা দরকার।

—দরকার বললেই কি হয় দাদা ! আপনি এক কাজ করুন, একটা অফিশিয়াল চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিন আপনার বুকিং আপনি ক্যানসেল্‌ করতে চান। আমরাও আপনাকে লিখিত জানিয়ে দেব কবে আপনি ফার্স্ট ইনস্টল্‌মেন্ট পাবেন।

—একী কথা ! একবারে দেবেন না ! আমার টাকা আগাম গিলে নিয়ে..

পুরনো সাত্যকি হলে এ কথায় খেপে যেত, এই সাত্যকি সহজে রাগে না। হাসতে হাসতে বলল, আমাদের নিয়ম নেই দাদা। আপনারাও তো দেওয়ার সময় ইন্‌স্টলমেন্টেই দেন, তাই না ? তা ছাড়া আমাদের কাছেও কী আর সবসময় ক্যাশ রেডি থাকে ? বারোমাস মাল মেটিরিয়ালের পেছনে...এই তো আজ সকালেই তিরিশ হাজার টাকা একটা সিমেন্টের বিল মেটালাম।

সাত্যকি উঠে সাইটপ্ল্যানটা আলমারিতে পুরে রাখল। চাবি আটকে হ্যান্ডেল

www.boiRboi.blogspot.com

টেনে দেখল দু বার। নীলামের মাল, সেকেন্ড হ্যান্ড, চাবি ছাড়াই মাঝে মাঝে খুলে যায়।

—চলুন। আমাকে একটু লেকগার্ডেন্সে যেতে হবে। নতুন কন্‌স্ট্রাকশান শুরু হয়েছে, বিকেলের দিকে না গিয়ে দাঁড়ালে স্টকের বড় গণ্ডগোল হয়। সাত্যকি দরজায় দাঁড়াল। রমা মন দিয়ে কী একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। টাইপিং ছাড়া সব কাজেই রমার খুব আগ্রহ। পুরনো কমরেডের বোন, কিছু বলাও যায় না। অল্প গলা তুলল সাত্যকি, রমাকে শুনিয়ে বলল, শম্ভু, রমাদি এখন টেলিফোনের চেকটা টাইপ করে দেবেন, তুই কাল ফার্স্ট আওয়ারেই কাজলকে দিয়ে সই করিয়ে জমা করে দিবি।

নীচে নেমে পানের দোকান থেকে সাত্যকি এক প্যাকেট সিগারেট কিনল। লোকটা এখনও তার সঙ্গ ছাড়েনি, প্যাকেট খুলে সিগারেট বাড়াল লোকটার দিকে, আরে, এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন ? টাকা আপনার মার যাবে না। প্ল্যান পাশ হলেই কাজ শুরু করে দেব। সাত্যকি যেন খাঁচার টিয়াকে বুলি শেখাচ্ছে, হয়তো মার্চ। বড়জোর এপ্রিল।

লোকটা তবু নাছোড়বান্দা, প্লিজ আপনি আমার টাকাটা দেখুন।

লোকটার কাতর চোখের ওপর দিয়ে আরেক জোড়া চোখ মুহূর্তে সরে গেল যেন ! দিঘির মতো শান্ত ! বরফের মতো ঠাণ্ডা !

সাত্যকি এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিল, —দিন সাতেক পরে আসুন। দেখি আপনার জন্য কী করা যায়।

হনহন করে হাঁটছে সাত্যকি। ফুটপাথ রাস্তা জুড়ে বৈকালিক বাজার বসেছে। এই এলাকায় উচ্চ মধ্যবিত্ত বাসিন্দা বেশি, এ পাড়ার গিন্নিরা বাজারে না ঢুকে রাস্তা থেকেই কেনাকাটা করতে বেশি ভালবাসেন। সাত্যকি বাজার দোকান পেরিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে এসে দাঁড়াল। আগে কাঁকুলিয়ায় যাবে। লোকটাকে যে কেন মিথ্যে বলল ! না চাইলেও এত বেশি মিথ্যে মুখে চলে আসে আজকাল ! এটাও কি সাফল্যের শর্ত !

কোথ্‌থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল সাত্যকির গায়ে। বৃষ্টি হবে নাকি ! বেশ তো দুদিন ধরে হাসছিল আকাশ, হঠাৎ জল কেন ! সাত্যকি আকাশের দিকে তাকাল। নাহ্‌, মেঘ নেই।

রুদ্র আবার কোথ্‌থেকে উদয় হল কলকাতায় !

সাত্যকি পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করল। আবার বেশ কয়েকবার মন দিয়ে পড়ল বাক্যগুলো।

শুভ নববর্ষ। আমি এখন কলকাতায়। তোরা কেমন আছিস ? রুদ্র।

লম্বাটে ছাঁদের গোটা গোটা অক্ষর। মাত্রাহীন, কিন্তু বিশৃঙ্খল নয়। এই হাতের লেখা এক হাজার বছর পরে দেখলেও চিনে ফেলবে সাত্যকি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় কত দিন কত রাত এক সঙ্গে কাটিয়েছে দুজনে। এক ঘরে। এক বিছানায়। লাজুর সঙ্গেও সাত্যকির প্রথম দেখা ওই রুদ্রর

ঘরেই। লাজুর চোখে চোখ রেখে রুদ্র এঙ্গেলসের রচনা থেকে পরিবার প্রথার উৎপত্তি বোঝাচ্ছিল। ...মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ নারীজাতির এক বিশ্বঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালির কর্তৃত্বও দখল করল, নারী হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র। নারীর এই অবনত অবস্থা যা বিশেষ ভাবে বীর যুগের এবং ততোধিক চিরায়ত যুগের গ্রিকদের মধ্যে পরিস্ফুট, তাই ক্রমে পালিশ এবং আংশিক রূপান্তরণে মোলায়েম হয়েছে, কিন্তু মোটেই লুপ্ত হয়নি। ...

লাজু তন্ময়। রুদ্র অভিনিবিষ্ট। সাত্যকি যে দশ মিনিট ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে, কারও খেয়াল নেই।

বেশ খানিকক্ষণ পর রুদ্র দেখতে পেয়েছে, আরে, তুই কতক্ষণ? আয়, আয়, ভেতরে আয়, আলাপ করিয়ে দিই। এ হল লাজবন্তী। আমাদের লজ্জা। লাজু। অদ্রিনাথ স্যারের মেয়ে। ...আর এ হল সাত্যকি। আমার মতো বক্তিয়ার নয়, কাজের ছেলে। একা তিনটে নাইট স্কুল চালায়। ইউনিভার্সিটিতে টানা তিন বছর স্টুডেন্ট ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার।

সাত্যকি রুদ্রর কথা শুনছিল না, তার নিয়তিকে দেখছিল। মাঠের পর মাঠ ভাঙা ধানখেতে স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ যেন। একটু চাপা গায়ের রং। অসম্ভব শান্ত চোখ। গভীর কালো মণি। জোড়া ভুরু। চিবুকে ছোট্ট খাঁজ। কোমর পর্যন্ত লতানো বেণী। ছিপছিপে লম্বা শরীর থেকে অদ্ভুত মোহময় দীপ্তি যেন ছড়িয়ে পড়েছে রুদ্রর ঘরে। সাত্যকির বুক টনটন। পরদিনই নিয়তির টানে ছুটে গেছে অদ্রিনাথ স্যারের বাড়ি। লাজু তাকে দেখে খুশি, খুব খুশি, তবু যেন তার চোখ আরও কাউকে খুঁজছিল পিছনে।

সাত্যকি জুতোর চাপে ঘষে ঘষে সিগারেট নেভাল। রুদ্র বাড়িতে না গিয়ে অফিসে এল কেন? এলই যদি, পাঁচ মিনিটও কেন অপেক্ষা করল না? এতদিন পর এসে শুধু একটা চিরকুট রেখে চলে গেল?

বছর সাতেক আগে রুদ্র একদিন আচমকাই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম তার খোঁজ মিলল চার বছর পরে। মধ্যপ্রদেশের বয়লাডিলায় একটা কারখানায় কাজ করছে। সাধারণ চাকরি। ব্যস, তারপর আর কোনও খবর নেই। খবর নেই? না খবর নেয়নি সাত্যকি? ইচ্ছে করে?

দেড় বছর আগে হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের শিরোনাম রুদ্র। শ্রমিকনেতা রুদ্র দাশগুপ্ত মজুরদের মদ খাওয়া ছাড়িয়ে সেই পয়সায় গড়ে তুলছে ছোট্ট হাসপাতাল। শ্রমিকদের জন্য স্কুল তৈরি করেছে। লাজুই ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেখিয়েছিল সাত্যকিকে। সকালের প্রথম রোদ্দুর ফেটে পড়ছিল লাজুর চোখমুখে, আমি জানতাম। আমি জানতাম রুদ্রদা একদিন উঠবেই।

পলকে সাত্যকি বিবর্ণ, আমারও কাগজে নাম ওঠে। আমিও কিছু কাজ

www.boiRboi.blogspot.com

করি।

—এ মা, তুমি তুলনা করছ কেন?

কেন যে তুলনা তা যদি লাজু বুঝত!

সাত্যকি কুটিকুটি করে ছিঁড়ল চিরকুটটা। দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল জঞ্জালের দিকে। আদর্শ। শোষণমুক্তি! সাম্য! সব সব দেখা হয়ে গেছে সাত্যকির। রুদ্র যদি এখনও পুঁথির জগতে পড়ে থাকতে চায় থাক, সাত্যকি কেন থাকবে? সে যা পরিশ্রম করেছে তার বিনিময়ে এটুকু ক্ষমতার মাংস কি তার প্রাপ্য নয়?

সাত্যকি বাসে উঠতে গিয়েও উঠল না। সুকুমার অফিসে ফোন করেছিল। একটা এইট্টিটুর মডেল এসেছে। অ্যাম্বাসাডর। গাড়িটা আজই দেখতে হবে। আজই।

সুকুমার গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়েছিল, সাত্যকিকে দেখে তাড়াতাড়ি বিড়ি নেভাল। আঙুল তুলে বলল, ওই পেছনেরটা স্যার। সবে বডির কাজ হয়েছে। তিনটে টায়ার ব্র্যান্ড নিউ। রঙটা কী সুন্দর হয়েছে দেখেছেন? সি গ্রিন্। তাকালেই চোখের আরাম হবে।

সমুদ্রনীল কাকে বলে সাত্যকি জানে না। সে বর্ণান্ধ। এই পৃথিবীর কোনও রঙই সঠিক ভাবে চিনতে পারে না সে। লাল না। সবুজ না। নীল না। ডাক্তার বলেছিল, জিনের ত্রুটি। কোনও ওষুধেই সাত্যকি লাল আর সবুজকে পৃথক করতে পারবে না। দৃষ্টির এই দুর্বলতার কথা কাউকে বলেনি সাত্যকি। লাজুকেও না। তার কাছে রঙ মাত্র দুটো। সাদা আর কালো। না, আরেকটা আছে। ধূসর।

সাত্যকি গাড়িটায় বেশ খানিকক্ষণ চোখ বোলাল, কত চাইছে?

—বলছে ষাট। দেখুন না আপনার চয়েস হলে দু চার হাজার টাকার জন্য আটকাবে না।

সাত্যকি ভেতরে ভেতরে অসহায় বোধ করছিল। গাড়িরও সে কিস্যু বোঝে না। কিন্তু এ কথা তো সুকুমারকে বুঝতে দেওয়া যায় না। ওস্তাদ জহুরীর মতো বলল, বাইরে থেকে দেখে কি আর হালত বোঝা যায় সুকুমার? বাজিয়ে দেখতে হয়। আমি বরং কাল পরশু একবার এসে একটা চক্কর মেরে যাব।

—কাল কেন স্যার? এখনই ঘুরে আসুন। আজ শুভ দিন! বছর শুরু হচ্ছে!

সাত্যকি ঘড়ি দেখল। ছটা পঁচিশ। চন্দনদার বাড়ি হয়ে একবার লোকাল কমিটির অফিসে যেতে হবে। অমরদা টাইম দিয়েছে, ঠিক আটটায় আসবে।

—না থাক। আমার হাতে আজ অনেক কাজ।

—কোথায় কাজ? কদ্দুর?

—আগে একটু কাঁকুলিয়ায় যাব। তারপর সেখান থেকে...

—আসুন না স্যার, আপনাকে কাঁকুলিয়ায় পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনার

সময় বেঁচে যাবে, গাড়িটাও দেখে নেবেন।

সাত্যকি জোর করে না বলতে পারল না। গাড়িতে বসে সিগারেট ধরাল।

স্টার্ট দিয়ে সুকুমার নিজেই উল্লসিত, —সেলফটা দেখলেন স্যার? চাবি ছোঁওয়াতেই স্টার্ট। গিয়ার দেখুন। পালক।

ঝট করে গাড়ির স্পিড বাড়াল সুকুমার, এই হল পিক্‌আপ। পক্ষীরাজ। বলুন, কোন রাস্তা দিয়ে যাব? পূর্ণদাস, না সাদার্ন অ্যাভেনিউ?

টিপিকাল দালাল! সাত্যকি মনে মনে হাসল, মুখে বলল, সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরো।

লেকের ধারে এসে সুকুমার আরও স্পিড তুলেছে, চলছে কোনও শব্দ পাচ্ছেন ইঞ্জিনের? গরগর নেই, ঢ্যাঢ্যা নেই, একেবারে মাখন। প্রচুর খরচ করেছে স্যার। বুশ নতুন। সাসপেনশনে কাজ হয়েছে। এখন আপনি আঠেরোটা মানুষ, একটা ছাগল, তারপর দুটো পানের বস্তা সব তুলে ফেলুন, গাড়ি একটুও বসবে না।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে সুকুমার। সাত্যকি দূরমনস্ক। শব্দহীন মসৃণ চলা মানেই কি ইঞ্জিন খুব ভাল? তার আর লাজুর মাঝে তো কোনও গরগর ঢ্যাঢ্যা নেই, একদিনও উচ্চগ্রামে তর্ক ঝগড়া করেনি তারা। তবু সম্পর্ক মসৃণ কই! নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই হয়তো আরও গভীর অসুখ লুকিয়ে থাকে।

ফাঁকা রাস্তায় অকারণে দু তিন বার ব্রেক চাপল সুকুমার। সাত্যকি সামনে মুখ থুবড়ে পড়ছিল, কোনওক্রমে সামলালো নিজেকে। সুকুমারের ভ্রূক্ষেপ নেই, আঃ। কী ব্রেকশু! আমি গ্যারান্টি দিতে পারি স্যার, এ মল্লিকবাজারের মাল নয়, খোদ কোম্পানির মাল। বলেই সুকুমার স্টিয়ারিং থেকে হাত ছেড়ে দিল। সাত্যকি হাঁহাঁ করে উঠতে যাচ্ছিল, সুকুমার চেপে বসিয়ে দিয়েছে তাকে, —সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকুন। গাড়ি একটু বাঁদিকে বা ডানদিকে টাল খেলে আমাকে জুতোপেটা করবেন।

সুকুমার নিজের খেয়ালে ক্লাচ ব্রেক গিয়ার স্টিয়ারিং-এর খেলা দেখিয়ে চলেছে। সাত্যকি হাল ছেড়ে বসে ছিল, গোলপার্কে এসে চেঁচিয়ে উঠল, এই দাঁড়াও দাঁড়াও। বাঁদিকে সাইড করো।

এক ভিডিও পার্লারের সামনে রাজা। সঙ্গে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। উত্তেজিতভাবে হাত পা নেড়ে কথা বলছে চারজন। যখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে থাকে ছেলেটার মূর্তি একেবারে অন্যরকম, অথচ বাড়িতে কী নিরীহ! এসপ্ল্যানেডের সিনেমা হলের সামনে কদিন আগে রাজাকে দেখেছিল সাত্যকি, ইংরিজি বই দেখে বেরোচ্ছিল রাজা। ভিড়ের মধ্যে তিন চার জন বন্ধু মিলে অশালীন হাসিতে ফেটে পড়ছিল বার বার। সেদিন সাত্যকি লুকিয়ে পড়েছিল, আজ এগিয়ে গেল। রাজাও দেখেছে সাত্যকিকে। বন্ধুদের দিকে ফিরে বিচিত্র ভঙ্গিতে বলল, চাআও। টিল ডে আফটার টুমরো।

সাত্যকি রাজার কাঁধে হাত রাখল, হ্যাপি নিউইয়ার। খুব আড্ডা হচ্ছিল

www.boiRboi.blogspot.com

অ্যাঁ? আমার জন্য ভেস্তে গেল তো?

—আর আড্ডা। রাজা হাত ওল্টাল, —নিউইয়ার মানেই তো এগজামের খাঁড়া।

—হাইকমান্ড অর্ডার ঝুলিয়ে দিয়েছে বুঝি?

—আজকে একটু ছাড় ছিল। নতুন বছর বলে।

রাজার হাত ধরে গাড়ির দিকে টানল সাত্যকি, বোসো। সামনের দোকান থেকে একটু মিষ্টি কিনে আনছি। তোমাদের বাড়িই যাব।

সাত্যকি যখন ফিরল তখনও রাজা জরিপ করছে গাড়িটাকে। পিছনের সিটে বসে শরীর ছেড়ে দিল, তুমি কিনলে নাকি পিসেমশাই?

—ভাবছি। কেমন দেখছ? কিনে ফেলব?

—কিনতে পারো। রাজা ঠোঁট কুঁচকোল, বাট নাথিং লাইক মারুতি। অ্যাম্বাসাডার কেমন ঢ্যাপঢ্যাপে। বুড়োটে।

সুকুমারের আঁতে লাগল, কিন্তু জানটা তো কড়া ভাই।

—তোমরা জান নিয়েই থাকো। উই নিড স্পিড। স্পিড। মোর স্পিড। রাজা যেন গাড়িতে বসে বসেই ছুটছে, তারপর পিসেমশাই, তোমার কী খবর?

—কী খবর জানতে চাও?

—আরও কটা প্যালেস বানালে? পিসিমণি তো বলে তুমি এখন শুটিংস্টার। উঠছ। ওঠাচ্ছ।

সাত্যকি মৃদু হাসল। শুটিংস্টার যেমন হুহু করে ওঠে, নিভেও যায় ঝটপট। লাজু কি সেরকমই ইঙ্গিত দিতে চায়!

গাড়ি থেকে নেমে সাত্যকি সুকুমারকে ছেড়ে দিল। অনুরাধা দরজা খুলতে রাজা সাঁ করে ভেতরে ঢুকে গেছে। নিজের ঘরে একবার ঢুকেই বেরিয়ে এল, পিসেমশাই গাড়ি কিনছে মা। অ্যাম্বাসাডর।

অনুরাধা মিষ্টির বাক্স ডাইনিংটেবিলে রাখছিল। আলগাভাবে বলল, তাই! ভাল তো।

অন্য দিন সাত্যকিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অনুরাধা, আজ সে কেমন অন্যমনস্ক। নিষ্প্রাণ ভাবে বলল, তুমি চা খাবে তো ভাই?

—আপনার হাতের চায়ে আমার তো কখনও না নেই বৌদি। সাত্যকি মিটিমিটি হাসছিল, মা কোথায়?

—ঘরে। যাও না। অনুরাধা উঠে গেল।

প্রতিভার হাতে তুলসীমালা, বিড়বিড় করে জপ করছেন। সাত্যকির গলা পেয়ে ভীষণ খুশি, তুমি একা এলে নাকি? লাজু আসেনি?

—আমি তো অফিস থেকে আসছি।

—লাজু ভাল আছে তো বাবা? ঠাণ্ডার সময় ওর আবার সর্দিকাশিটা বাড়ে। একেবারে বাপের ধাত পেয়েছে মেয়ে। হাঁপটাপ ওঠেনি তো?

—না। এখন ঠিক আছে। সাত্যকি টুল টেনে বসল, আমি আপনাদের

নেমন্তন্ন করতে এসেছি। দশ তারিখে মা-র বাৎসরিক, সবাইকে যেতে হবে। আপনাকেও।

—ও মা, দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল! প্রতিভা ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন, —দিন যায়, না ঝড় যায়! তোমার বাবার শরীর ঠিক আছে তো বাবা?

—ওই একরকম। বাবা পরশু বহরমপুর গেছেন। মামার বাড়িতে। ভাবছি মা-র কাজ হয়ে গেলে বাবাকে কদিন ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেব। ভাইয়ার সঙ্গে।

—তোমার ভাই এসে এবার থাকছে তো কদিন?

—কই আর। বলে অফিসে একদম ছুটি নেই। গত বছর পুরো দেড়মাস ছুটি নিয়ে ফেলেছে। মা-র অসুখের সময়...

—ছেলেটার বিয়ে দাও এবার। দূর বিদেশে একা একা থাকে... চাকরিও তো বেশ ভালই পেয়েছে।

—কম্পিউটারের চাকরি। ওদেরই তো যুগ এখন। ও তো খুব জেদ করছে বাবাকে কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে রাখবে বলে।

—তা কেন? দুই ছেলের কাছেই বাবা ভাগাভাগি করে থাকুন। লাজুও তো দেখি খুব বাবা বাবা করে। ওর অবশ্য দেওরের ওপরেও টান খুব।

সাত্যকি চাপা শ্বাস ফেলল। সকলের ওপরই লাজুর খুব টান, এক সাত্যকি ছাড়া।

অনুরাধা খাবার টেবিলে ডাকছে সাত্যকিকে, এসো ভাই।

সাত্যকি প্রতিভার ঘর আড়াল করে সিগারেট ধরাল, আপনি কিন্তু অবশ্যই যাবেন বৌদি। চন্দনদাকেও বলবেন। রাজা, তুমিও কিন্তু...

—ওকে বাদ দাও। অনুরাধা চা এগিয়ে দিল, আজ বাদে কাল পরীক্ষা।

—পরীক্ষা তো থাকবেই বৌদি, তা বলে আত্মীয়স্বজনের কাজেকর্মে দাঁড়াবে না?

অনুরাধা অল্প সহজ হয়েছে, তুমি তো ভাই পার্টিটার্টি করো, আগে তো এ-সব আচার আচরণ, ঠাকুরদেবতা কিছু মানতে না? এখন বুঝি খুব ভক্তি এসেছে? অফিসে গণেশলক্ষ্মী রেখেছ?

কী যে মানে, আর কী যে মানে না, তা যদি সাত্যকি জানত! কোনও মানুষই কি জানে! আচরণের জন্য বিশ্বাস? না বিশ্বাসের জন্য আচরণ? নাকি প্রকৃত জীবনে বিশ্বাস আচরণ দুটোই সমান মূল্যহীন?

সাত্যকি আমতা আমতা করল, বোঝেনই তো বাবার সেন্টিমেন্ট,...বুড়ো মানুষ, আজ আছে কাল নেই...চা শেষ করে সাত্যকি কাপ নামিয়ে রাখল, চন্দনদা কখন ফিরবেন বৌদি? রাত হবে?

একটা পলকা ছায়া পড়েই নিমেষে মিলিয়ে গেল অনুরাধার মুখ থেকে, ও তো ভাই কাল দুপুরে অফিসের কাজে বাইরে গেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—কাল দুপুরে! সাত্যকি হ্যাঁ, আমি যে চন্দনদাকে কাল রাত্তিরেও দেখলাম পার্ক স্ট্রিটে! ...হ্যাঁ, কালই তো। সঙ্গে দুজন লোক ছিল!

সহসা অনুরাধার মুখ থেকে যেন রক্ত শুষে নিল কেউ। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছে সাত্যকির দিকে, তুমি ভুল দেখেছ।

—আমি ভুল দেখলাম! চন্দনদা একটা ডিপ কালারের ফুলস্লিভ সোয়েটার পরে ছিল! সেই যে লাজুর বোনা! কটা হবে তখন? সাড়ে নটা, দশটা! চন্দনদা...সাত্যকি আচম্বিতে সামলে নিল নিজেকে। কাল যে অবস্থায় চন্দনকে দেখেছে, তা কি অনুরাধাকে বলা উচিত? বার থেকে বেরিয়ে টলমল পায়ে হাঁটছিল, হাঁটতে হাঁটতে তিন মক্কেল একটা ফিয়াটে উঠল। মাত্র দু পা দূরে সাত্যকি দাঁড়িয়ে, তাকে দেখতে পর্যন্ত পেল না।

রাজা টেবিলে বসে কথা গিলছিল, বলল, তুমিও পার্ক স্ট্রিটে! ওয়াও! খুব নিউইয়ার্স ইভের পার্টি হচ্ছিল!

সাত্যকি গালে হাসি ফোটাল, দুই চাঁইকে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। করপোরেশানের।

সাত্যকি লক্ষ করছিল অনুরাধা তাদের কথা একদমই শুনছে না। ভীষণ চিন্তিত। বিড়বিড় করে বলল, সত্যিই তুমি ওকে কাল দেখেছ? চোখের ভুল নয়?

রাজা মুচকি হাসল, নিউইয়ার্স ইভে পার্ক স্ট্রিট সন্ধে থেকে দোলে মা। আর রাত বাড়লে তো গোটা এলাকা জল পুলিশের আন্ডারে চলে যায়। নিজেকেই তখন অন্য লোক বলে ভুল হয়, তাই না পিসেমশাই?

সিগারেট ছাড়া সাত্যকির কোনও নেশা নেই। কদাচিৎ মদ স্পর্শ করেছে সে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে ওইটুকু বাচ্চা ছেলে! অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিটা হজম করল সাত্যকি, —তাই হবে বৌদি। আমি বোধহয় ভুলই দেখেছি। আসি।

সাত্যকির পিছন পিছন অনুরাধাও বাইরে বেরিয়ে এসেছে। দরজা থেকে বাড়ির ভেতরটা সন্তর্পণে দেখে নিল। অকস্মাৎ সাত্যকির হাত চেপে ধরেছে, তুমি সত্যি কাল রাতে ওকে দেখেছিলে?

রাজনীতি সাত্যকিকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে। কোথায় বিপদের গন্ধ, কোথায় বা রহস্যের সবই অগ্রিম আঁচ করতে পারে সে। সাত্যকি অনুরাধার চোখে চোখ রাখল, কী ব্যাপার বলুন তো বৌদি? আপনি কি কিছু আশঙ্কা করছেন?

অনুরাধা ফিসফিস করে বলল, কাল ও মেরুন সোয়েটারটাই পরেছিল। তারপর লোকটা এসে রাত্তিরে খবর দিয়ে গেল...

—কে লোক? কিরকম দেখতে?

—ওদের এক পার্টি। শর্মা। মাঝারি হাইট। মোটাসোটা।

—নরেন্দ্র শর্মা? কী বলে গেছে?

—বলল তো অফিসট্যুরে দুপুরবেলাই নাকি...

—তা হলে চিন্তা করছেন কেন ? আমার মনে হচ্ছে আমি ভুলই দেখেছি।

—তুমি আমাকে ভোলাতে চাইছ ভাই। আজ সন্ধেবেলা ওর অফিসের এক কলিগ এসেছিল, খুঁজছিল ওকে।

রাজনীতির শিক্ষা প্রয়োগ করছিল সাত্যকি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জানতে হবে। অতি সতর্কভাবে। গলার স্বর তরল করল, অফিসের কে ? কী নাম বলুন তো ?

— অভিষেক। তুমি বোধহয় চেনো। অভিষেক দত্ত। আগের বছর রাজার জন্মদিনে দেখেছ।

— অ। সেই মাল ? সন্ধের পর যার চা কফি চলে না ? সাত্যকি কুশলী অভিনেতার মতো হাসল, লোকটা যখন এসেছিল, সেন্সে ছিল তো ? চন্দনদা বলছিল ও নাকি অফিসেও টঙ হয়ে থাকে ? ওর কথা ধরে আপনি....

— না ভাই। আমার যেন কিরকম লাগছে। আজও তো এখনও ফিরল না ! অনুরাধার গলা কাঁপছে, তুমি ভাই কাল একটু খোঁজ নেবে ?

— নেব'খন। অভয় দিতে গিয়ে সাত্যকি এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করছিল। জোরে শ্বাস টানল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বৌদি। আমি ভুলই দেখেছি। যাকে দেখেছি সে লোকটা বেশ লম্বা, চন্দনদা অত লম্বা নয়।

পার্টি অফিস ঘুরে বাড়ি ফিরতে সাত্যকির রাত হল। বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে লাজুই দরজা খুলেছে।

— সরি। সাত্যকি কাঁধ ঝাঁকালো, অমরদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। পঙ্কজ ঘুমিয়ে পড়েছে ?

— হুঁ। লাজু যথারীতি ভাবলেশহীন, তোমাদের পুরুত এসেছিল। কাল সকালে আসবে আবার।

— কটায় আসবে ?

— বলল তো অফিস যাওয়ার পথে ঘুরে যাবে।

লাজু ঘরে চলে গেল। ঘর থেকেই বলল, টেবিলে তোমার খাবার ঢাকা আছে, গরম করে দেব ?

—দরকার নেই। সাত্যকি বিষণ্ণ মুখে জুতো খুলছিল। লাজুর কর্তব্যে কোথাও ত্রুটি নেই। সকাল থেকে নীরবে সমস্ত কাজ করে যায়। চা জলখাবার, রান্না, ঘর পরিষ্কার, শ্বশুরসেবা। দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরি। বিকেল সন্ধেয় টিউশনি। নিয়মিত বস্তির বাচ্চাদের নিয়ে পাঠশালাও বসায় এর মধ্যেই। সব নিখুঁত। শুধু তার কাছেই এত শীতল ! এত নিষ্প্রাণ !

ঘাড় গুঁজে সাত্যকি খেয়ে নিল। বাথরুমে যাওয়ার সময় আড়চোখে দেখল পঙ্কজকে। রান্নাঘরের সামনে ক্যাম্পখাট পেতে পরিপাটি বিছানায় মশারি খাটিয়ে ঘুমোচ্ছে বাচ্চাটা। গায়ে ওয়ার পরানো লেপ। বাড়ির কাজকর্ম করার

www.boiRboi.blogspot.com

জন্য দাসপুর থেকে ছেলেটাকে আনিয়েছিল সাত্যকি। কাজে তো অষ্টরম্ভা, ইনি এখন লাজুর পোষ্যপুত্র হয়েছেন। সকাল বিকেল বই নিয়ে পড়তে বসছে, সাত্যকি সিগারেট আনতে বললেও লাজুর মুখের দিকে অনুমতির জন্য তাকায় ! কী স্পর্ধা !

সাত্যকি শুতে এসে দেখল লাজু মশারির ভেতর বুক অব্দি লেপ টেনে বই পড়ছে। এভাবেই অর্ধেক শুয়ে বই পড়া লাজুর পছন্দের অভ্যাস। বিয়ের পর কত রাত ওই ভঙ্গিতে বই পড়ছে লাজু, সাত্যকি তাকে জড়িয়ে ধরে আলো নিভিয়ে দিয়েছে। আজ কেন পারে না !

সাত্যকি ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল, আজ একটা অ্যাম্বাসাডার দেখে এলাম, সেকেন্ডহ্যান্ড, কিন্তু বেশ ভাল।

লাজু কথা বলল না।

— আমি ভাবছি মারুতি নেব। আই ওয়ান্ট স্পিড। স্পিড। মোর স্পিড। রাজার মতো করে বলতে গিয়ে গলাটা কেমন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল সাত্যকির।

লাজু নিঃশব্দে বই-এর পাতা ওল্টাল, পুরুতমশাই ফর্দ দিয়ে গেছে। আমি কিনে আনব ? না বাবা বহরমপুর থেকে ফিরে কিনবেন ?

জানলার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার সরু স্রোত আসছিল একটা, সাত্যকি উঠে টেনে বন্ধ করল জানলাটা। ছিটকিনি আটকে পর্দা টেনে দিল, যা হয় কোরো। আমি টাকা রেখে যাব। বলেই হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বলে উঠল,—ওহোও, তোমাকে তো কথাটা বলাই হয়নি। দারুণ এক্সাইটিং নিউজ। তুমি শুনলে চমকে উঠবে।

লাজু ঘাড় ঘোরাল।

—রুদ্র এসেছে বুঝলে। রুদ্র এসেছে কলকাতায়।

দমদেওয়া পুতুলের চোখে আলো ঠিকরে উঠল, তাই ! কবে ! বলেই দপ করে নিভে গেছে লাজু।

সাত্যকি ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় চোখ রাখল। লাজু কি কখনও ভালবেসেছিল সাত্যকিকে ! নাকি রুদ্রর হুকুমে ঘর বসিয়েছে শুধু ! সাত্যকির বুকে একটা কষ্ট হচ্ছিল। এই মুহূর্তে ওই পুতুলটাকে যদি ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখা যেত। বহু কষ্টে আদিম রিপুকে সংযত করল সাত্যকি। চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করল ক্রোধটাকে। সিগারেট শেষ করে বিছানায় ঢুকল। লাজুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, তোমার বৌদিটা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।

লাজু বই পাশে রাখল,— কেন ?

— বেমালুম বলে দিল তোমার দাদা কাল দুপুরে অফিসের কাজে বাইরে গেছে !

— যেতেই পারে। যায় তো।

— না পারে না। আমি কাল রাত দশটায় তোমার দাদাকে স্বচক্ষে

দেখেছি। পার্ক স্ট্রিটে মাল খেয়ে গড়াচ্ছিল।

লাজু নীরব।

সাত্যকি নতুন খোঁচা দিল, তোমার ভাইপোটিও বেশ হেক্কড় হয়েছে। বাপের ঘুষের পয়সা দুহাতে ওড়াচ্ছে। ওইটুকু কড়ে আঙুলের ছেলে, গোঁফ ওঠার আগেই পেকে ঝুনো! তোমার বৌদিও লাই দিয়ে দিয়ে তাকে মাথায় তুলছে। বুঝবে পরে।

সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে হিংস্র আক্রমণও রাজনীতিরই শিক্ষা। তবু কেমন অসহায় বোধ করছিল সাত্যকি। মাত্র এক হাত দূরে তার প্রিয় নারী, তবু যেন লক্ষ যোজন ব্যবধান।

লাজু বরফ চোখে সাত্যকিকে দেখছিল। ওই দৃষ্টি এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারে না সাত্যকি। ভেতরের গুঁড়ো গুঁড়ো ক্রোধ সাত্যকি থুথু করে ছিটোল, তোমার পেয়ারের দাদা কোথায় গিয়ে ফূর্তি মেরে বেড়াচ্ছে কে জানে। এক নম্বরের তিলে খচ্চর।

— রতনে রতন চেনে। লাজু বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল।

তিন

বাতাস নেহাতই এক নিরীহ গ্যাসীয় পদার্থ। গরম বাতাস হাল্কা হয়ে ওপরে ওঠে, তার জায়গা নিতে ছুটে আসে শীতলতর বাতাস। কোথাও বাতাস সামান্য কেঁপে উঠলে সেই কম্পন একটু একটু করে বাড়তে থাকে, ছড়িয়ে যায় স্তর থেকে স্তরান্তরে। ভূমধ্যসাগরের ওপারে একটা মথের ডানা ঝাপটানি বদলে দিতে পারে ভারতে মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি। অথচ দুদিন ধরে একটা সাড়েনশো স্কোয়্যার ফিট বাড়ির বাতাস কখনও তপ্ত হচ্ছে, কখনও শীতল, তবু নড়ছে না এতটুকু! এই বদ্ধ ভ্যাপসা ভাবের উৎস কোথায়?

রাজা মনে মনে উত্তর খুঁজছিল। বাতাসের উপাদান, বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সিজেনের অনুপাত, সেই অক্সিজেন কখন বাড়ে কমে, কোথায় বাড়ে কমে সবই তার মুখস্থ। কিন্তু নিজের বাড়ির ওই নিথর বাতাসের চরিত্র সে চেনে না। শুধু একটা সুপ্ত সংশয় ডেয়ো পিঁপড়ের মতো ঘুরছে তার স্নায়ুতন্ত্রীতে।

বাবা কি তা হলে সত্যিই অফিসট্যুরে যায়নি!

তিতির একটা গাড়ির বনেটে উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল, এই সৌভিক, দ্যাখ্ না এখনও তিনটের শিফট্ শেষ হল না কেন!

অন্য দিন রাজাই এসময় বেশি ছটফট করে, আজ সে উৎসাহ পাচ্ছিল না। দায়সারা উত্তর দিল, ভগবান জানে।

মৌচাকের চারপাশে উড়তে থাকা মৌমাছির মতো বিনবিন করছে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে। সরু গলি জুড়ে। কথা বলছে। হাসছে। তর্ক করছে। আগতপ্রায় পরীক্ষা নিয়েও আলোচনাতে ব্যস্ত কেউ কেউ। সামনেই দোতলায়

www.boiRboi.blogspot.com

আধুনিক চতুষ্পাঠী। আড়াই হাজার টাকায় ভাড়া নেওয়া থ্রিরুম ফ্ল্যাট। সকালে অঙ্ক বিজ্ঞান, বিকেলে ইংরিজি বাংলা। দুই শিক্ষক এ ভাবেই ভাগ করে নিয়েছেন সময়কে। ভাড়াটাও। তিন ঘরে একই সঙ্গে তিনটে ক্লাশ নেন তাঁরা। ব্যাচ অনুযায়ী। শিফ্‌টে শিফ্‌টে। অনেকটা মাইকেল মধুসূদনের মতো একসঙ্গে একাধিক কাব্যের ডিক্‌টেশান দেওয়ার পেশাদারী দক্ষতায়।

কণাদ হিড়হিড় করে বনেট থেকে টেনে নামাল তিতিরকে, কী হচ্ছে কী অ্যাঁ? অন্যের গাড়ির ওপর উঠে?

তিতির সভয়ে এদিক ওদিক তাকাল, গাড়িঅলা দেখছে নাকি?

— যেদিন দেখবে, এসে রগড়ে কান লাল করে দিয়ে যাবে।

— ইসস, অত সস্তারে! তিতির কানের পোড়ামাটির দুলে হাত বোলাল, এই, আমরা খুব পাবলিক নুইসেন্স হয়ে যাচ্ছি নারে?

— যে কোনও দিন এ পাড়ার লোক আমাদের নামে কেস ঠুকে দেবে। বলবে শব্দদূষণ হচ্ছে।

তিতির তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, আমাদের এগেন্‌স্টে কেন কেস করবে? কারখানার মালিকদের এগেন্‌স্টে করুক! স্যারেদের নামে করুক! শিফ্‌টের পর শিফ্‌ট চলবে, নো সাউন্ড, নো ধোঁয়া, তা কি হয়? আমরা তো শুধুই রমেটিরিয়াল।

সাগ্নিক আর অয়ন এক পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, অয়ন তিতিরকে শুধরে দিল, একদম কাঁচামাল নয়, অলমোস্ট ফিনিশড প্রোডাক্ট। লাস্ট পলিশিং চলছে।

— পলিশিং বলে পলিশিং? সাগ্নিক গজগজ করছে, সকাল থেকে রাত্তির শুধু ঘষা আর ঘষা। কবে যে পরীক্ষাটা শেষ হবে!

কণাদ জিজ্ঞাসা করল, তোর ওয়ার্ক এডুকেশান কদ্দুর? সেই ট্রানজিস্‌টার?

— আমি এখন ওসবে হাত লাগাব না। দাদার এক বন্ধু আছে, ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, ওর এ-সব রেডিও টিভিতে হেভি ফান্ডা, ওই বানিয়ে দেবে বলেছে।

দেবলীনা কাঁধের ব্যাগ বনেটে রাখল, নিজেরা করতে পারিস না এমন প্রোজেক্ট নিস্ কেন রে? অয়ন তো নিজে নিজে টেবিলল্যাম্প বানাচ্ছে, তুইও তাই করতে পারতিস্।

— বকিস না তো। মেয়ে মেয়ের মতো থাক। তোদের তো শুধু স্টিচিং আর নিটিং! মোজা বানানো আর টুপি বানানো! তোরা এ-সব কী বুঝবি রে?

— না বোঝার কী আছে। বাজার থেকে পার্টস কিনে এনে শুধু শোল্ডারিং, ও তো শিশুদের কাজ। দেবলীনাও দমবার পাত্রী নয়, পাঞ্চালী তো নিজে নিজেই একটা রেডিও বানিয়েছে। ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্য নয়, এমনিই।

তিতির দেবলীনার সমর্থনে এগিয়ে এল, রাইট, ছেলেদের সব কাজই আমরা করতে পারি। তোরা কেউ উলের কাঁটা ধরতে পারবি? একটা সোজা একটা

জোড়া বুনে পেছনের ঘর সামনে দিয়ে ফেলতে পারবি ? উল্টো বুনতে গেলে ডানহাতের কাঁটা কোন্ দিকে আসবে ? সামনে ? না পেছনে ?

— একী রে ! এ যে ধাঁধাঁ দিচ্ছে রে। অয়ন চাঁটি মারল তিতিরকে, তোরা ছেলে হয়ে যাচ্ছিস বলে আমরাও মেয়ে হয়ে যাব নাকি !

কণাদ ধনুকের মতো শরীরটাকে বাঁকাচ্ছিল। মাথা পিছনে হেলিয়ে হাতের আঙুল দিয়ে ছোঁওয়ার চেষ্টা করছে গোড়ালি। তার চেহারা বেশ নাদুসনুদুস, মাথা পিছনে ঝোঁকালেই গোটা শরীর পাক খেয়ে যায় তার।

দেবলীনা হিহি করে হেসে উঠল, এই কণাদ, হঠাৎ জোকারের খেলা দেখাতে শুরু করলি কেন ?

কণাদের মুখচোখ চকিতে গম্ভীর, না রে, আমার একটা আসনও ঠিক হয় না। আমি পিটিতে গোল্লা পাব।

— খুউব ভাল হবে। তখন তোর বাবা তোকে পিটিয়ে রোগা করে দেবে। নেক্সট্ বার যখন মাধ্যমিকে বসবি তখন তোর শরীর একদম সাঁই সাঁই করে চলবে।

কণাদ কটমট করে দেবলীনার দিকে তাকাল, তুই কটা আসন করেছিস ?

দেবলীনা তিতির দুজনেরই ছোট্টখাট্টো লিকলিকে চেহারা। দুজনে কণাদের দুটো গাল টিপে দিল, তারপর কোরাসে বলল, আমাদের নটা আসন রেডি। মৎস্যাসন, কূর্মাসন, অর্ধধনুরাসন, ভুজঙ্গাসন, ময়ূরাসন, উষ্ট্রাসন.....

— ব্যস ব্যস, তোরা তিরিশে তিরিশ। অয়ন কোনওক্রমে থামাল দুজনকে, কণাদকে নিয়ে ঠাট্টা হচ্ছে, না ? ওরও একটা আসন রেডি আছে। শবাসন। কণাদ, করে দেখিয়ে দে তো।

কণাদ আরও চটে যাচ্ছিল, কী ভেবে রাজার দিকে ঘুরল,—কীরে সৌভিক, তোর আজ ব্যাটারি ডাউন কেন ?

রাজা উত্তর দিল না। এই অবিরাম কথার পর কথা, শব্দের পর শব্দ, বাক্যের পর বাক্য, হাসির পর হাসি, সবই যেন অর্থহীন ফুলঝুরি। ভাল লাগছে না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না রাজার।

বাবা যদি অফিসট্যুরে না'ই গিয়ে থাকে, গেল কোথায় ? শর্মা নামের লোকটা তবে কেন বলে গেল অফিসের কাজে গেছে বাবা ? পরশুদিন আবার পিসেমশাই কীসব পার্ক স্ট্রিট ফার্ক স্ট্রিটের গল্প শুনিয়ে গেল। তখনও ব্যাপারটাকে রাজা পাত্তা দেয়নি। আরে বাবা, কাকে কান নিয়ে গেল শুনেই কাকের পিছনে দৌড়তে হবে ? পিসেমশাই ভুল দেখতে পারে। পিসিমণি তো বলেই লোকটা বহুত ঢপ মারে। তাও মা গুম। রাত্তিরে হাংগার স্ট্রাইক। নো ছেলের ঘরে আসাআসি। নো কৌতূহল। ঠায় সোফায় বসে আছে তো বসেই আছে। বাবার জন্য মা-র মন কেমন ! হাহ্ ! কবে থেকে এত টান ! সামনে বোবা টিভি ঝিরঝির করছে, সব প্রোগ্রাম শেষ তবু মা ফ্যালফাল তাকিয়ে আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

— মা, তুমি কি আজকাল তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমোনো প্র্যাকটিস করছ নাকি ? বারোটা বেজে গেছে, এবার শুয়ে পড়ো।

— তুই যা। আমি শুচ্ছি।

তারপরও অন্তত দশ মিনিট আলো জ্বলল ড্রয়িংরুমে। সকাল ছটা বাজতে না বাজতে যে মা নিজেই ঘড়ির অ্যালার্ম হয়ে পিপ্ পিপ্ করতে থাকে, সে ছেলেকে না জাগিয়েই সাতসকালে বাড়ি থেকে হাওয়া !

— মা কোথায় বেরিয়েছে গো বড়মা ?

— কী জানি ! আমি ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেলাম তখনও তো ছিল।

বুড়িটা এক্কেবারে ন্যাদোস্। কোনও খবর রাখে না। বাবা যে দু রাত্তির ফিরছে না, তাতে কি কোনও তাপউত্তাপ আছে ? মনে হয় না। পুরো ভীমরতি। তখনই রাজার কেমন কেমন ঠেকছিল। বেলা দশটায় আবার পিসিমণির ফোন।

— মা নেই। ভোরবেলায় কোথায় বেরিয়েছে। কিছু বলতে হবে ?

— দাদা ট্যুর থেকে ফিরেছে ?

রাজা প্যাঁচ কষেছিল, পিসেমশাই কিছু বলেনি তোমায় ?

— না তো !

ঘোরতর সন্দেহজনক ! পিসেমশাই না বললে পিসিমণি ট্যুরের কথা জানবে কী করে ! আর পিসেমশাই যদি বলেই থাকে পিসিমণি চেপে গেল কেন ? ডাল মে জরুর কুছ কালা হ্যায়। মা দুপুরে ফিরল না, বিকেলে ফিরল না, ফিরল সেই রাত্রে ! পুরো ঝোড়োকাক হয়ে ! ফিরেই আবার ঢপ, কোথ্থাও যাইনি বাবা। তোমার দিদার শরীরটা ভাল নেই তো, সারাদিন ওখানেই.....

অদ্ভুত ! রাজা যেন দুধের খোকা ! যা বোঝাবে তাই বুঝে যাবে ! ফোন এলেই চমকে চমকে উঠছে ! কলিং বেল বাজলে দৌড়ে যাচ্ছে আগে। বড়মার সঙ্গে ওগো আহা ছাড়া কথা বলছে না ! অ্যান্ড সবার ওপরে পড়া নিয়ে একবারও চেপে বসছে না রাজার ঘাড়ে !

অয়ন দেবলীনারা অবিশ্রান্ত খুনসুটি করে চলেছে কণাদের সঙ্গে। রাজা ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল। দিব্যি ঝকঝকে দিন, এত আমেজ ভরা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, সবাই কেমন হাসিখুশি, এক রাজাই শুধু.....। রাজা অন্যমনস্কভাবে বলল,— আচ্ছা, এত লোক যে হারিয়ে যায়, কাগজে ছবি বেরোয়, টিভিতে ছবি বেরোয়, তারা সব যায় কোথায় রে ?

— এই দ্যাখ্ দ্যাখ্ সৌভিক মৌনী নেয়নি ! সাগ্নিক সবাইকে ডেকে হ্যা হ্যা করে হাসছে। হাসতে হাসতেই রাজাকে বলল,— বোধহয় ধাপার মাঠে। পরে ফুলকপি হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসে।

তিতির ভুরু কুঁচকে তাকাল,— এই সৌভিক, তুই কি হারিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছিস্ নাকি ? কোন লাভ নেই, পুলিশ ঠিক ঘেঁটি ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে। পরীক্ষায় তোকে বসতেই হবে।

রাজা শুকনো হাসল, দেয়া আজ এল না কেন রে ?

—কে জানে ! যা দুব্‌লা, হয়তো ঠাণ্ডায় ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। দ্যাখ গিয়ে...

অয়নের কথা শেষ হওয়ার আগেই কণাদ চাপা গলায় বলে উঠল, অ্যাই, ছেড়েছে রে ছেড়েছে। ওদের ছেড়েছে এতক্ষণে।

জনা বিশেক ছেলেমেয়ে কিচমিচ করতে করতে বেরিয়ে আসছে, দেবলীনা ঘড়ি দেখল, ওদের চল্লিশ মিনিট পরে ছেড়েছে, আমরাও কিন্তু চল্লিশ মিনিট পরে বেরোব।

সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে পর পর দশ বাই বারো তিনটে ঘর। প্রতিটি ঘর ব্ল্যাকবোর্ড, চেয়ার টেবিল, বেঞ্চি, হাইবেঞ্চিতে পরিপূর্ণ, নড়াচড়ার জায়গা বিশেষ নেই। এক বেঞ্চে পাঁচজন করে তিন পাঁচে পনেরো, তাতেই ঘরের চেহারা হট্টমেলা। এর মধ্যে দু-একজন অতিরিক্তও ঢোকে মাঝে মাঝে। ফ্ল্যাটের রান্নাঘর মাস্টারমশাইদের প্রাইভেট চেম্বার কাম টেক্‌স্ট বই, নোট ইত্যাদির স্টোররুম কাম মিনি লাইব্রেরি। সব মিলিয়ে স্কুলের পকেট সংস্করণ। সঙ্গে উপরি পাওনা আশপাশের বাড়ির গিন্নিদের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রম্ভালাপ। ঝিয়েদের ঝগড়া। সদ্যোজাত শিশুর ট্যাঁ ট্যাঁ। টিভির সংলাপ গান বাজনা। বাচ্চাদের চিলচিৎকার। এর মধ্যেই ছেলেমেয়েরা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে যায়।

রাজার কিছুতেই মন বসছিল না। নামকরা বাঙালি বিজ্ঞানীদের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান চলছে চারদিকে। তাঁদের জীবনী এবার পরীক্ষায় রচনা হিসেবে আসার সম্ভাবনা প্রবল। মাস্টারমশাই বিজ্ঞানীদের জন্মতারিখ, জন্মস্থান, তাঁদের বাবার নাম, মা-র নাম, তাঁদের শৈশব শিক্ষা কর্মজীবন সব কিছুই গল্প করে করে বলে যাচ্ছেন, রাজা গুরুবাক্য যন্ত্রের মতো টুকে নিতে চেষ্টা করছিল, বার বার তবু ভুল হয়ে যাচ্ছে। বাবার কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি তো ! ধুস্, দুর্ঘটনা ঘটলে মা কি গুম মেরে থাকত ! অন্য কিছু হয়েছে। অন্য কিছু। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাবাকে।

—অ্যাই, সত্যেন্দ্রনাথ বানানটা কী লিখেছিস ? ত-য়ে যফলা দিস্‌নি কেন ?

কণাদের খোঁচা খেয়ে সম্বিতে ফিরল রাজা। আবার একাগ্রমনে ডুবতে চাইল বিজ্ঞানীদের জীবনে। পারছে না। হাল ছেড়ে দিয়ে খাতায় গোল গোল করে লিখল, দূর শালা। তারপর ডটপেন বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল বাকি ক্লাসটা।

নীচে নেমে কলকল করছিল তিতির, স্যার কোচিং-এ এত সুন্দর নোট দেন, ক্লাসে দেন না কেন রে ?

সাগ্নিক বলল, সাধে কি মেয়েদের গাড়ল বলে। যদি স্যার ওই নোট ক্লাসে দিতেন, তুই তা হলে এখানে পড়তে আসতিস ?

—আরে বিজনেস করতে গেলে কিছু মাল আলাদা স্টকে রাখতে হয়।

টুকরো টুকরো কথার মাঝেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল বন্ধুরা। রাজারও বাড়ি

www.boiRboi.blogspot.com

ফেরার সময় বাঁধা। ক্লাস শেষ হলে পাঁচ দশ মিনিটের বেশি সে কখনও দাঁড়ায় না। আজ বাড়ি ফিরতে পা সরছিল না তার। মন একটু টাটকা হাওয়া চাইছে। অলসভাবে তিতিরকে বলল— চল না, দেয়ার বাড়ি যাই। খবর নিয়ে আসি ওর কী হল।

তিতির বলল নারে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরতেই হবে। মা কোথায় বেরোবে, তার আগে বাড়িতে ঢুকতে বলেছে।

তিতিরও চলে গেল। রাজা বিষণ্ণ মনে হাঁটছিল একা একা। অন্ধকার নেমেছে। লেকের খোলা বুকে পৌষ বাতাসের সরসর। রাজার পায়ের নীচে শুকনো পাতারা মড়মড় করে ভাঙছিল।

লেকের পাড় ধরে, কাঁচা অন্ধকার ভেঙে রাজা চলে গেল বহুদূর।

দেয়াসিনী রাজাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, কী দারুণ একটা জায়গায় আজ গিয়েছিলাম রে সৌভিক ! এইই ফিরছি। একটু আগে এলে আমাদের দেখা পেতিস না।

রাজা আলতো হাসল, কোথায় গেছিলি ?

—সে অনেক দূর। এখান থেকে ট্রেনে ক্যানিং। সেখান থেকে ফেরি পার হয়ে ডকের খেয়া। সেখান থেকে ভ্যান রিকশায় সোনাখালি। সোনাখালিতে একটা খাল আছে, কী যেন খালটার নাম মা ?

শিপ্রা মেয়েকে খেই ধরিয়ে দিল, পুরন্দর।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরন্দর। সেটা পার হয়ে বাসন্তী। হাঁটতে হাঁটতে একটা পর্তুগিজ চার্চে গেলাম। কী সুন্দর চার্চ রে ! নিরিবিলি। শান্ত। ভেতরে একটা ছোট্ট লেক...

শিপ্রা বলল,— দেয়া, ওটা লেক নয়, পুকুর।

— ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। পুকুর। ওই পুকুরের ধারে বসে থাকলে... কী সুন্দর সবুজ ছায়া পড়ে জলটায়... টলটল কালো জল...

শিপ্রা বলল, ওকে বলে কাকচক্ষু জল।

দেয়া রাজার ভীষণ প্রিয় বন্ধু। সেই নার্সারি থেকে এক ক্লাসে, এক সেকশানে পড়ছে তারা। যে কোনও আনন্দের খবর পরস্পরকে না দিতে পারলে দুজনেরই পেট ফুলতে থাকে। দেয়ার মা বাবাও রাজাকে ভালবাসে খুব। সেই রাজার শৈশব থেকেই। শিপ্রা আর প্রতীপ দুজনেই কলেজে পড়ায়। একজন দর্শন। একজন ইতিহাস। ছেলেমেয়ে যখন ছোট ছিল, শিপ্রা অনুরাধাতেও যথেষ্ট ভাব ছিল। এখন দেখাসাক্ষাৎ প্রায় নেইই।

রাজা খানিকটা অভিমানের সুরে বলল, পরশুই তো তোর সঙ্গে দেখা হল, তখন বললি না তো আজ বেড়াতে যাবি ?

—আমাদেরই কি যাওয়ার ঠিক ছিল নাকি ? দেয়ার গলায় সান্ত্বনা, বাবা কাল রাত্রে হঠাৎ প্ল্যান করল, বলল কলেজ ডুব মেরে আজ সারাদিন আউটিং

করতে যাব।

শিপ্রা আবারও সংশোধন করে দিল মেয়েকে, কলেজ ডুব দিয়ে নয়, বলো সি এল নিয়ে।

দেয়া মা-র দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল,— আচ্ছা বাবা তাই। তারপর কী হল জানিস ? আমরা একটা অদ্ভুত পাখির মাংস খেলাম। ওই যে রে, নদীর চরে থাকে... মেরে বাঁশে ঝুলিয়ে গ্রাম থেকে লোকরা বিক্রি করতে আসে... কাদাগোলা পাখি না কী যেন বলে...

—কাদাগোলা নয় দেয়া, বলো কাদাখোঁচা।

রাজা জিজ্ঞাসা করল, মাসি, তুমিও আজ কলেজ যাওনি ? সি এল নিয়েছ ?

শিপ্রা বলল,— নাহ্, আমার আজ অফ ডে। আমি তোর মেসোর মতো বছরের প্রথমে সি এল খরচা করি না। আমি সি এল জমিয়ে রাখি। তোর মেসোর সব শেষ হয়ে গেলে তবে আমি নিই।

কয়েক মুহূর্তের জন্য রাজা বাড়ির কথা ভুলে গিয়েছিল। দেয়াদের বাড়ির পরিবেশটা একটু অন্যরকম। কিছুটা খোলামেলা। যদিও দেয়ার মা খুব হিসেবি, খুঁতখুঁতে, তবে দিনরাত কানের কাছে পড়া নিয়ে ট্যাকট্যাক করে না। দেয়ার বাবা বেশিরভাগ সময় টিউশনি করে না, মাঝেমধ্যে দু-একটা ভাল ছাত্রছাত্রী পেলে পড়ায় শুধু। টাকার প্রতি স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সাংঘাতিক কিছু আসক্তি নেই। দেয়া অবশ্য নিজেই লেখাপড়ায় ভাল, কিন্তু দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার অভ্যাস তারও নেই।

শিপ্রা উঠে যাওয়ার পর দেয়া সবিস্তারে বর্ণনা করছিল আজকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা। ভ্যানরিকশার পিছনে পা ঝুলিয়ে বসার মজা। নৌকোতে পা দেওয়া মাত্রই টলমল দুলে ওঠা। নদীর কোমর জলে ডুবে বালক-বালিকার চিংড়িপোনা সংগ্রহের গল্প। গল্প বলতে বলতে দেয়া হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল— এই, তুই কিছু শুনছিস না কেন রে ?

রাজা বলল— কই না। শুনছি তো। তারপর ?

—দ্যাখ, তুই আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করিস না। তুই আমাদের বাড়িতে এসেই প্রথম খোঁজ করিস কী খাবার দাবার আছে, আজ করলি না! আমার ঘরে ঢুকেই বইখাতা ঘাঁটতে আরম্ভ করিস, আজ টিউটোরিয়ালে কী পড়ানো হয়েছে সেটা পর্যন্ত তুই... !

রাজা কেঠো হাসি হাসল, বলব কী করে ? আসার পর থেকে তুই একাই তো বকবক করে যাচ্ছিস।

—উঁহু, তোর মুখটাও আজ কেমন শুকনো! মনমরা মনমরা!

রাজা মুখ নামিয়ে নিল।

স্টেপকাট চুল নাচিয়ে দেয়া রাজার পাশে এসে দাঁড়াল। কাঁধে নরম হাত রেখে বলল, কী কথা তুই আমাকেও বলবি না ?

আচম্বিতে রাজার মনে হল এই দেয়াসিনী যেন তার সমবয়সী নয়। যদিও

www.boiRboi.blogspot.com

হিসেবমতো দেয়া তার থেকে এক মাস পাঁচ দিনের ছোট। একই সঙ্গে পাশাপাশি বড় হয়েও কখন যে দেয়া অনেকটা আগে টপকে গেছে রাজাকে! শরীরে। মনেও।

রাজা দেয়ার হাত চেপে ধরল, তুই কাউকে বলবি না বল ? প্রমিস্।

—কাউকে মানে ?

—বন্ধুদের। বল তুই বলবি না ?

—হেঁয়ালি করিস না। বলার মতো কথা না হলে কেন ঢাক পেটাতে যাব!

দু-তিন বার ঢোক গিলে রাজা মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, বাবা বাড়ি ফিরছে না। কী করি বল তো ?

—ফিরছে না!

—মানে... একত্রিশ তারিখ থেকে ফেরেনি। রাজা সামান্য স্বাভাবিক হল যেন,— থার্টি ফার্স্ট রাত্তিরে একটা লোক নাকি এসে মাকে খবর দিয়ে গেছিল বাবা হঠাৎ অফিসট্যুরে গেছে।

—তাতে প্রবলেমটা কী ?

—ওই ট্যুরে যাওয়াটাই তো রহস্য। লোকটা খবর দিয়ে গেল দুপুরে অফিসট্যুরে গেছে, অথচ পিসেমশাই বাবাকে রাত দশটায় পার্কস্ট্রিটে দেখেছে! তারপর মা বোধহয় বাবার অফিস-টফিসে খোঁজ নিয়েছিল, সেখান থেকেও রিপ্লাই নেগেটিভ।

—কী করে জানলি ? মাসি তোকে বলেছে ?

রাজা মুখে বিচিত্র ভঙ্গি করল,— আমি আমার মা-র মুখ দেখে সব বুঝতে পারি। এমন মুখ করে সকাল থেকে বসে আছে... মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ... একটা মানুষ পুরো লাপাতা!

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? দেয়া গম্ভীর মুখে সোফায় পা তুলে বসল,— কিছু মনে করবি না ?

—কী ?

—মাসি মেসোর রিলেশান কিরকম ?

—নরমাল। যেমন সব বাড়িতে থাকে। মা একটু বেশি ছেলে ছেলে করে। বাবা একটু বেশি অফিস অফিস।

—রিসেন্টলি কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল ?

রাজা মনে করার চেষ্টা করল,— উঁহু। ... একদিন পিসিমণিকে নিয়ে কী যেন টুকটাক কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, সে-ও তো প্রায় বারো তেরো দিন হবে।

—ওরকম নয়। ওরকম ঝগড়া তো আমার মা বাবারও হয়। সিরিয়াস ঝগড়া ? ফাটাফাটি ?

—ধুস্। বাবা অত ঝগড়াঝাঁটি করার লোকই না। দিব্যি খাচ্ছেদাচ্ছে, অফিস করছে, ক্লাব করছে... মাঝে মাঝে একটু শুধু... রাজা আর এগোল না। বাবা যে মদ খায় সে কথাটা দেয়াকে বলা বোধহয় সমীচীন হবে না। সব

পরিবারেরই নিজস্ব কিছু কথা থাকে যা প্রিয় বন্ধুকেও বলা যায় না। রাজা আনমনে মাথা ঝাঁকাল,— ভেবেছিলাম আজ বেরোবই না, টিউটোরিয়ালেও যাব না। মাকে বলতেই মা এমন ফোঁচ করে কেঁদে ফেলল! সে কী অড্ সিন্!

দেয়া জীবনের সর্ব অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ নারীর মতো ভুরুতে ভাঁজ ফেলল,— ইন্দ্রনীলের বাবার মতো কেস নয় তো? অন্য কারও সঙ্গে অ্যাফেয়ার ট্যাফেয়ার? হয়তো মাসি জানতে পেরে গেছে! হয়তো মেসো! ইন্দ্রনীলের বাবা তো হঠাৎই একদিন ইন্দ্রনীলদের ছেড়ে চলে গেলেন!

রাজা একটু ধন্দে পড়ল। মিনিট খানেক ভেবেও কিছু কূলকিনারা পেল না।

দেয়া হঠাৎ বলল, একটু বোস। আমি আসছি।

দেয়া তিন মিনিটের মধ্যে ফিরে এসেছে। সঙ্গে প্রতীপ আর শিপ্রা। দুজনেরই মুখচোখ ভীষণ করুণ। যেন রাজা নয়, এই মুহূর্তে তাদের সামনে এক অনাথ বালক দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতীপ বলল, তুমি একটুও চিন্তা কোরো না সৌভিক, আমি খোঁজ করছি।

শিপ্রা উদ্বিগ্ন মুখে বলল, তোমার সুভাষদাকে একটা ফোন করো না।

দেয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,— হ্যাঁ, সুভাষজেঠু তো ডি আই জি! জেঠু নিশ্চয়ই...

শিপ্রা বাধা দিল মেয়েকে,— সুভাষদা ডি আই জি নন। ডেপুটি কমিশনার। ডিসি।

প্রতীপ আন্তরিক সুরে বলল,— পার্কস্ট্রিট অঞ্চলে লাস্ট দেখা গেছে, তাই তো?

রাজা ঘাড় নাড়ল।

—পুরো নাম চন্দনকুমার রায়চৌধুরী?

—হুঁ।

—একটু বোসো। আমি এক্ষুণি দোতলা থেকে সুভাষদাকে ফোন করছি।

শিপ্রা বলল,—আমাদের ফোনটা যে কবে আসবে! পাঁচ বছর আগে দরখাস্ত করেছি। আমাদের দেশের সমস্ত সরকারি সিস্টেমগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। একটা লোকও কাজ করে না! কারুর মধ্যে কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই!

শিপ্রা এক মনে সরকারি পরিচালন ব্যবস্থার নিন্দা করে চলেছে, দেয়া আঙুল কামড়াচ্ছে উত্তেজনায়, রাজা কারও দিকেই তাকাচ্ছিল না। সে প্রতীপের পদধ্বনির অপেক্ষায় স্থানুবৎ। প্রতিটি সেকেন্ডই এখন অনন্তকাল।

প্রতীপ তাড়াতাড়িই ফিরল। ঘরে এসে রাজার কাঁধে হাত রেখেছে, ডোন্ট গেট নার্ভাস। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। ফ্যাটাল কিছু হয়নি, হসপিটালাইজডও হননি, তা হলে ঠিক বাড়িতে খবর চলে আসত। সুভাষদা নিজে খোঁজ করছেন। আশা করছি কালকের মধ্যেই কিছু একটা... তুমি

www.boiRboi.blogspot.com

নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও।

বাড়ির দরজায় পৌঁছেও বুক গুড়গুড় করছিল রাজার। গলাবন্ধ পুলওভারে দম যেন আটকে আসছে। সোয়েটার খুলে কাঁধে রাখল।

বিচিত্র এক সমবেত ধ্বনি ভেসে আসছিল। নতুন জুডো ক্যারাটের ক্লাব হয়েছে পাড়ায়। সকাল সন্ধে লড়াই-এর মহড়া চলে সেখানে। কোরাসে গর্জন তুলছিল কিশোর-কিশোরীর দল। হুহ্ হাহ্। হুহ্ হাহ্।

রাজা কলিংবেলে হাত রাখল।

রতনের মা দরজা খুলেই চোখ ঘুরিয়েছে, দাদাবাবু এসে গেছে।

রাজার হৃৎপিণ্ড ছিটকে উঠল,— কখন!

—এই তো খানিক আগে। বৌদি খুব চেঁচামেচি করছিল, মা এসে থামাল। তোমার ওপরও বৌদি রেগে আগুন হয়ে আছে। ফিরতে দেরি করছ বলে...

রতনের মা সব তথ্য ফাঁসের সময় পেল না, হুড়মুড় করে অনুরাধা বেরিয়ে এসেছে,— ভেবেছিসটা কী অ্যাঁ? বাপ ছেলে দুজনে মিলে আমাকে জ্বালিয়ে মারবি? কোন ভাগাড়ে পড়েছিলি এতক্ষণ?

রাজা হঠাৎই অসম্ভব শান্ত। ধীরেসুস্থে পা থেকে স্নিকার খুলছে। নিজের ঘরে গিয়ে পুলওভার ওয়ার্ড্রোবে ঢোকাল, দরজা বন্ধ করে বদলাল শার্টপ্যান্ট। বিছানায় পড়ে থাকা অনুরাধার শাল গায়ে জড়িয়ে নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে বাবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আস্তে করে সরাল ভারী পর্দা।

চন্দন বিছানায় শুয়ে। বিছানার এক প্রান্তে প্রতিভা।

বাবা দেরি করে ফিরলে ছোট্ট রাজা রাইম্‌সের সুরে প্রশ্ন করত,— ডিয়ার ড্যাড, ডিয়ার ড্যাড, হোয়্যার হ্যাড ইউ বিন্?

চন্দন রাজাকে কোলে নিয়ে ঘুরত বনবন। একই সুরে বলত,— আই হ্যাড বিন টু লন্ডন টু সী দা কুইন।

রাজা ডেকে ফেলল,— বাবা।

অনুরাধা পিছনে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছিল ছেলেকে।

রাজা নিষ্পলক চোখে চন্দনকে দেখছিল। চন্দনের চোখ বসা। চোখের নীচে ঘন মসিরেখা। কোলেস্টেরলের সাদা বিন্দুরা সেই কালিমায় প্রকট। মুখ শুকিয়ে ছোট্ট এতটুকুন।

শান্ত রাজার কণ্ঠ অকস্মাৎ রুক্ষ হল, হোয়্যার হ্যাড ইউ বিন? এই ক'দিন কোথায় ছিলে তুমি?

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত-১৮৯৭ হুগলী

চার

—মার শালাকে তিন লাথি। নেশা ছুটিয়ে দে বেজন্মার।

মোটা পুলিশি রুল গোঁত্তা মারল পেটে,—ওঠ্ শালা ওঠ্। অনেক ফূর্তি মেরেছিস্। উঠে দাঁড়া।

ঝটিকা আক্রমণে মৌতাত ছুটে গেছে, তবু চোখের সামনে কেন এত ধোঁয়া! ছেঁড়া ছেঁড়া! পাতলা পাতলা!

এক পাতি কনস্টেবল্ লাঠির ডগায় করে প্যান্টশার্ট ছুড়ে দিল,—তিন গোনার মধ্যে পরে নে। নইলে অ্যামন ক্যালাবো...

চন্দন দু' হাতে নিজের চুল খামচে ধরল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজকর্মচারী চন্দন রায়চৌধুরীর কী বেমক্কা অবস্থা! সাধারণ এক কনস্টেবলও তাকে অবলীলায় বেইজ্জত করছে! ওফফ্।

ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে বড় হলঘর পার করাচ্ছে কনস্টেবল। কলার ধরে হিঁচড়ে নামাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে। ফুটপাথে নেমে চন্দন বারেকের জন্য তড়পাল,—ডু ইউ নো হু অ্যাম আই? জানেন আমি একজন রেস্পেক্টবল্ ভদ্রলোক?

—চোপ্। প্যান্টের জিপার ঠিক করে লাগা। হুঁহ্! ভদ্রলোক! চল্ তোর ভদ্দরলোকি দেখছি!

এক গুঁতোয় চন্দন ভ্যানের ভেতর। মেজাজ এক্কেবারে মরে কাদা, বিলিভ মি, আমি ভদ্রলোক। রিয়েল ভদ্রলোক।

হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা। খ্যাক খ্যাক খ্যাক খ্যাক।

তারজাল ঘেরা অন্ধকার পুলিশ ভ্যানে কারুর মুখই পরিষ্কার দেখা যায় না, তবু মুখ ঢেকেছে চন্দন।

তনুময় চ্যাটার্জি কানের কাছে ফিস ফিস করল,—কথা বলবেন না রায়চৌধুরী। আরও বিপদে জড়িয়ে পড়বেন। কোনওভাবেই অফিসিয়াল আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ করবেন না। ঠোঁটে সিল মেরে বসে থাকুন। থানায় সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।

চন্দনের হাঁটুতে হাঁটুতে ডুগডুগি বাজছে,—কী হবে চ্যাটার্জি? থানায় গেলে তো সব জানাজানি হয়ে যাবে! আমার বৌ! আমার ছেলে! আমার মা! আমার বুড়ো মা! আমি মরে যাব চ্যাটার্জি!

—আহ্, চুপ করুন। শর্মা কেটে গেছে। ও খুব চালু মাল। সব দিক সামলে নেবে। কাকপক্ষী টের পাবে না।

চন্দন লাথি মেরে গা থেকে লেপ ফেলে দিল। জানুয়ারির শীতেও কুলকুল ঘামছে। এখনও এত কিসের ভয়! সে তো আবার এখন নিরাপদ খাঁচায়!

ছোটবেলায় ভয়ের একটাই ছবি ছিল চন্দনের কাছে। স্কুল যাওয়ার পথে বালক চন্দন পুকুরধার ধরে ছুটছে। পুকুর আর রাস্তার মাঝে স্টোন্‌চিপসের

www.boiRboi.blogspot.com

পাহাড়। চন্দন দৌড়ে স্টোনচিপসের পাহাড়ে উঠল। নামতে গিয়ে সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। সামনেই এক শঙ্খচূড়। চন্দনের থেকে মাত্র দু' হাত তফাতে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বল রোদে দুলছে মৃদু। চন্দনের পায়ের তলা থেকে পাথরকুচি সরে যাচ্ছিল, আতঙ্কে তালু শুকনো। মাত্র দশ হাত দূরে কাঁচামাটির পথ, অবিরাম পথচারীদের আনাগোনা সেখানে, কিন্তু কিছুতেই তাদের ডাকতে পারছিল না চন্দন। চিৎকার করতে চাইছে, একটি শব্দও ফুটছে না গলায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শরীর বিবশ। দশ সেকেন্ড। কুড়ি সেকেন্ড। হঠাৎই সাপ নিতান্ত অবহেলায় পথ ছেড়ে দিল চন্দনকে, মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

স্কুলে সারা দিন চন্দন কথা বলতে পারেনি। বাড়ি ফিরে জ্বরে বেহুঁশ। জ্বরের ঘোরে অদ্রিনাথকে সাপটার কথা বলেছিল চন্দন। অদ্রিনাথ আশ্বস্ত করেছিলেন,—দূর বোকা, সাপকে অত ভয় পাওয়ার কী আছে?

—ভয় পাব না! ছোবল মারলে মরে যেতাম যে!

—কাপুরুষরা ছোবল খেয়ে মরে না, ছোবলের ভয়েই মরে যায়।

চকিত ঝটকায় মশারি সরিয়ে চন্দন বিছানা থেকে নামল। অভ্যাসের আন্দাজে হাত বাড়াল ড্রেসিংটেবিলের দিকে। রোজকার মতোই অনুরাধা টেবিলে রাতের গ্লাস জগ সাজিয়ে রেখে গেছে। পুরো জগের জল নিমেষে নিঃশেষ। হাত দুটো কী অসম্ভব কাঁপছে!

চন্দন রায়চৌধুরী হাউ হাউ করে কাঁদছে, পুলিশভ্যানে বসে,—আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমাকে ছেড়ে দিন।

আবার হাসি। এবার মেয়েরা। কেউ একজন শব্দ তুলল মুখে। চুকচুক চুকচুক।

জীবনে আরেকবার পুলিশ অফিসারের পা জড়িয়ে ধরেছিল চন্দন। কলেজ লাইফে।

হিন্দু হোস্টেলে চন্দনের বেশ কয়েকজন বন্ধু ছিল। তখন উত্তাল রাজনীতির যুগ। চন্দন কখনও রাজনীতিতে জড়ায়নি। মাঝে মাঝে নিছক আড্ডা দিতে যেত বন্ধুদের হোস্টেলে। সমীরণ বলে এক বন্ধু সে সময় প্রথম বোমা দেখিয়েছিল তাকে, ছ'ঘরা রিভলভারও। তোষকের নীচে রিভলভার রেখে শুত সমীরণ। রিভলভার হাতে নিয়ে দেখতে গিয়ে চন্দন ঠক ঠক করে কেঁপেছিল। পুলিশ বোধহয় নজরে রাখছিল তাকে। একদিন বৌবাজারের মোড়ে ধরল। সাদা পোশাকের পুলিশ কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে কথা বলছে,—তুমি তো ভাই লক্ষ্মী ছেলে, গুলি বোমার রাজনীতি কি তোমাকে মানায়?

—আমি জানি না স্যার, কিচ্ছু জানি না। বিশ্বাস করুন...

—কেন মিছিমিছি জড়িয়ে পড়ছ ভাই? একবার তুলে নিয়ে গেলে কোত্থেকে কী হয়ে যাবে...।

চন্দন ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল,—আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমি...আমি...

সেই সাপটাকে দেখতে পাচ্ছিল চন্দন। চাপের মুখে উগড়ে দিল বন্ধুর নাম। কী অস্ত্রশস্ত্র দেখেছে। কোথায় দেখেছে।

এক সপ্তাহ পরে দক্ষিণেশ্বরে লাশ পাওয়া গিয়েছিল সমীরণের। তার পর বহু দিন চন্দন কলেজ স্ট্রিট মাড়ায়নি। ভয়ে? না প্রতিহিংসার আতঙ্কে? না আত্মধিক্কারে? হিন্দু হোস্টেলেও আর পা রাখেনি কোনও দিন।

ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় চন্দন চোখ রাখল। ছমছম আলো আঁধারে কিছুই স্পষ্ট নয়, নিজের মুখও নিজের কাছে ভূতের মুখোশ। কম্পিত হাতে সিগারেট ধরাল একটা। রাজা কী গনগনে চোখে তাকে দেখছিল!

—সত্যি কথা বলছ বাবা?

—ব্যাপার কী বল তো? এ-ভাবে কথা বলছিস কেন? বললাম তো একটা সিক্রেট কাজ ছিল।

—তোমার মুখচোখ এ রকম কালো লাগছে কেন?

—হবে না! ক'দিন ধরে ঘুম নেই...বিশ্রাম নেই...

ভাগ্যিস কথা বলার সময় বিন্দুমাত্র গলা কাঁপেনি চন্দনের! অনুরাধার সামনেও না।

—কোথায় ছিলে তুমি?

—কেন শর্মা খবর দেয়নি?

—সত্যিই কাজে গেছিলে?

—আশ্চর্য! মিথ্যে বলব কেন! ভয় কাটাতে রাগ আনছিল চন্দন,—আমি জানতে চাই এত জেরার মানে কী, অ্যাঁ?

প্রতিভা ছেলের বুকে হাত রেখেছিলেন,—রাগ করছিস কেন বাবা? তুই বাড়ি না ফিরলে অনুর চিন্তা হবে না?

—চিন্তা নয় মা, একে বলে সন্দেহ। অনুর মন দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে।

—ও, আমার মন ছোট? তুমি বুঝি মহামানব?

—আহ্, অনু, আস্তে। প্রতিভা প্রাণপণে থামিয়েছিলেন দু'জনকে, রতনের মা রয়েছে, পাড়াপ্রতিবেশী রয়েছে, চেঁচামেচি করে আর লোক হাসিও না।

ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলছে। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দু-চারটে আলোর কণা বেয়াড়া টিটকিরির মত উঁকি দিচ্ছে ঘরে। বন্ধ শার্শির বুকে লেপটে আছে রাস্তার ঢলানি বাতি। নাইটল্যাম্পের মিনমিনে অনুনয় তার বিদ্রূপে মলিন।

চাকরি পাওয়ার ছ' মাসের মাথায় চন্দন প্রতিভার জন্য নামী কোম্পানির রেকর্ডপ্লেয়ার কিনে এনেছে, সঙ্গে শচীন দেববর্মনের লঙপ্লেয়িং রেকর্ড। মা শচীনদেবের গান খুব ভালবাসেন। বাবাও। তাঁদের জন্য অসৎ পথের টাকার প্রথম অর্ঘ্য। অদ্রিনাথ কটমট চোখে দেখলেন যন্ত্রটাকে,—হঠাৎ এ সবের মানে কী চাঁদু? বাড়িতে তো রেডিও রয়েছে!

www.boiRboi.blogspot.com

—মা এত গান ভালবাসে...। রেকর্ডটা দ্যাখো, কী ভাল ভাল গান আছে!

—থাক। কত পড়ল?

—ন'শো।

—নঅঅশো! তুই এত টাকা কোত্থেকে পেলি?

চন্দন ঢোক গিলে তর্ক জুড়েছিল,—বারে, আমি মাসে মাসে জমাতে পারি না?

ছেলেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন অদ্রিনাথ,—এই ক'দিনে এত টাকা জমালে? আশ্চর্য! বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

চন্দন রেগে আগুন,—বাবার সব কিছুতেই বড় বেশি সন্দেহ মা! আমাকে কী ভাবে বলো তো, অ্যাঁ?

চন্দন বিছানায় ফিরল। অসত্য ভাষণ অন্যের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারে, কিন্তু নিজের কাছে? চোখ চেপে বন্ধ করে শুয়েও চন্দন নিজের কাছ থেকে পালাতে পারছে কই?

লাল শিফন কি ভ্যানে ছিল সে দিন! শীলা সেন বলেছিল,—আজ আপনাকে একদম ফ্রেশ দেব। গার্ডেন ফ্রেশ। ভারজিন। ভাল বাড়ির মেয়ে। লেখাপড়া জানে।

সন্ধে থেকে ক' পেগ খাওয়া হয়েছিল সে দিন? পাঁচ? ছয়? বারে বসেই তো যা...। তারপর?...তারপর? শীলা সেনের ফ্ল্যাটে সবে তো তখন গ্লাস বোতল সাজিয়েছে মেয়েটা। সঙ্গে ঝাল মাছভাজা। পোট্যাটো চিপস্।

—আমি চিপস্ চাই না। মাছভাজা খাব। টাটকা টাটকা। ঝাল ঝাল। তুমি নাকি টিনএজার?

—হি হি হি হি। কী নেবেন সঙ্গে? স্কচ?

—নেব। তার আগে এসো, আমার মাছভাজাটাকে চাখি একটু।

একটু। হ্যাঁ একটুই। তারপরেই তো দরজা হাট। আচমকাই।

চ্যাটার্জি! শালা চ্যাটার্জিই সে দিনের ঘটনার জন্য একমাত্র দায়ী। শর্মা পই পই করে বারণ করেছিল, দিনটা আজ ভাল নয় দাদা। রাহু আজ শনিতে ঢুকছে। সন্ধেবেলা গাড়ির নতুন টায়ার পাংচার হল। অত দিনের নীলার আংটি হারিয়ে গেল বারের টয়লেটে। দু' দুবার বেড়াল রাস্তা কাটল। আই সোয়্যার দাদা, এ সবই অশুভ লক্ষণ। শীলা সেন আজ বাদ দিন। তার চেয়ে চলুন আমার নিউআলিপুরের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট বিলকুল ফাঁকা। যদি বলেন তো হোল নাইট ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি। শর্মার কথাই শোনা উচিত ছিল। চ্যাটার্জি হারামজাদা নাস্তিকের ডিম! বলে মেয়েছেলে ঘাঁটার জন্যও পাঁজি দেখবেন শর্মা!

চন্দনের গা গুলিয়ে উঠল। নোংরা বোঁটকা গন্ধটা তার ঘরেও ঢুকে পড়েছে যেন। পেচ্ছাপ পায়খানা তাড়ি ধেনোর অসহ্য উৎকট মিশ্রণ। তার সঙ্গে চ্যাটার্জির ভাঙা রেকর্ড। কোথায় চাকরি করেন বলবেন না। কোথায় চাকরি

করেন বলবেন না।

কালিঝুলি মাখা দেশলাই-এর খোলের মতো ঘরে একটা আধমরা হলদেটে বালব। দেওয়ালে টাল খেয়ে এক বদখত লোকের গায়ে উপুড় হয়ে পড়ল চন্দন, লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অন্য পায়ে লাথি চালিয়েছে। চন্দন আবারও হুমড়ি খেয়ে নিজেকে সামলালো।

তনুময় চ্যাটার্জি চেঁচাচ্ছে,—বুলাও অফিসার কো।

তারজালের ওপারে টুলে উপবিষ্ট কনস্টেবল নির্বিকার। বাঁ হাতের তেলোয় খৈনি রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আয়েশ করে পিষছে,—কা হ্যায় ?

—তোমাদের ওসিকে ডাকো।

লোকটা জিভের তলায় খৈনি রেখে থুতু ছেটাল,—সার এখুন বিজি।

—হ্যাঙ ইওর বিজিনেস। যা মাল চায় পাবে। অত রোয়াব কিসের, অ্যাঁ ?

ভিতরের গুণ্ডা মতন একজন ঘেঁটি ধরে বসিয়ে দিল চ্যাটার্জিকে,—হুইই, রাত্তিরে আমার ঘুমের ডিশটাপ্ ভাল লাগে না।

দুটো পকেটমার শেয়ালের মতো হেসে উঠল,—বিলিতি টেনে বাবুরা পাত্তি নাচাচ্ছে রে। সোহাগ চাঁদবদনী পাত্তি নাচো তো দেখি!

এক লুঙ্গি পরা আধবুড়ো ছোটলোক দেওয়ালে হেলান দিয়ে মৌজ করে বিড়ি টানছিল, মুখের ওপর কটু ধোঁয়া ছাড়ল, কী ওস্তাদ, বছরটা পড়বার আগেই রডের কেসে ফেঁসে গেলে!

গ্রহ। গ্রহই। চ্যাটার্জিটাই জ্যান্ত অলম্বুষ। পারলি তুই গ্রহ বাঁচাতে ? থানায় গিয়ে খুব তো কেরদানি দেখালি! হুল্লা! গালিগালাজ! তড়পানি! শাসানি! মাঝখান থেকে কেস পুরো হাতের বাইরে। ওসি খেপে টঙ। মুঠো মুঠো টাকা দেখিয়েও শর্মা ফেল। শর্মার উকিল ফেল। কোন এক কেষ্টবিষ্টুর নাকি গুরুতর কমপ্লেন আছে, শীলা সেনের কোনও মক্কেলেরই থানা থেকে বেল হবে না। মেয়েছেলেগুলো সব মেয়ে-পুলিশের হাত ধরে লালবাজার লকআপে। চ্যাটার্জি আর চন্দনরা রাতভর থানার লালভক্ষ নরকে।

চন্দন সজোরে মাথা ঝাঁকাল। পূতিগন্ধময় দৃশ্যটাকে চোখ থেকে মুছে ফেলতে চাইছে। তবু কেন হিংস্র হায়নার মতো দৃশ্যরা টুঁটি চেপে ধরে বার বার!

এক পাল বেশ্যা আর ছোটলোকদের সঙ্গে কাঠগড়ায় উঠছে চন্দন। রুমালে মুখ ঢেকেও রেহাই নেই, কোর্টসুদ্ধ লোক যেন চন্দনের দিকেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, ওই দ্যাখ ওটা সরকারি অফিসার চন্দন রায়চৌধুরী। গেজেটেড র‍্যাঙ্ক। গড়িয়ার ভবতারণ স্কুলের নীতিবাগিশ বাংলার শিক্ষক অদ্রিনাথ স্যারের একমাত্র ছেলে। ফ্যামিলিম্যান। মাতাল। ঘুষখোর। অফিসার। দুশ্চরিত্র। ভদ্রলোক।

কোর্টেও শর্মা শেষরক্ষা করতে পারল না।... যে মহিলার ফ্ল্যাট থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই ফ্ল্যাটের নীচে একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল

www.boiRboi.blogspot.com

আছে। ওই স্থানে এরকম কার্যকলাপ শুধু অনৈতিকই নয়, চরম সামাজিক পরিবেশদূষণও বটে। এ ছাড়া শ্রীমতী শীলা সেনের নামে নারী পাচারের লিখিত অভিযোগ আছে। এক্ষেত্রে তাঁর ফ্ল্যাটে কারা আসে, কেন আসে এ সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আদালত অভিযুক্তদের জামিন নামঞ্জুর করে আরও সাত দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ দিচ্ছেন।

ভাগ্যিস সাত্যকি কাল দেবদূত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল, কিচ্ছু চিন্তা করবেন না চন্দনদা। আমি এসে গেছি। লোয়ার কোর্টে বেল্ হয়নি তো কী আছে, আমরা আজই হাইকোর্ট মুভ করছি। আজ কালের মধ্যেই কেস্ ক্লিয়ার করে দেব। নরেন্দ্র শর্মার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, শর্মা আপনার অফিসকে তাপ্পি পরিয়ে দিয়েছে। ওসিও পকেটে। কেউ কিছু জানেনি এখনও। বৌদিও না।

চন্দন অনেকক্ষণ পর অনুরাধার গলা শুনতে পেল। ড্রয়িংরুম থেকে অনুরাধা রাজাকে বলছে,—ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েছিস্ ? না আমি দিয়ে দেব ?

—দিয়ে দাও। আমি বাথরুম থেকে এসে শুয়ে পড়ছি।

অনুরাধা ঘরে এসেছে। চন্দন তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। চোখ বুজেই টের পাচ্ছে অনুরাধা আলো জ্বালাল ঘরের। জলের জগ নিয়ে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। ফিরল। দুটো স্টিলের গ্লাসে জল ভরে ঢাকা দিল। আলো নিভিয়ে বিছানায় এসেছে।

অনুরাধার নিশ্বাসের আসাযাওয়া শুনতে পাচ্ছিল চন্দন। একই বিরতির পর ঈষৎ উষ্ণ বাতাস ঘাড়ে এসে ঠেকছে। এই শব্দ, এই উষ্ণতা ক্রমশ নির্জীব করে তুলছিল চন্দনকে।

হঠাৎ অনুরাধা বলে উঠল, —তুমি মিথ্যেবাদী।

কথাটায় কোনও প্রশ্ন নেই, উত্তরের অপেক্ষা নেই, যেন শুধু এক সত্যঘোষণা।

সবুজ অন্ধকারে অনুরাধা ঠেলল চন্দনকে,—শুনছ ? আমি জানি তুমি ঘুমোওনি। মটকা মেরে পড়ে আছ। তুমি একটা মিথ্যেবাদী।

চন্দন চিত হল। খানিকটা ক্ষুব্ধ ভাব আনল গলায়,—মিথ্যেবাদী বলছ কেন ?

—আমি তোমার অফিসে গেছিলাম। সরকার, মণ্ডলবাবু সকলের কাছে খোঁজ করেছি। অভিষেকও এসেছিল বাড়িতে।

চন্দন পলকে কাঁটা হয়ে গেল, তারা কী বলেছে ?

—তুমি অফিসের কাজে যাওনি।

ফুসফুসের বায়ুটাকে প্রাণপণে চেপে কয়েক সেকেন্ড কাঠের মতো শুয়ে রইল চন্দন। চাপ বাড়তে বাড়তে ফুসফুস ফাটিয়ে দিচ্ছে। দু হাতের মুঠো শক্ত রেখে চন্দন খুব ধীরে, একটু একটু করে, বুক থেকে বার করল বাতাসটাকে। এত ধীরে যেন সে নিজেও শব্দ না পায় নির্গমনের। যেন

সামান্যতম হাওয়ার স্পন্দনেই সব মিথ্যেটুকু ধরে ফেলবে অনুরাধা।

—মড়ার মতো পড়ে থেকো না। এ খাটে আমি আঠেরো বছর ধরে শুচ্ছি, তোমার কোনও ছলচাতুরি বুঝতে আমার বাকি নেই। সত্যি করে বলো কোথায় গেছিলে ?

চন্দন শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় বলল,—সত্যি কথা বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে ?

—তবু বলো। শুনি।

চন্দনকে যেন ভূতে পেয়েছে। বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল,—সেদিন রাত্রে ফেরার জন্য ট্যাক্সি খুঁজছি, হঠাৎ চ্যাটার্জি বলল রায়চৌধুরী আজ আর বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না। বউ ছেলেমেয়ে শিলিগুড়ি গেছে, কেউ ঝামেলা করার নেই, চলুন আজ আমরা একটু বোহেমিয়ান হই। শর্মা রাজি হল না। আমিও প্রথমটা কিন্তু কিন্তু করছিলাম, তারপর চ্যাটার্জি আমাকে এমন সব কথা বলল! বলল আমি নাকি হেনপেকড্। ছেলের পোঁধরা। মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ। আমারও কেমন রাগ হয়ে গেল, আমিও বললাম চলুন, বাড়ি ফিরে নয় সকালে বউ-এর একটু বকুনিই খাব। তখনও কি ছাই জানি এভাবে ফেঁসে যাব। শর্মা ফিরে গেল, আমরা ট্যাক্সি ধরে সোজা ডায়মন্ডহারবার। ওখানে নদীর ধারে বসে রাত দুটোর সময় মাছভাজা খাচ্ছি, দুম করে চ্যাটার্জি বমি শুরু করল। তার সঙ্গে অসাড়ে পায়খানা। ফুড পয়জনিং। হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। সে প্রায় যায় যায় অবস্থা। স্যালাইন চলছে। আমি গেলাম ফেঁসে। এক মুহূর্ত হাসপাতাল থেকে নড়তে পারিনি। এই তো চ্যাটার্জিকে বিকেলে কোনওভাবে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে··· বিশ্বাস না হয় তুমি চ্যাটার্জিকে ফোন করে দ্যাখো।

এক দমে কথাগুলো শেষ করেই চন্দনের হুঁশ ফিরল। এ কি বিটকেল গাঁজাখুরি গল্প ফাঁদল সে! তার কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে! এরকম আষাঢ়ে গল্প কোন বউ বিশ্বাস করতে পারে! তাও আবার নতুন বউ নয়, দেড় যুগ ধরে স্বামীঘাঁটা বউ!

চন্দন পল গুনছে। অনুপল গুনছে। এক্ষুনি ভেঙে পড়বে তার জলের প্রাসাদ। এখনও চুপ করে আছে কেন অনুরাধা ? কেন রান্নাঘর থেকে বঁটি এনে কোপ মারছে না তার গলায় ? কেন ছিঁড়ে নিচ্ছে না তার জিভ ?

চন্দনকে স্তম্ভিত করে অনুরাধা আচমকাই নরম অনেক,— শর্মা কেন তা হলে বলে গেল তুমি অফিসের কাজে গেছ ?

আআআহ্! মিথ্যে কী মহান শক্তিদাতা! জঠরের অন্ধকার থেকে সহস্র নাড়ি ছিঁড়ে বুঝি এই প্রথম পৃথিবীতে নিশ্বাস নিল চন্দন। এখন শুধু কথার পিঠে কথা সাজিয়ে যাওয়া।

—শর্মাকে আমিই বারণ করেছিলাম বলতে। ছেলেটার সামনে পরীক্ষা, তার আগে আমি হুট করে বেড়াতে চলে যাব ? নিজেকেই কেমন অপরাধী

www.boiRboi.blogspot.com

লাগছিল। তোমার যখন সন্দেহ হচ্ছিল তুমি শর্মাকে ভাল করে জিজ্ঞেস করতে পারতে। শর্মাকে ফোন করতে পারতে। শর্মার বাড়িতে যেতে পারতে।

—গিয়েছিলাম কাল। তোমাদের শর্মাকে বাড়িতে পাইনি। ওর বউ বলল ভোরবেলায় কোন্ প্রোমোটারের সঙ্গে নাকি বেরিয়ে গেছে।

চন্দন ছোট্ট হোঁচট খেল। এ তথ্যটা তার জানা ছিল না। আরেকটু সাধু সাজার চেষ্টা করল,—আমার তো আগে থেকে কোনও প্ল্যান ছিল না, তা হলে তো সাত্যকিকেই পার্কস্ট্রিটে বলে দিতে পারতাম।

—সাত্যকি তা হলে ঠিকই বলেছিল! তুমি সাত্যকিকে দেখতে পেয়েছিলে ?

—না দেখার কী আছে! সাত্যকি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে দুটো লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। সিগারেট ধরাল···

অনুরাধা চুপ হয়ে গেল। একেবারে নিঝুম। কী যেন ভাবছে। বেশ খানিকক্ষণ নীরব থেকে প্রশ্ন করল,—তুমি যখন আটকেই গেলে, ডায়মন্ডহারবার থেকে একটা ফোন করতে পারতে!

—কী করে করব ? চোখের সামনে একটা লোক মরো মরো, তখন কি মাথার ঠিক থাকে ? তা ছাড়া তুমি তো জানো আমি অফিসট্যুরে গেছি, অফিসট্যুরে গেলে কখনও দরকার ছাড়া ফোন করি ? তিনদিনের জন্য গেছি··· যেতেই পারি। আমি কি করে ভাবব তুমি আমার অফিসে গিয়ে···। অফিসের লোকরা কি ভাবল বলো তো ? তোমার জন্য অফিসেও আমার মানসম্মান···

চন্দনের মুখে হাত চাপা দিল অনুরাধা,—তুমি আমাকে ছুঁয়ে বলো সব সত্যি বলছ ?

—মিথ্যে কেন বলব! তোমরাই উল্টোপাল্টা ভাবছ। যাদের জন্য জীবন-পাত করি, তারাই...

—না। তুমি ছেলের দিব্যি দিয়ে বলো সত্যি বলছ।

—বলছি। বলছি। বলছি। ছেলের দিব্যি।

অনুরাধা কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড়। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—আমাদের মরা মেয়ের দিব্যি দাও।

চন্দনকে যেন পাহাড় থেকে ঠেলে দিল কেউ। শূন্যে ভাসতে ভাসতে খাদে পড়ছে চন্দন। নীচে। বহু নীচে।

রাজার ঠিক পরপরই এসেছিল মেয়েটা। দেড় বছরের বেশি থাকেনি। আধো আধো বুলি ফুটেছিল মুখে। বাব্বা। দাদ্দা। রাগকে বলত দাগ। জলকে বলত দদল। চন্দন ফিরলেই ঝাঁপিয়ে আসত কোলে। নিজস্ব দুর্বোধ্য ভাষায় কত কি যে বলতে চাইত বাবাকে। কুলকুল হেসে উঠত। কারণে। অকারণে। একটা চুমু খেলে দশটা চুমু ফিরিয়ে দিত। সেই মেয়ে দুম করে মেনিনজাইটিসে···।

আজ এই অলীক রজনীতে বুবুনের কথা কি না মনে করিয়ে দিলেই চলছিল

না অনুরাধার !

গলার কাছে জমাট ডেলা গিলে নিল চন্দন,—তার দিব্যি দিলেই কি তুমি সন্তুষ্ট হবে ?

—না। থাক্। অনুরাধার শ্বাস ভিজে গেছে,—তুমি ঘুমোও।

পাঁচ

বাড়ি থেকে বেরনোর আগে আরেকবার দরখাস্তগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিল লাজু। খবরের কাগজের কাটিং-এর সঙ্গে ঠিকানা পোস্টবক্স মিলিয়ে দেখল। দুটো আবেদন ছোট প্রাইভেট কোম্পানির কেরানি পদের জন্য। ওগুলো হবে না, লাজুও জানে। সব জায়গায় আজকাল কম্পিউটার জানা লোক চায়, লাজু কোন কম্পিউটার কোর্স করেনি। একটা দরখাস্ত আছে নার্সারি স্কুলের জন্য। শিক্ষিকার। আরেকটা এক ট্রাভেল এজেন্সিতে রিসেপশনিস্ট। এরা হয়তো ইন্টারভিউতে ডাকলেও ডাকতে পারে।

পাঁচ দিন ধরে বাড়ি একদম ফাঁকা। নীলিমার বাৎসরিক কাজে যাঁরা এসেছিলেন সবাই চলে গেছেন একে একে। সাত্যকির মামা মামি। পিসিমা। পরশু ইন্দুভূষণও ছোট ছেলের সঙ্গে বাঙ্গালোর পাড়ি দিয়েছেন। মাস দুয়েক থাকবেন ওখানে। লাজু সাত্যকি বেরিয়ে গেলে দশ বছরের পঙ্কজই এখন দুর্গের প্রহরী।

চিঠিগুলো ব্যাগে পুরে পঙ্কজকে ডাকল লাজু,—কী করছিস ?

পঙ্কজের দু' হাত মাটিতে মাখামাখি,—গোলাপ গাছটা কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছে মামি, তাই একটু মাটিটা খুঁড়ে...এখানে গোবর পাওয়া যায় না, না মামি ?

গাছগাছালিতে পঙ্কজের উৎসাহ খুব। ইন্দুভূষণেরও। মাঝে মাঝেই বাজার থেকে ফুলের চারা কিনে আনেন তিনি। পুরনো আমলের বাড়িটার পিছনে ছোট্ট কাঁচা উঠোন আছে, সেখানেই শুরু হয় দু'জনের ফুলের পরিচর্যা। এবারে বেশ কয়েকটা বড় ডালিয়া হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকাও। এখন গোলাপ ফুটলেই শান্তি পাবে পঙ্কজ।

লাজু মৃদু ধমক দিল,—আর কী ! রাস্তায় বেরিয়ে গরুর পেছন পেছন দৌড়োও। অঙ্কগুলো হয়েছে ? আজ যদি বিয়োগ ভুল হয়...

যোগ আর গুণে পঙ্কজ বেশ দক্ষ। বিয়োগ আর ভাগে তার প্রবল অনীহা। সেয়ানা ভঙ্গিতে পঙ্কজ প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল,—তুমি বেরোচ্ছ মামি ? কখন ফিরবে ?

—আমার ফিরতে সন্ধে হবে। তার মধ্যে অঙ্কগুলো যেন হয়ে যায়। আর শোনো, কেউ বেল মারলেই দরজা খুলবে না। দাদুর জানলা দিয়ে আগে উঁকি মেরে দেখে নেবে। মামা ভোরে বেরিয়েছে, হয়তো দুপুরে খেতে আসবে, যত্ন করে ভাত বেড়ে দেবে। দরজার কাছে গিয়ে আরেক বার থামল

www.boiRboi.blogspot.com

লাজু,—বেস্পতি ভারতীরা বিকেলে পড়তে আসবে, দেখবি ওরা যেন জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি না করে। মামার কাগজপত্রে হাত দিলে মামা কিন্তু রেগে যাবে।

—ও তুমি কিছু ভেবো না মামি। পঙ্কজ ওস্তাদের মতো বলল,—ওরা আমাকেও খুব ভয় পায়।

মাত্র ছ' মাসেই মুখচোরা ভাব কেটে গেছে ছেলেটার। লাজু পঙ্কজের চুল ঘেঁটে দিল,—বুঝেছি। তোমার খুব দাপট হয়েছে।

মোড়ের লেটার বক্সে চিঠি ফেলে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল লাজু। একটা বেজে গেছে। মিনিবাসে এখন ভিড় কম। ন্যাশনাল লাইব্রেরির টিকিট কাটতে গিয়ে লাজু হঠাৎই মত বদলালো। বিদিশা তিন চার দিন ফোন করেছে, আজও সকালে একবার করেছিল,—কবে আসছিস তুই ? তাড়াতাড়ি আয়। জরুরি দরকার।

লাজু অবশ্য বলেছিল কাল যাবে। থাক, আজকেই নয় ঘুরে আসা যাক। যদিও বিদিশার জরুরি দরকার মানে হাস্যকর কোনও ব্যাপার। জানিস আমার জা আমাদের দরজায় আড়ি পাতছে ! জানিস রুন্টুর মাস্টারমশাই আমার দিকে কিরকম আড়চোখে তাকাচ্ছিল ! কী করি বল তো ! অথবা আমার আর একটা পাকা চুল বেরিয়েছে, জানিস ! তাপস সেটা দেখেও ফেলেছে ! আমার কী হবে রে ! এমনিতে হয়তো তিন চার মাস কোনও খবরই নেই, কিন্তু বিদিশা একবার ফোন করতে শুরু করলে উদ্ব্যস্ত করে ছাড়বে লাজুকে। ফোনে বলা যাবে না। চলে আয়। আজ গেলে তাও কালকের ফোনের হাত থেকে রক্ষে।

ডালহৌসি পাড়ায় একটা সরু গলিতে বিদিশার অফিস। ব্রিটিশ আমলের বাড়ির দোতলায় তিনখানা ঢাউস ঢাউস কামরা। ঢুকলেই ভিক্টোরিয়ান গন্ধ ঝাপটা মারে নাকে। অফিসটা চালায় এক বিদেশি চার্চ। গ্রামেগঞ্জে তাদের নানান সেবামূলক প্রকল্প আছে। প্রকল্পগুলোর দেখাশুনো, তাদের নতুন নতুন ভাবে সাজানো, নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা এই অফিসের কাজ।

বিদিশা নিজের কিউবিক্‌ল-এর বাইরে দাঁড়িয়ে এক অবাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল, লাজু কাছে যেতে চাপা স্বরে বলল, আমার ঘরে গিয়ে বোস। আমি আসছি।

বিদিশার মুখচোখ বেশ থমথমে। লাজু মিনমিন করে বলল, তুই কি খুব টেনশানে আছিস ? আমি তা হলে আজ...

—আহ, যা বলছি কর। বিদিশা স্বর আরও নামাল, কথা আছে।

বিদিশার ঘরে আসবাব বলতে একটা বড় কাচঢাকা টেবিল, খানচারেক ফোমে মোড়া চেয়ার, ছোট ক্যাবিনেট। টেবিলটা বেশ অগোছালো। কাটগ্লাসের ট্রেতে রাশিকৃত কাগজ দুটো ছোট ছোট লোহার চাকা দিয়ে ঢাকা।

লাজু আলতোভাবে একটা লোহার চাকা গড়িয়ে দিল, ধরে নিল অন্য হাতে। কাচের ওপর অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড পড়ে আছে, একটা

টেবিল-ক্যালেন্ডার।

একটা কার্ড হাতে তুলে দেখছিল লাজু। বিদিশা সাহা। বি-এসসি। এম-এ। এলএলবি। ডিপ্লোমা ইন মাস কমিউনিকেশান। ডিপ্লোমা ইন পাবলিক রিলেশানস। ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স। ওফ, বিদিশা পারেও বটে। আর কিছু ছিল না ? মাধ্যমিক। উচ্চ মাধ্যমিক ! শুধু এই কার্ড দেখেই বিদিশার জীবনী লিখে ফেলা যায়। কেমন হবে জীবনীটা ?

অর্থবান অ্যাডভোকেট সুধন্য ভাদুড়ির একমাত্র মেয়ে। স্কুল থেকেই লেখাপড়ায় ভাল। অসম্ভব স্মৃতিশক্তি। একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের। স্কুল ছুটির পর মাথায় বইখাতার ভারী ব্যাগ ব্যালেন্স করতে করতে বাড়ি ফিরত। প্রথম প্রেম ক্লাস এইটে। প্রেমিককে চিঠিতে লিখল, তোমার বুকের খাঁচা বড় সরু, ভোরে উঠে ডনবৈঠক করতে পার না ? সে প্রেমিক ভোরবেলা উঠতেও পারল না, টিকলও না। দ্বিতীয় প্রেম ক্লাস ইলেভেনে। সে প্রেমিকের স্কুটার ছিল, যখন তখন রাস্তায় বিগড়ে যেত স্কুটারটা, স্টার্ট নিত না। একদিন রেড রোডে স্কুটার গোঁয়ার্তুমি করল, ঠেলতে ঠেলতে ফোর্ট উইলিয়াম অব্দি এসে বিদিশা বাসে উঠে পড়ল। বিদায় বঁধুয়া। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম...। তাপস তার তৃতীয় এবং সম্ভবত শেষ প্রেমিক। বি-এসসি পাশ করার পর পরই বাড়ি থেকে পালিয়ে তাপসকে বিয়ে করে ফেলল বিদিশা। তাপস উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির ছেলে, বিশাল একান্নবর্তী পরিবার, বাবার কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাবুআমলের বাড়ির বিবি হল বিদিশা। শ্বশুরবাড়িতে দিনরাত বনেদিসুলভ স্বার্থপরতা, খেয়োখেয়ি, নীচতা। ওই পরিবারের কড়াইতে হাবুডুবু খেতে খেতে এই কার্ডভর্তি ডিগ্রি ডিপ্লোমা জুটিয়ে ফেলেছে বিদিশা। চাকরিটাও। দুটো বাচ্চাও হয়েছে। আর কী ? আর ?...আর... ?

বিদিশা চেম্বারে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করল। নিজের চেয়ার অব্দি গিয়েও ফিরল দরজায়। অল্প ফাঁক করে কী দেখছে বাইরে। তালুতে তালু ঘষছে।

লাজু জিজ্ঞাসা করল, এ রকম করছিস কেন !

বিদিশা চেয়ারে এসে ঠোঁটে আঙুল চাপল,—আস্তে। শুনতে পাবে।

—কে শুনতে পাবে ?

—সামওয়ান। যে আমার বিরুদ্ধে কন্সপিরেসি করছে।

—অফিসে ?

—হ্যাঁ।

—কিসের চক্রান্ত ?

—রায়চকে আমাদের একটা সাক্ষরতা ক্যাম্পেন শুরু হচ্ছে, তার ফান্ড আমার কন্ট্রোলে। তাই নিয়ে অনেকেই জেলাস।

নতুন খ্যাপামি। লাজু বিদিশার দিকে তাকিয়ে হাসল,—বুঝেছি। কী কথা আছে বলছিলি ?

www.boiRboi.blogspot.com

—তাড়া কিসের ? চা খা। কফি খা। এই, ফ্রুটজুস খাবি ? নীচে খুব ভাল ফ্রুটজুস বানায়। লাজু হ্যাঁ না বলার আগেই বিদিশা বেল টিপল। বেয়ারা ঢুকেছে। —দো ফ্রুট জুস। পাইনঅ্যাপেল।

বেয়ারা নড়ছে না দেখে বিদিশার ভুরু জড়ো হল, আমাকে ডিফাই করছ কেন ? যাও।

—ম্যাডাম পয়সাটা...

—ও। কত ?

—সাত টাকা।

বিদিশা পার্স থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিল।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর বিদিশা বলল,—দেখেছিস ! কেমন ডিফাই করার টেন্ডেসি ? এই জন্যই আমার তোকে দরকার। আই নিড ইউ লাজবন্তী।

—মানে !

—আমি এ অফিসে একজন নিজের লোক চাই। পরশু এসে দেখি আমার ঘরের আলমারি অন্য ডেভেলপমেন্ট অফিসারের ঘরে চলে গেছে। কাল আমার স্টিলর‍্যাকটাও চলে গেল। বলছে নতুন অ্যারেঞ্জ করে দেবে, কিন্তু এখনও দেয়নি। দ্যাখ, পেপারওয়েটগুলো পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে।

—আমি এতে কী করব !

—সাত্যকি বলছিল তুই নাকি চাকরি খুঁজছিস ! তুই এখানে চাকরি করবি। আমার আন্ডারে একটা প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পোস্ট খালি হয়েছে। আমি তোকে নেব। তোর কাজ হবে শুধু গোটা অফিসটা ওয়াচ করে যাওয়া। স্পেশালি ভারগিজ, ভেঙ্কট আর পাইনকে। ওরা কি আলোচনা করে, কখন ডিরেক্টরের ঘরে যায়, টাইম টু টাইম আমাকে রিপোর্ট করে যাবি। স্টার্টিং দু' হাজার। এগ্রিড ?

লাজু সব কথা শুনছিল না, গম্ভীরভাবে বলল,—সাত্যকি তোকে কবে বলল আমার চাকরির দরকার ? সাত্যকিও কি তোর অফিসে ঢুঁ মারে ?

—এখানে আসবে কেন ? বাড়িতে আসে। ও তো এখন তাপসের গ্রেট প্যাল।

লাজু আজকাল সাত্যকির কোনও কার্যকলাপেই চমকায় না। তবু এটা যেন একটু বেশি। সাত্যকি তাপসকে বলত লুম্পেন বুর্জোয়া। লক্কা পায়রা। তিন পুরুষের ব্যবসার তলানি ওড়াচ্ছে। বিদিশার বাড়ি লাজু যেত বলে কত আপত্তি করেছে এক সময়।

লাজু তর্ক করত, তাপসের সঙ্গে আমার কী ! বিদিশা আমার স্কুলের বন্ধু, সে কী দোষ করল যে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারব না !

—তাপসকে বিয়ে করাটাই ক্রাইম। তুমি দেখে নিয়ো ওই তাপস এক দিন নিজের বাড়ির টাইলস খুলে খুলে বেচবে। শেষে হয়তো বউকেই...

সেই তাপস এখন সাত্যকির প্যাল !

লাজু প্রশ্ন করল,—সাত্যকি তোদের বাড়িতে যায় ! কবে থেকে !

—তা মাস তিনেক হবে। এই নভেম্বরে সন্দেশখালি প্রোজেক্টে গিয়েছিলাম, ফেরার পর থেকেই তো দেখি সাত্যকি আর তাপস খুব জমেছে। আমার শ্বশুর দেওর জা ভাসুর সবার সঙ্গে হেভি খাতির। এলেই আমাদের বাড়ি ভাঙা নিয়ে আলোচনা চলছে। পরশু দুপুরে নাকি টাইলস আর দরজা জানালাগুলোর জন্য পার্টি নিয়ে এসেছিল। ভাল দাম দিচ্ছে রে। দেবে না'ই বা কেন ? ইটালিয়ান মার্বেল, বার্মা টিকের দরজা জানালা।

লাজুর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের মতো হাসি খেলে গেল। লুম্পেন বুর্জোয়ারাই তো এখন সাত্যকির সম্পদ।

বেয়ারা দু' গেলাস ট্যালটেলে হলুদ ফলের রস নিয়ে এসেছে। টেবিলে রাখার আগেই বিদিশা হাত বাড়াল,—চেঞ্জ ?

একটা কালচে দু' টাকার নোট আর একটা কয়েন পকেট থেকে বার করে দিল ছেলেটা। বেজার মুখে বলল, গেলাস তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে বলেছে।

দু' টাকার নোটটা অনেকক্ষণ ধরে পরখ করল বিদিশা, এটা চলবে না। পাল্টে নিয়ে এসো।

—গেলাস দেওয়ার সময় নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে যাও। শেষ হলে ডাকব। বেল না দিলে আসবে না।

বিদিশার আদেশের ভঙ্গি দেখে লাজু হাসি চাপতে পারছিল না। বিদিশা লাজুর দিকে কটমট করে তাকাল, তুই হাসছিস কেন ? মনে রাখিস তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছিস।

লাজু রিনরিন করে হেসে উঠল, এখনও হইনি। তারপর তোর তাপসের খবর কী ? সেইই ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠছে ?

—হুঁহ্, তার আর কাজ কী ! দয়া করে ঘুম থেকে উঠে এগারোটায় জলখাবার খাওয়া। তিনটেয় ভাত। আর সন্ধেবেলা সেন্টফেন্ট মেখে ফুলবাবুটি।

—মাঝে ক'দিন বাজারে বসছিল না ? তোর শ্বশুরবাড়ির সেই মার্কেট থেকে ডেলি ভাড়া কালেকশান ?

—ও এখন বড় ভাসুর যায়। রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি কুপন কাটা, পাহাড়প্রমাণ রেজগি গোনা, যে দোকানদার ভাড়া মারছে তার তত্ত্বতালাস করা, এ সব কি আমার বরের পোষায় ? তার ওপর ওই কালেকশান আবার রোজকার রোজ ভাগ হয়। ছ' ছ'টা শরিক। এখন ওই যা শেয়ারের ডিভিডেন্ড আসে। বাড়ির কমন ফান্ড থেকে দু' বেলা খাওয়া জুটে যায়। দিব্যি আছে।

লাজু গ্লাসে চুমুক দিল,—ইসস, এটা তুই ভাল বলেছিলি ! এ তো একদম বিস্বাদ রে !

—ভাল লাগছে না ? আমার তো বেশ লাগে। একটু লাইট কিন্তু রঙটা দারুণ না ? সোনার মতো ?

www.boiRboi.blogspot.com

বিদিশার ওপর মায়া হচ্ছিল লাজুর। কলেজে পড়ার সময় প্যারাগনের বাদামের শরবত পাতলা হয়েছিল বলে থু-থু করে ফেলে দিয়েছিল। আহারে, এখন শরবত সোনা রঙের হলেই খুশি !

লাজু ব্যাগ কাঁধে ঝোলালো। সঙ্গে সঙ্গে বিদিশা হাঁ-হাঁ করে উঠেছে, যাচ্ছিস কোথায় ! তিন মাস পরে দেখা হল, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি ?

লাজু ভয় দেখানো মুখ করে ঠাট্টা করল, তোর বিরুদ্ধে তো অফিসে চক্রান্ত চলছে, এতক্ষণ বাইরের লোক বসে থাকলে তোর বিপদ হবে না ?

ক্ষণিকের জন্য থমকাল বিদিশা। চিন্তা করল কিছু। তারপর ঠোঁট ওল্টাল, কি আবার হবে ! আমি তো তোর ইন্টারভিউ নিচ্ছি।

লাজু ব্যাগ নামিয়ে রাখল, ও, তোকে একটা খবর দেওয়া হয়নি। রুদ্রদা কলকাতায় এসেছে।

—ওল্ড নিউজ। বিদিশা সামনের ফাইলের পাতা ওল্টাল, গত সপ্তাহে এখানে এসেছিল। দেখা করে গেছে।

—তোর অফিসে !

—হুঁউ। তোদের কথা জিজ্ঞাসা করল। আমাদের গড়িয়ার রাহুল তপন কৃষ্ণাদের খবর নিল। ওর বয়লাডিলার কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাল। ওদের লেবারদের বউরা কিভাবে বরদের কাছ থেকে মদের টাকা কেড়ে নেয়...ভাটিখানার দরজায় পালা করে পাহারা দেয়...হাসপাতালের জমি নিয়ে কি রকম গণ্ডগোল হয়েছিল...গভর্নমেন্ট লেভেলে...পলিটিকাল লেভেলে...

একটা শিরশিরে চোরা বাতাস লাজুর শিরদাঁড়া ছুঁয়ে যাচ্ছিল। হিমালয় যে খুব কাছ থেকে দেখেছে সেই জানে হিমালয়ের টান কী দুর্নিবার।

খবরের কাগজে যে দিন রুদ্রর ছবি বেরোল, সে দিনই পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল লাজুর। বাথরুমে আছাড় খেয়ে। সাত্যকি বলে ফেলেছিল রুদ্রর ছবি দেখেই লাজুর এই পতন ! সাত্যকির সন্তান ধারণ করতে চায় না লাজু !

সাত্যকি চতুর, কিন্তু নির্বোধ। সাত্যকি জানে না হিমালয়ের টানে ছুটে গেলেও হিমালয়কে আঁকড়ে ধরা যায় না। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নেশা ধরে যায়, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। সে ভয়ঙ্কর সুন্দর।

লাজু একটি কথাও বলেনি সাত্যকিকে। সামান্যতম প্রতিবাদও নয়। চামড়ার ওপর বিঁধে থাকা কাঁটা উপড়ে ফেলা যায়, কিন্তু যে কাঁটা মনের গভীর গোপনে অসাড়ে রক্তক্ষরণ করে চলেছে তাকে সে তুলবে কেমন করে ?

লাজু উদাস ভাবে বলল,—আমাদের বাড়ি যায়নি। কেমন চেহারা হয়েছেরে রুদ্রদার ?

—স্বাস্থ্যটা ফিরেছে। রঙ অনেক কালো হয়ে গেছে, কিন্তু চোখদুটো কী উজ্জ্বল। বিদিশা বেল টিপল,—গ্লাস নিয়ে যাও। বোলো আজ ফ্রুটজুস ভাল হয়নি। টাকাটাও বদলে এনো।

বিদিশার ওপর একটু একটু রাগ হচ্ছিল লাজুর। একই সঙ্গে রুদ্র আর নোংরা টাকা বদলানোর কথা উচ্চারণ করছে বিদিশা, এ কী বেয়াদবি।

বিদিশার ভ্রূক্ষেপ নেই, কথার পর কথা বলেই চলেছে,—যাই বলিস, সাত্যকির কিন্তু এলেম আছে। আমার ভাশুর তো কিছুতেই পৈতৃক বাড়ি ভাঙায় রাজি ছিল না, সাত্যকি কী ভুজুং ভুজুং দিল, এখন সেই মক্কেলই ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে লাফাচ্ছে। বলতে বলতে হঠাৎ যেন মিলিটারি সিক্রেট ফাঁস করছে এভাবে গলা নামাল বিদিশা,—আমাদের বলেছে আমাদের ফ্ল্যাটটা এদিক ওদিক থেকে কেটে একটু বড় করে দেবে। অন্য কেউ টের পাবে না।

এ তো জানা কথাই। সাত্যকি জানে কোন মাছের জন্য কখন কী চার দরকার। বাড়িওয়ালা ভাড়াটের ঝামেলা মেটাতে কখন গুণ্ডা লাগাতে হবে, কখন টাকা। যে বিধবা মহিলা জমি হারিয়ে বাড়ির দরজায় এসে অভিসম্পাত করছিলেন, তাঁকে না চাইতেই কত টাকা জুগিয়ে গেল সাত্যকি। নিজের টাকা নয় অবশ্য, কাজলের টাকা। বিনিময়ে লিজের নাম করে পুরো জমি হাতিয়ে নিল। টাকা কাজলের। মাথা সাত্যকির। ক্ষমতা সাত্যকির। যোগাযোগ সাত্যকির। একেই তো এলেম বলে!

লাজু উঠে দাঁড়াল,—আজ চলি রে।

—তা হলে কবে জয়েন করছিস? নেক্সট বুধবার জয়েন কর। ভাল দিন। মঙ্গলে উষা বুধে পা।

—ভেবে দেখি। লাজু ঘুরিয়ে অসম্মতি জানাল,—ভাবছি এবার প্রাইভেটে এম-এ'টা দেব। পড়াশুনোও শুরু করেছি।

—তা হলে যে সাত্যকি বলল তুই খুব চাকরি খুঁজছিস?

—খুঁজছি। ঠিক আছে, তোকে জানিয়ে দেব।

—তাড়াতাড়ি জানাস। দেরি করিস না। বিদিশাও উঠে দাঁড়িয়েছে,—এই শোন, চন্দনদা এখন কেমন আছে রে?

লাজু বিস্মিত হল,—কেন! দাদার কী হয়েছে!

—ও, তার মানে এখন সুস্থ?

—তুই আবার কবে অসুস্থ দেখলি? এই তো দশ তারিখেও আমার শাশুড়ির বাৎসরিকে এল...খাওয়াদাওয়া করল!

—না না, তার কয়েকদিন আগে। বলছি কবে দাঁড়া। বিদিশা টেবিল ক্যালেন্ডারে চোখ রাখল,—মাসের একদম প্রথম দিকে। এই ধর, এক তারিখ আমাদের ছুটি ছিল। দু তারিখ অফিস থেকে বেরোইনি। হ্যাঁ তিন তারিখই হবে। তিন তারিখ বম্বে থেকে মাইকেল এসেছিল, ওর সঙ্গে অ্যাসেম্বলি অফ গর্ড চার্চে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে পার্ক স্ট্রিটে...। চন্দনদা ট্যাক্সির সিটে নেতিয়ে পড়েছিল, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দেখে মনে হয় রাস্তায় কোথাও পড়ে-ফড়ে গিয়েছিল! সঙ্গে সাত্যকি। সাত্যকির কাঁধে চন্দনদার মাথা।

—সাত্যকি!

www.boiRboi.blogspot.com

—হ্যাঁ। সাত্যকি। আমি তো দেখে হাঁ। সাত্যকি বলল চন্দনদার নাকি সে দিন মাথা ঘুরে গিয়েছিল! হাইপ্রেশার! ডাক্তার বেডরেস্ট বলেছে! বিদিশা আলতো হাসল,—তা হলে বোধহয় তুই ঘাবড়ে যাবি বলে তোকে কিছু বলেনি। অবশ্য বলছিস যখন তোর শাশুড়ির বাৎসরিকে এসেছে..! যাক গে আমি তোকে বলে ফেলেছি সেটা যেন আবার সাত্যকিকে বলিস না।

লাজু ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না ব্যাপারটা। বৌদি বলল দাদা একত্রিশ তারিখে অফিসট্যুরে গেছে। পয়লা তারিখে সাত্যকি বলল দাদাকে নাকি একত্রিশ তারিখ রাত্তিরে পার্ক স্ট্রিটে দেখেছে। তিন তারিখ সন্ধেবেলা সুস্থ দাদা বাড়ি ফিরেছে! তিন তারিখ বিকেলবেলা পার্ক স্ট্রিটে ট্যাক্সিতে অসুস্থ দাদা! পাশে সাত্যকি! এই ক'দিনে একবারও কেউ বলেনি দাদার অসুস্থতার কথা! সাত্যকি তো না'ই! কোথাও একটা বড় ফাঁক আছে! সেই ফাঁকটার কথা সাত্যকিই জানে।

বিদিশার অফিস থেকে বেরিয়ে মিনিবাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল লাজু। সূর্য টেলিফোন ভবনের পিছনে মুখ লুকোচ্ছে। বেলা ফুরিয়ে এল। লালদীঘির জলে ছোট ছোট ঢেউ। মিনিবাসের লাইন ক্রমশ সর্পিল। অফিসপাড়া ভাঙছিল।

লাজু হঠাৎ দেখতে পেল তার পাশের লাইনে ছোটকু দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য আগে। একটা স্ট্রাইপড টিশার্টে আরও বেশি রোগা দেখাচ্ছে ছোটকুকে। দাদার বিয়ের সময় ছেলেটা কী মোটাই না ছিল! দাদা আদর করে বলত, শালা আমার কুমড়োপটাস। কতই বা তখন বয়স তাদের! বছর দশেক! দাদার দেখাদেখি সমবয়সী ছোটকুকে লাজুও একদিন বলেছিল, কুমড়োপটাস। টেনে এক চড় মেরেছিল ছোটকু। বাবারে, তখন ছোটকুর গায়ে কী জোর!

লাজু ছোটকুকে না দেখার ভান করলেও ছোটকু দেখে ফেলেছে, কী ব্যাপার? এদিকে কোথায়?

—এক বন্ধুর কাছে এসেছিলাম। লাজু হাসল, তোমার গুঁড়োসাবানের ব্যবসা কেমন চলছে? আর তো কই আমাদের তোমার সাবান দিতে আসো না?

—দূর দূর। লাটে উঠেছে। ওসব ব্যবসা আমাদের জন্য নয়। অত ক্যাপিটাল কোথায়? সকালসন্ধে টিভিতে অ্যাড মারো, সুন্দরী মেয়েরা হেসে হেসে লাল নীল কাপড় কাচুক, সাবান বাজারে পড়তে পাবে না। এখন যুগটাই চেকনাইয়ের। তবে সব থেকে ত্যাঁদোড় হল ডিস্ট্রিবিউটারগুলো। চশমখোর। আমাদের মত স্মল স্কেলের পার্টি পেলে পুরো চুষে ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়! মালের পর মাল গিলে অজগর হয়ে বসে আছে, টাকা চাইতে গেলেই খঞ্জনী বাজিয়ে দিচ্ছে, আজ হবে না। আজ হবে না। এদিকে গিয়ে শালার স্টক দ্যাখো, একটা মালও পড়ে নেই।

—তোমার কিন্তু সাবানের কোয়ালিটিটা ভাল ছিল।

—কোয়ালিটি দিয়ে কিস্যু হবে নারে ভাই। বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলবেই। ছোটকু অনাবিল হাসল, তোমার বরেরও তো ব্যবসার খুব রমরমা, তাই না ?

—হুঁউ।

—ওই একটা লাইন। পুরো মাছের তেলে মাছ ভাজা।

লাজুকে একটুও বিঁধল না কথাটা, উল্টে মজাই পেল, বুদ্ধিমান লোকেরা সব লাইনেই মাছের তেলে মাছ ভাজতে জানে। তোমার মোটা বুদ্ধি।

—আগে এত মোটা ছিল না, জানো। অসুখটার পর থেকে...

—কী অসুখ করেছিল ?

ছোটকু লাইন ছেড়ে লাজুর পাশে চলে এল। করুণ মুখে ফিসফিস করে বলল, করেছিল নয়, করেছে। এইডস।

—যাহ ! কি বলছ তুমি ?

—হ্যাঁগো। সত্যি এইডস। এ আই ডি এস। অ্যাকিউট ইনকাম ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। এ অসুখে মরে না, বেশি দিন ভুগলে স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। বুদ্ধি ভোঁতা হতে থাকে।

লাজু ছোট্ট চাঁটি মারল, তুমি দিন দিন আরও ফাজিল হচ্ছ।

—ফাজলামি নয়, সিরিয়াস। তোমার বরকে বলো না একটা যাহোক কিছু চাকরি জুটিয়ে দিতে। রিসেন্টলি আরেকটা ডিজিজও ধরেছে।

—সেটা কী ?

—আছে। এক দিন তোমার বাড়িতে যাব। গিয়ে বলব। ছোটকু চোখ টিপল, তোমার সঙ্গে অন্য একটা দরকারও আছে। একটা বিজনেসের প্ল্যান এসেছে মাথায়। তুমি যদি সাহায্য করো তো এগোতে পারি।

—কি রকম ?

—বসে ডিটেলে বলতে হবে। তুমি কখন বাড়ি থাকো ?

—সন্ধের দিকে এসো।

পর পর দুটো বেহালার মিনি এসেছে। লাজু জানলার ধারে সিট পেয়ে গেল। কাচ বন্ধ, তবু লাল-কালো গুজরাটি শাল ভাল করে জড়িয়ে নিল মাথায়। শাশুড়ির বাৎসরিকের দিন ঠাণ্ডা লেগে দু' দিন বেশ শ্বাসকষ্ট হয়েছিল তার। ছোটবেলার অসুখ। বিয়ের পর অনেক কমে গিয়েছিল, বাচ্চাটা নষ্ট হওয়ার পর নতুন করে ফিরে এল কষ্টটা। লাজু আনমনে শ্বাস ফেলল। সাত্যকি বুঝল না। মানুষ তো তাকেই ভালবাসে যাকে স্পর্শ করা যায়, যাকে জড়িয়ে ধরে পাগল হওয়া যায়, যাকে চুম্বন করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শিহরিত হয়।

সাত্যকি বদলে গেল।

শুধু কি রুদ্রকে ঈর্ষা করেই সাত্যকির এই পরিবর্তন ? নাকি সাত্যকির অন্তরেই লুকিয়ে ছিল লোভের বীজ ? ক্যানসারের অনকো জিনের মত ?

www.boiRboi.blogspot.com

কোথায় যেন পড়েছিল যে কোনও সুস্থ মানুষের কোষেই এই জিন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে। সামান্য উস্কানি পেলেই বিদীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কোষ থেকে কোষে। এক দিন পচে যায় দেহ।

সাত্যকিরও কি আত্মায় পচন ধরেছে ?

ময়দানের কলজে মাড়িয়ে হিংস্র উল্লাসে ছুটছে মিনিবাস। হাওয়াকে ভেঙেচুরে। প্রান্তরে নেমেছে প্রথম মাঘের ধোঁয়াশা। রেসকোর্সের লোহার বেড়া অপার্থিব গরাদের মতো স্থির। বেড়ার ওপারে যেন এক শূন্য পৃথিবী। ছুটন্ত। কিন্তু ফাঁপা। বিলীয়মান।

চিড়িয়াখানার সামনে এসে দাঁড়াল বাস। পশুশালার মরসুমী দর্শকরা কলরোল তুলে ফিরছে। ভিড়ে মিনিবাস উপচে গেল।

অসংখ্য শিশু বৃদ্ধ নর নারীর নিশ্বাসের ভাপে কষ্ট হচ্ছিল লাজুর। মুহূর্তের জন্য সে জানালার নীল কাচ সরাল। একটু তাজা বাতাসের আশায়। সহসা চোখ রাস্তায় আটকে গেছে।

ওপাশের ফুটপাথে সাত্যকি না !

সাত্যকিই তো। লাজু জানলার রডে থুতনি চাপল। সাত্যকি অন্ধকার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। একা একা। ন্যাশনাল লাইব্রেরির গেটের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। অন্যমনস্কভাবে বাসের দিকেও একবার তাকাল। আবার চোখ ঘুরেছে লাইব্রেরির গেটে।

লাজুর নিশ্বাসের কষ্টটা বাড়ছিল। সাত্যকি লাজুকে দেখতে পেল না।

বাড়ি ফেরার পর বেশ ভাল টান উঠছিল লাজুর। বাইরের ঘরে শিশুরা কলকল করছে, শোওয়ার ঘরে বুকে বালিশ চেপে লাজু বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বাইরের ঘরে এসে বলল,—ভারতী বেস্পতি, আজ তোদের ছুটি। বাড়ি যা।

মুখ দেখেই অনেক কিছু পড়তে পারে শিশুরা। ভারতী বলল, তোমার কি অসুখ করেছে মাসি ?

—এ-একটু। আঙুল টিপে দেখাল লাজু, তোর মা কেমন আছে রে ? জ্বর সেরেছে ?

—মা তো আজ কাজে বেরিয়েছে।

—বুঝেছি। ভাল মতো বাধাবে। লাজু দরজা খুলে দিল, তোরা কাল আসিস।

ভেতরে ফিরতে গিয়ে লাজু কী ভেবে দাঁড়াল। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল,

—বৌদি, দাদার কি মাঝে অসুখ করেছিল ? প্রেশার বেড়েছিল ? যে দিন ট্যুর থেকে ফিরল... !

—কই না তো ! কে বলল তোকে ?

—কেউ না। এমনিই আমার মনে হল। সে দিন তেমন কিছু খেল না...মা

ভাল আছে ? লাজু দুটো এলোমেলো কথা বলে লাইন ছেড়ে দিল। নিজের মনে বলল, আমি জানতাম। আমি জানতাম।

ছয়

ব্রততী আর রুমা সমস্বরে বলে উঠল, ওমা ! কী সুন্দর ! কোত্থেকে কিনলে গো দিদি ?

খাটের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে শাড়িটা। স্বর্ণাভ জমির ওপর সোনালি সুতোর ধানছড়া। সোনারঙ জরি। আঁচল চোখ ধাঁধানো রকমের জমকালো।

সরস্বতী পুজোর পর অনুরাধা আজ প্রথম বাপের বাড়ি এসেছে। রাজার পরীক্ষার মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাকি, এখন অনুরাধা পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না। দিবারাত্রি ছেলের সঙ্গে এক তানে বেঁধে রাখতে হয় নিজেকে। আজই শুধু শাড়ি কেনার তৃষ্ণায় বেরিয়েছিল একটু। একটা ঢাকাই জামদানি প্রদর্শনীর আজই ছিল শেষ দিন।

অনুরাধা ভাই-এর বউদের মুগ্ধ দৃষ্টি উপভোগ করছিল। তার হৃদয় এখন আবার সেই বদ্ধ পানাপুকুরের মতো আলোড়নহীন। মাঝে একটা উদ্বেগের ঢিল পড়ে কদিনের জন্য লন্ডভন্ড হয়েছিল ডোবা, চন্দনের স্তোক নতুন করে পানায় ঢেকে দিয়েছে তার উপরিতল।

রাজেন্দ্রাণীর গরিমায় শাড়িটা ছুঁল অনুরাধা, ম্যান্ডেভিল্ গার্ডেনস্-এর মিসেস মজুমদারের বুটিক থেকে কিনলাম। বাংলাদেশ থেকে আনা। দেখে মনে হয় না সোনা বিছোনো আছে ?

ব্রততী রুমা মেয়ে খারাপ নয়। ননদ বাড়িতে এলে দুজনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যদিও দুই জায়ে সম্পর্ক বেশ তিক্ত। প্রচুর রেষারেষি খটাখটির পর হাঁড়ি আলাদা হয়েছে দুজনের। দুজনের বরই সাধারণ চাকুরে এবং যে যার নিজস্ব শিবিরের একনিষ্ঠ যোদ্ধা। মাঝখানে বাবা-মা যুদ্ধক্ষেত্রের নিরপেক্ষ এলাকা। ছোটকু দু'শিবিরেরই ভাড়াটে সৈনিক।

ব্রততী অপ্রিয় প্রসঙ্গটা তুলল, দাম কত পড়ল গো দিদি ?

রুমা বলল, আমি আন্দাজ করব ? দু'হাজার।

অনুরাধা মনে মনে হাসল। সত্যিকারের দাম শুনলে দুটো বউই ভিরমি খাবে। এক্ষুণি কড়কড়ে সাড়ে চার হাজার টাকা গুনে দিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রকৃত দাম এদের সে মোটেই বলবে না। বলবেই বা কেন ? দুজনেই আড়ালে চন্দনের রোজগার নিয়ে অনেক টিকাটিপ্পনী কাটে। সব কানে আসে অনুরাধার। ব্রততীর কথা রুমা পৌঁছে দেয়। রুমার মন্তব্য ব্রততী।

অনুরাধা ঠোঁট টিপে বলল, বাইশশো। বেশ শস্তা নারে ? তিনটে ইনস্টলমেন্টে দেব।

সুরমা চুপচাপ মেয়ে বউদের কথা শুনছিলেন, অনুরাধাকে বললেন, ঘোড়ায়

www.boiRboi.blogspot.com

জিন দিয়ে আসিসনি তো ? কড়াইশুঁটির পুর করা আছে, কটা কচুরি ভাজছি, খেয়ে যা।

অনুরাধা ঘড়ি দেখল, কতক্ষণ লাগবে ? আমার কিন্তু সাতটার আগে ফিরতেই হবে।

—বোস্। সাতটা বাজতে তো দেরি আছে। কটা বেশি করে ভেজে দিই, বাড়ির জন্যও নিয়ে যা। চন্দন কচুরি ভালবাসে...

—ঝটপট করো। ঝটপট করো। আমি আগেই উঠব। ঠিক ছটায়। রাজা ছটায় টিউটোরিয়াল থেকে ফিরবে। রতনের মা যদি জলখাবার না দিয়ে চলে যায়, ছেলের মুখ হাঁড়ি হয়ে যাবে। পড়ায় মন বসবে না।

—সব সময় অত ছেলে ছেলে করিস না তো। ছেলে তোর আর সেই ছোট্টটি নেই। পরীক্ষা এসে গেছে, ওকে একটু নিজের মতো করে শান্তিতে পড়তে দে। সুরমা লঘু ধমক দিলেন মেয়েকে,— তুই ছেলে মানুষ করা দেখালি বটে ! তাও আমার মতো এক গণ্ডা নয়, একটা।

অনুরাধা চুপ করে গেল। মাকে বলে লাভ নেই এ যুগে মায়েদের মতো করে আর ছেলে মানুষ করা চলে না। যুগটা এখন গতির যুগ, ল্যাঙ মারামারির যুগ, গোটা পৃথিবী এখন বিশাল রণভূমি। ডিগ্রি সার্টিফিকেট যত বেশি লম্বা হবে, তত ক্ষুরধার হবে হাতিয়ার। কেউ দাঁড়াতে পারবে না আশেপাশে। তা ছাড়া মা-র হাতে মানুষ হয়ে কিই বা এমন তৈরি হয়েছে মা-র ছেলেরা ? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না ! দিনরাত একে অন্যকে হিংসে করছে ! ছোটজন তো এখনও টোটো কোম্পানির ম্যানেজার।

ব্রততী প্রশ্ন করল,— রাজা মাধ্যমিক পাশ করে সায়েন্স পড়বে তো ?

—এটা একটা প্রশ্ন হল ! রুমাই অনুরাধার হয়ে উত্তর দিল, সায়েন্স তো পড়বেই। যা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ! ওর খুব ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে, তাই না দিদি ? রাজা ডাক্তার হলে আমাদেরও কত ভাল হয়। বাড়িতে হাতের কাছে একটা ডাক্তার থাকে।

ব্রততী ঝাপটা মেরে উঠল,— না না ডাক্তার ভাল না। ডাক্তারদের কোনও ব্যক্তিগত জীবন থাকে না। তার থেকে বরং কমার্স পড়ুক। তোমার ভাই বলছিল এখন নাকি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের খুব ডিমান্ড। যদি একটা ফার্ম খুলে ফেলতে পারে কত লাখ লাখ টাকা রোজগার !

—ডাক্তারদের রোজগার কম নাকি ? যদি কোনওভাবে বাইরে চলে যেতে পারে তো... আমার রাঙাপিসির দেওরের ছেলে তো আমেরিকাতেই সেট্‌ল্ করে গেল। সাজারিতে ভীষণ নামডাক। মাসে মাসে বাবা-মাকে ডলার পাঠায়।

—আমার মেজজ্যাঠার ছেলে চার্টার্ড হয়ে দুবাইতে পাঁচ বছর ছিল। ষাটলাখ টাকা পকেটে নিয়ে ফিরেছে।

দুই ভাজের চাপান-উতোর শুনতে শুনতে অভিভূত হচ্ছিল অনুরাধা। রাজার সম্পর্কে সবার যা প্রত্যাশা সে তো অনুরাধারই পরিশ্রমের ফল। তবু

ঝগড়া যাতে উচ্চগ্রামে না উঠে যায় তাই দুজনেরই মন রেখে বলল, রুমা ভুল বলেনি রে। ডাক্তারদের রোজগার অঢেল। চার্টার্ডদেরও বাজার ভাল। তবে আমার ইচ্ছে রাজাকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে এম বি এ করাব। রাজার বাবারও অবশ্য ইচ্ছে ছেলে ডাক্তারই হোক। কিন্তু ওই মড়াঘাঁটা কাজ! ভাবলেই গা ঘিনঘিন করে।

রুমা একটু যেন ম্রিয়মাণ হল। ব্রততীও খুশি নয়। অনুরাধা তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে দুটো ছোট ছোট বিদেশি পারফিউম বার করল, এই নে, তোদের চন্দনদা তোদের জন্য সেই কবে নিয়ে এসেছিল, আমি দিতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। শুঁকে দ্যাখ, কী সুন্দর জংলী ফুলের গন্ধ!

ততক্ষণাৎ রুমা ব্রততীর চোখ চকচক। অনুরাধা মাঝে মাঝেই দুই ভাইয়ের বউকে এরকম এটাসেটা উপহার ছুড়ে দেয়। এ ধরনের দানে একটা আলাদা সুখ আছে। মোসাহেবদের দিকে রাজারাজড়ার আংটি বোতাম ছোড়ার আত্মপুলক।

সুরমা প্লেটে চারটে কচুরি সাজিয়ে ঢুকেছেন, ছোটকু বলছিল একদিন তোর বাড়ি যাবে, কী দরকার আছে।

—একদিন নয়, আজই যাবে। ওর সেই অশোক বলে বন্ধু আছে, বাড়ির প্ল্যানট্যান করে, তাকে নিয়ে। ওদেরই সাতটায় আসার কথা।

রুমা কৌতূহলী হল, তুমি কি বাড়ি শুরু করছ নাকি দিদি?

—ইচ্ছে তো ছিল আর কিছুদিন পরে করব। আরেকটু টাকাপয়সা জমিয়ে নিয়ে। কিন্তু সল্টলেকে নাকি আর জমি ফেলে রাখতে দেবে না।

সুরমা বললেন, কর, কর, তবু আমার ছেলেমেয়ের মধ্যে একজনেরও তো নিজের বাড়ি হবে। তোর বাবা তো ওসব নিয়ে ভাবলই না কোনোদিন। এই বয়সেও এখনও দিনরাত শুধু ক্লাব ক্লাব আর ক্লাব।

অবিনাশ এককালের নামকরা রেফারি। সত্তরের দশকে বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। তারও অনেক আগে থেকে তিনি ময়দানের এক মাঝারি ক্লাবের কর্মকর্তা। নিজের ক্লাবে গিয়ে ঘণ্টা তিন চার না কাটাতে পারলে ডাঙার মাছের মতো অবস্থা হয় তাঁর। রেলের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর দুপুরে খেয়ে উঠেই মাঠে চলে যান। সংসারের কোনও অভাব অশান্তি তাঁকে ছুঁতে পারে না। তিনিই এ বাড়ির একমাত্র সুখী মানুষ।

রুমা লম্বা একটা শ্বাস ফেলল, হ্যাঁ দিদি, বাড়িটা করেই ফ্যালো। বেশ একতলা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি করবে, সামনে ফুলের বাগান, গেটের দুপাশে পামগাছ ঝাউগাছ।

ব্রততী বলল, দূর, একতলা বাড়িতে বড্ড মশা হয়। একতলায় শুধু বড় ড্রয়িং ডাইনিং থাকবে, বাইরের লোকদের থাকার জায়গা, আর চাকরবাকরদের ঘর। দোতলা হবে পুরো নিজস্ব।

www.boiRboi.blogspot.com

অনুরাধারও সেইরকম ইচ্ছে। চন্দনও একবারে গোটা বাড়ি শেষ করে ফেলতে চায়। তবু অনুরাধা বিনয়ের ভনিতা করল, দেখি ঠাকুরের কৃপায় কদ্দুর কী করতে পারি। মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে এই যথেষ্ট।

সুরমা টিফিনকৌটো প্লাস্টিকে মুড়ে অনুরাধার হাতে দিলেন, তোর শাশুড়ি এখন কেমন আছেন রে?

—আর বোলো না, ব্যথা রোজই বাড়ছে। তোমার জামাই কত বার করে অপারেশান করার কথা বলল, কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। এখন বোধহয় হোমিওপ্যাথি হবে। ও বলছিল কে এক ভাল ডাক্তার আছে মৌলালিতে, সে নাকি এ-সব ব্যথবেদনার চিকিৎসায় ধন্বন্তরী। তাকে দেখিয়ে যদি কিছু উন্নতি হয়।

—নামটা এনে দিস্ তো। ছোটকুকে বলব আমাকেও একদিন নিয়ে যেতে। আমারও কোমরটা বড় জ্বালাচ্ছে।

অনুরাধা মাকে ইশারায় ভেতরের বারান্দায় নিয়ে গেল। বউদের আড়াল করে টাকা বার করল ব্যাগ থেকে— রাখো। পাঁচশো আছে।

সুরমা টাকাটা মুঠোয় নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে হাসলেন, প্রতি মাসে দেওয়ার কী দরকার! আমার বড় লজ্জা লাগে। জামাই-এর খাটুনির টাকা...

—জামাই-এর টাকা আবার কী? জামাইয়ের টাকা মানে মেয়েরও টাকা। আমি ও বাড়ির মালকিন। আমার যাকে যা ইচ্ছে হয় দেব। তোমার জামাই নাকও গলাতে আসবে না কখনও। অনুরাধা খুনসুটি করে মা-র থুতনি নেড়ে দিল,— চশমার ফ্রেমটা এবার বদলাও। ডাঁটি ঝুলছে যে! আর এ মাস থেকে বাবার জন্য হাফ লিটার করে আলাদা দুধ নাও।

মেয়েকে এসব মুহূর্তে রূপকথার রানী মনে হয় সুরমার। তাঁর নিজের সারাজীবনের কষ্ট আজ সার্থক। ঘর বর ছেলে নিয়ে মেয়ে তাঁর বড় সুখী।

বেরনোর সময় ভাইপো ভাইঝিদের আলগা আদর করল অনুরাধা। বড়র দুটি। ছোটর এক। তিনটে ফুলের মতো ফুটফুটে শিশু। তিনজনে ভাবও খুব। বড়দের কূটকচালি এখনও বিষ ঢালতে পারেনি এদের ওপর।

মান্ধাতা আমলের বাড়ির গেটের কাছে ব্রততী দৌড়ে এসে ধরল অনুরাধাকে,— তোমার ছোট ভাইয়ের কীর্তি শুনেছ?

—কী!

—মা তো তোমায় বলল না, চেপে গেল। বাড়িঅলার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে ছোটকু। পরশু নাকি ছোটকুকে রাস্তায় ধরে সোমেশ্বরবাবু যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছেন। সিকি ভাড়া দিয়ে সারাজীবন পরের বাড়িতে কাটিয়ে যাচ্ছিস!... নিজের এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই!... বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর স্পর্ধা!... তোমার বড় ভাই তো শুনে অব্দি ফায়ার হয়ে আছে।... কেন রে বাবা, আর কোনও মেয়ে পেলি না তুই! বিশ বছর ধরে যারা তোদের ওঠাবার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগে আছে...

—বাবা জানে ?

—ঠিক জেনে যাবেন। পাড়ার সবাই যখন জানে, কেউ না কেউ ঠিক এসে চুকলি খেয়ে যাবে। ব্রততীর চোখ বড় হল, কিছু মনে কোরো না দিদি, তোমার ছোট ভাইয়ের রুচিটাও ভাল না। ওই তো মেয়ে! রূপের ধুচুনি! বস্তিমার্কা সাজপোশাক করে। তুমি ওকে একটু বুঝিও। দাদার কথা তো এ কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও কান দিয়ে বার করে দেয়, তোমাকেই যা একটু মানে টানে। আগে কিছু রোজগারপাতির ব্যবস্থা কর, টাকা থাকলে তানিয়ার মতো অনেক মেয়ে আসবে জীবনে। তা না, যত সব... এখন তো আবার কিসব শিকড়-বাকড়ের ব্যবসা মাথায় ঢুকেছে।

অনুরাধা ম্লান হয়ে গেল। দশ বছরের ছোট ভাইটির সম্পর্কে তার একটু বিশেষ দুর্বলতা আছে, সেটা জানে বলেই কি ব্রততী খুঁচিয়ে নিচ্ছে তাকে ? নাহ্, ছোটকুর একটা চাকরি দরকার। খুব তাড়াতাড়ি। চন্দনকে বলতে হবে।

মাঘ শেষ হতে এখনও ক'দিন বাকি। শীত এখনই ফুরোবার কথা নয়, তবু বাতাসে অকালবসন্তের ছোঁয়া। এলোমেলো হাওয়া ছাড়ছে হঠাৎ হঠাৎ, হাওয়াতে ঠাণ্ডা নেই তেমন। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী এ সময়টা ভাল নয়।

গড়িয়াহাট থেকে টুকটাক কিছু বাজার সারল অনুরাধা। রাজার জন্য চিজ কিনল এক কৌটো। কফি ফুরিয়ে এসেছে, এক প্যাকেট কফিও কিনল। চন্দনের জন্য নাকের ড্রপ। লাজুর মতো অত না হলেও চন্দনেরও বেশ সর্দি কাশির ধাত। শাশুড়ির জন্য ক্রেপ ব্যান্ডেজ নিল একটা। ওয়াশিং মেশিনের জন্য ফেনাবিহীন গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট। কড়া মাজার জন্য স্টিলউল। ছোট্ট এক শিশি মশানিধনী সুগন্ধী তরল। ঠাণ্ডা অনেক কমে যাওয়াতে হঠাৎ খুব মশা বেড়েছে বাড়িতে। ঘরে মশানিবারক যন্ত্র অবিরাম জ্বালিয়ে না রাখলে রাজার লেখাপড়া করতে বড় কষ্ট হয়।

সান্ধ্য ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে অনুরাধা বিউটিপার্লারের সামনেও দাঁড়াল একবার। অনেকদিন ফেশিয়াল করা হয়নি, ভুরুর নীচটাও এবড়ো খেবড়ো কালো হয়ে গেছে। আগে ছেলে স্কুল গেলে দুপুরবেলাটা অনুরাধা নিজের পরিচর্যার সময় পেত, রাজার টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকে পার্লারে আসা প্রায় ভুলে যাওয়ার জোগাড়। আটত্রিশ বছর বয়সেও অনুরাধা যথেষ্ট লাবণ্যময়ী, শরীরের গড়নও তার বেশ আঁটোসাঁটো। পেটে সামান্য চর্বি ছাড়া আর কোথাও বয়স তেমন ঘাঁটি গাড়তে পারেনি। তবু এই বয়সেই দেহ কিছু বাড়তি যত্ন চায়। চন্দনও খুব পছন্দ করে তার ঝকঝকে চেহারা। কিন্তু আজ অনুরাধার সময় নেই একটুও।

কেনা জিনিসপত্র ভাল করে কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়ার সময় ভ্যানিটি ব্যাগ আরেকবার খুলল অনুরাধা। ব্যাগের ভেতরটাকে অনুভব করল মনে মনে। একশো টাকার নোট, পঞ্চাশ টাকা, দশটাকা, পাঁচ টাকা, খুচরো পয়সা যেমন তেমন ছড়িয়ে আছে ব্যাগের তলদেশে। গাছের নীচে ঝরাপাতা, পাথরকুচির

www.boiRboi.blogspot.com

মতন। এভাবে অবহেলায় টাকা ছড়িয়ে রাখতে ভারী তৃপ্তি পায় অনুরাধা। তাদের কলেজের সহপাঠী, ডাক্তারের মেয়ে মন্দিরা ঠিক এভাবেই প্রচুর টাকা ছড়িয়ে রাখত ব্যাগে। রেস্টুরেন্টে বন্ধুদের বিল দিতে দিত না, মুঠো করে টাকা তুলে বেয়ারাকে বলত,—কত ? অনুরাধার সেসময় সাপ্তাহিক বরাদ্দ তিন টাকা। তার তৃষ্ণার্ত চোখ গেঁথে থাকত মন্দিরার ব্যাগে। এখন অনুরাধারও ওই ভাবে টাকা ছড়িয়ে রাখার ক্ষমতা হয়েছে। এ যে কী সুখ।

অনুরাধা ব্যাগটা বুকে চাপল। যদি মন্দিরা তার বন্ধু না হত তা হলে কি একটু অন্যরকম হত জীবনটা!

—ছোটকু আসেনি তোমার সঙ্গে ?

অশোক ছেলেটি তেমন সপ্রতিভ নয়, অনুরাধার প্রশ্নে আড়ষ্ট হয়ে গেল,—ওর তো আমার বাড়িতে আসার কথা ছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, এল না। আপনাকে টাইম দেওয়া আছে, তাই নিজেই চলে এলাম।

—ভালই করেছ। বোসো। জিনিসগুলো রেখে আসি।

অনুরাধা ভেতরে চলে গেল। প্রতিভা ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, ফিরে এসে অনুরাধা উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করল, মা, রাজা এখনও ফেরেনি ?

—ফিরেছিল তো। এসে একবার তোমার খোঁজ করল, তারপর হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল।

—কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করেননি ?

—না তো। একদম ভুলে গেছি।

কোনও কাজে যদি আসে বুড়ি! অনুরাধা ঢোক গিলে বিরক্তি চাপল, একে চা টা দিয়েছেন ?

অশোক লজ্জা পেল, না না, উনি বলেছিলেন। আমি চা খাই না।

অনুরাধা সোফার হাতলে হাত ছড়িয়ে দিল, ছোটকু তোমায় জমিটা দেখিয়েছে ?

—হ্যাঁ। আপনাদের ফ্রন্টেজটা তো ভালই। আর একদম স্কোয়্যার প্লট। ওরকম জমিতে প্ল্যান করতে কোন অসুবিধে হয় না।

চন্দন অফিস থেকেই জমিটা কেনার সুযোগ পেয়েছিল। অনুরাধাকে বিয়ে করার পর পরই। দুই থেকে তিন কাঠার প্লট। গোটা পনেরো প্লট এসেছিল। জলের দরে। নামকাওয়াস্তে লটারিও হয়েছিল একটা। অর্ধেক নগদ, বাকিটা মাইনে থেকে কেটেছে মাসে মাসে। অদ্রিনাথের একটুও পছন্দ ছিল না জায়গাটা। এক সময়কার মেছো ভেড়ি। ড্যাম্প হবে। লোকালয় নেই। বাবার অমতেই গোপনে জমিটা কিনে ফেলেছিল চন্দন। অনুরাধার চাপে। অনুরাধা লুকিয়ে লুকিয়ে আটগাছা চুড়ি বেচেছিল, এক জোড়া মকরমুখী বালাও। চুড়ি বালা চতুর্গুণ হয়ে ফিরে এসেছে ব্যাঙ্কের লকারে। জমিটা এখন ফাউ।

অনুরাধা বলল, প্ল্যান নিয়ে এসেছ ?

—রাফ দু তিনটে করেছি। যদি আপনাদের পছন্দ হয়, ডেভেলাপ করব।

ফোলিও ব্যাগ থেকে কয়েকটা কাগজ বার করল অশোক। এক একটা কাগজে বাড়ির এক একরকম চেহারা। বাইরের আদল স্পষ্ট করে আঁকা, কিন্তু অন্দর এলোমেলো।

একটা বাড়ি অনুরাধার বেশ মনঃপুত হল। দোতলায় গোল বারান্দা, মোটা মোটা থামের রেলিং, একতলার ড্রয়িংরুম থেকে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, পাশের ড্রয়িং-এ ফ্রন্ট এলিভেশান, সাইড এলিভেশান আরও কিসব লেখা।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল,—এ-সব কী ?

শ্যামবর্ণ লাজুক অশোক অনেক সপ্রতিভ এখন,—ওসব টেকনিকাল্ ব্যাপার দিদি। এই যে এখানটায়··· ছেলেটা কাগজে ঝুঁকল,—ড্রয়িংরুম থেকে তিন ধাপ ওপরে, এইখানে হবে আপনাদের খাবার জায়গা। ডানপাশের সিঁড়ি দিয়ে নামলে কাজের লোকের ঘর, একটা বাথরুম। আর ওপাশে কিচেন। পেছনে একটা বারান্দাও থাকবে। ছোট। একটু কোর্টইয়ার্ডও।

প্রতিভা চুপ করে শুনছিলেন, হঠাৎ বললেন, কাজের লোকেরও ঘর থাকবে ? তোমরা তা হলে বেশ বড় বাড়ি করছ অনু ?

অশোক উত্তর দিল, বড় তো বটে। বড়ই। দুটো তলা মিলিয়ে আড়াই হাজার স্কোয়্যার ফিট জায়গা পাবেন।

—একবারে দোতলা উঠবে ? প্রতিভার চোখ গোল গোল, সে তো অনেক টাকার ধাক্কা !

অনুরাধা হাল্কা হাসল,—আপনার ছেলের একবারেই দোতলা তোলার ইচ্ছে। তাতে খরচ কম পড়ে। আচ্ছা অশোক, তুমি দু-একটা ফরেন জার্নাল আনতে পারলে না ? ওতে আরও ভাল ভাল ডিজাইন থাকে।

অশোক হেসে ফেলল,—এ এক অদ্ভুত খ্যাঁচাকল হয়েছে দিদি। যে বাড়িতেই প্ল্যান নিয়ে যাই, তারা বিদেশি বাড়ির মডেল চায়।

অনুরাধা ভুরু কুঁচকোল,—এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ! এটাই তো স্বাভাবিক। ওদের চিন্তাভাবনা কত আধুনিক ! কত কম্প্যাক্ট ! অথচ অসাধারণ সব বাড়িঘর !

—কিন্তু দিদি, এটা তো ইংল্যান্ড আমেরিকা নয়। ওদের আলো হাওয়া একরকম, বৃষ্টি বাদলার নেচারও আলাদা, বেসিকালি ওগুলো সব শীতপ্রধান দেশ, ওদের বাড়ির স্টাইলে এ দেশে বাড়ি করলে স্বাস্থ্যকর হবে কেন ? তাছাড়া আপনার বাড়ি অন্যের মতো হবেই বা কেন ?

আপনি যে বাড়িটা করবেন, পৃথিবীতে ওরকম বাড়ি একটাই থাকবে, সেটাই কি গর্বের নয় ?

বাহ্, বেশ ভাল কথা বলেছে তো অশোক ! অনুরাধার সব কিছু পৃথিবীতে

www.boiRboi.blogspot.com

একটা করে থাকাই তো সঙ্গত। একক সুখের মতো।

অনুরাধা আবিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল—কিরকম পড়বে স্কোয়্যারফিট ?

—যদি আমাকে করতে দ্যান্ স্কোয়্যারফিট তিনশোতে নামিয়ে দেব। আরও কমে হয়ে যেত, কিন্তু মেটিরিয়ালের দাম রোজ যেভাবে বাড়ছে।

—তুমি আগে কটা বাড়ি করেছ ?

—আগে করিনি। করলে এই প্রথম করব। তবে দেখবেন প্রাণ ঢেলে করব।

অনুরাধা অশোককে আরেকবার ভাল করে দেখল। আশায় উজ্জ্বল মুখ। উত্তেজনায় নাকের পাটা ঘামছে ছেলেটার। বয়স কতই বা হবে, ছোটকুর চেয়ে ছোটই মনে হয়। ছোটকু বলছিল ছেলেটা খুব সিনসিয়ার। সিভিলে ডিপ্লোমা নিয়ে পাশ করার পর দু-একটা কন্ট্রাকটরের সঙ্গে কাজ করেছে। মালমশলার গুণগত মান নিয়ে খুঁতখুঁতে বলে কোনও কন্ট্রাক্টর নাকি পছন্দ করে না ছেলেটাকে।

অনুরাধা কৌতুকের স্বরে বলল, তা হলে সাত আট লাখ টাকার গাড্ডায় নামিয়ে দেবে বলছ ?

—দিদি, টাকা মাটি, মাটি টাকা। আপনারা টাকার ভাবনায় পিছিয়ে গেলে···। আপনি জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন, অন্য কন্ট্রাক্টর মিনিমাম দশ চাইবে।

কথার মাঝখানে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে রাজা। মা-র কটমট চোখ অগ্রাহ্য করে সোফায় বসে পড়ল। তার উৎসুক চোখ গিলছে অশোক আর অনুরাধার আলোচনা।

অশোক উঠে যাওয়া পর্যন্ত রাজা কোনরকমে নিজেকে সংবরণ করে ছিল, দরজা বন্ধ হতেই খুশিতে লাফিয়ে উঠেছে, বাড়ি তা হলে স্টার্ট !

অনুরাধা নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় বদলাচ্ছিল, সেখান থেকেই বলল, এক্ষুনি নয়। শুরু হতে হতে পয়লা বৈশাখ। তোমার পরীক্ষার পর।

—কদিন লাগবে শেষ হতে ?

—আমার প্ল্যান আছে পুজোর আগে ঢুকে যাব।

—ওয়াও ! কী রঙ হবে মা বাড়িটার ?

—তোর কী রঙ পছন্দ ?

—সাদা।

—আমারও সাদা। কার্নিশে মেরুন বর্ডার।

—না মা, মেরুন না। নেভিব্লু। রাজা অনুনয় জুড়ল, ছাদে আমার জন্য একটা কাচের ঘর করে দেবে ?

অনুরাধা চিজের কৌটো রাখছিল ফ্রিজে, ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসল, কাচের ঘরে কী করবি ?

—কিছু একটা করব। কাচের ঘর সব বড়লোকদের বাড়িতে থাকে।

—ছাদে একটা অর্কিড হাউস করলে কেমন হয় রে ?

—গ্র্যান্ড আইডিয়া। কণাদদের বাড়িতে অনেক রেয়ার অর্কিড আছে। ওর কাছ থেকে আমি···

—লোকের কাছ থেকে নেব কেন ? আমরা কিনে নেব।

অনুরাধা চোখের সামনে দোতলার গোল বারান্দাটাও দেখতে পাচ্ছিল। ইজিচেয়ারে বসে আছে অনুরাধা, ডোবার আগে সূর্য তার শেষ লালটুকু অনুরাধার পায়ে লুটিয়ে দিয়েছে। দখিণা বাতাসে উড়ছে অনুরাধার চুল। অস্তরাগে বাড়িটা সাদা থেকে সোনালি। সোনালি থেকে গোলাপি। গোলাপি থেকে কুসুমলাল। অনুরাধা ছেলের চোখে স্বপ্নটাকে বুনে দিতে চাইল,—বুঝলি রাজা, দোতলার বারান্দায়, সামনে রেলিঙ থাকবে। রেলিঙের গায়ে সার সার টব। চন্দ্রমল্লিকা। গোলাপ। ডালিয়া। জিনিয়া। নীচের মাটি থেকে একটা জুঁইগাছ বারান্দা অব্দি উঠিয়ে নেব। বর্ষাকালে ফুলে ফুলে ভরে থাকবে গাছ। গন্ধে ম ম করবে চারদিক !

—গেটের সামনেটা ফাঁকা থাকবে নাকি ?

—সে ঝাউফাউ লাগানো যাবে। একটা মেক্সিকান ঘাসের লন করলেও মন্দ হয় না, কি বল্ ? ফোলা ফোলা ! নরম নরম ! বিকেলে সবুজ ঘাসের গালচে মাড়িয়ে হাঁটব আমরা। ভাবছি তোর পরীক্ষা শেষ হলে কিছু অ্যান্টিক কালেকশান করব। পার্ক স্ট্রিটের নীলামের দোকানগুলোতে কী অপূর্ব সব জিনিস আসে ! একবার একটা ঝাড়লণ্ঠন দেখেছিলাম, তার যে কত শাখা ! একটু হাওয়া দিলেই টুংটুং করে বাজে।

প্রতিভা পাথরের মতো সোফায় বসেছিলেন, ডাকলেন অনু।

অনুরাধার ঘোর কাটল না।

প্রতিভা আবার ডাকলেন,—ও অনু !

—কী হলটা কি আপনার ? রাত্রে কী খাবেন, তাই তো ? আজ আপনার খই দুধ।

প্রতিভার যেন কানেই গেল না কথা, আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন,—ও অনু, অত লাখ লাখ টাকা আমার চাঁদু পাবে কোথ্থেকে ?

—নতুন ক্রেপ্ ব্যান্ডেজ এনেছি, ঘরে গিয়ে ভাল করে বেঁধে নিন। বাস্তবে ফিরে অনুরাধা কর্কশ, ছেলে কোথ্থেকে টাকা পাবে তাতে আপনার কী দরকার ?

অনুরাধা চন্দনকে ঠেলল, ঘুমোলে ?

আজকাল প্রায়শই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে চন্দন। নেশার মাত্রাও কমেছে অনেকটা। ঘুমও কমেছে তার। বিছানায় শুলেই মাথার পিছনটা দপদপ করে। রক্তচাপ ? না দংশন ?

চন্দন সোজা হয়ে শুল,—রাজা শুয়ে পড়েছে ? কটা বাজে ?

www.boiRboi.blogspot.com

—একটা। অনুরাধা পাশ ফিরল,— জানো, আজ ছেলেটা এসেছিল।

—কোন্ ছেলেটা ?

—ছোটকুর সেই বন্ধু। অশোক। বাড়ির প্ল্যান দিয়ে গেছে একটা।

—খাওয়ার সময় তো কিছু বললে না ?

—বলব কী করে ! তোমার ছেলে, তোমার মা সকলের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে অত মনে থাকে ?

—ওসব আলতু ফালতু ছেলেকে দিয়ে আমি বাড়ি করাব না। আমার সাত্যকির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ওই যা করার করবে।

অনুরাধা অল্প দমে গেল, ছেলেটার প্ল্যানটা তো দ্যাখো। যদি পছন্দ না হয় তখন···

—পছন্দ ফছন্দের কিছু নেই। প্ল্যান ট্যান যা করার সব সাত্যকিই করবে।

—সাত্যকি সাত্যকি করছ, আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে করানোর বিপদ জানো ? পরে কিছু বলতে পারবে না, মালমশলা খারাপ দিলেও হজম করতে হবে।

—ছোটকুর বন্ধু বাজে কাজ করলে কাকে শোনাবে ? ছোটকুকে ? তোমার ওই অপোগণ্ড ভাইটাকে ?

—অপোগণ্ড বলছ কেন ? কোলপোঁছা ছেলে, সবার ছোট, একটু বেশি আদর পেয়েছে। ও কি কিছু চেষ্টা করছে না ? ব্যবসাটাও ঠিক ধরল না···

—তোমার ভাই-এর জন্যই ব্যবসা লাটে উঠেছে। ওরকম উড়ু উড়ু চেহারা নিয়ে সাবান বেচা যায় না। কলকাতার পথেঘাটে টাকা উড়ছে, কিন্তু কামানোর জন্য অনেক ড্যাশিপুশি হতে হয়।

—কী যে হবে ছেলেটার। আবার শুনছি প্রেম করছে।

—ওটাই ওর যোগ্য কাজ। চন্দন খিকখিক করে হাসল, ভিক্টোরিয়ায় বসে জলে চাঁদের ছায়া দেখবে আর ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। এই তো অ্যাভারেজ বাঙালি ছেলের অবস্থা !

—তোমার তো এত চেনাশুনো, দ্যাখো না ছোটকুর জন্য কোথাও যদি কিছু করে দেওয়া যায়। অনুরাধা চন্দনের কাঁধ ছুঁল, ছোটখাটো যা হোক একটা চাকরি···

—আমি কী ভাবে করব ?

—বারে, তোমাকে কোম্পানিগুলো এত ভয় পায় ! যারা তোমাদের কাছে আসে তাদেরই তো বলতে পারো।

—ভয় পায় বলেই ঘরে অতগুলো করে টাকা আসে। এত ভয় কি পায় যে আমার ওই শালাকেও পুষবে ? তাছাড়া মালকড়িও নেব, শালাকেও ঢোকাব, দুটো একসঙ্গে হয় না।

—তবু একবার বলে দেখতে দোষ কি ?

—অসম্ভব। মুখের ওপর না বলে দিলে আমার সম্মান থাকবে ?

অনুরাধা হাত সরিয়ে নিল। বন্ধ কাচের শার্শি ভেদ করে রাস্তার আলো

ঢুকতে চাইছে ঘরে। টানা ভারী পর্দা শান্ত্রী হয়ে কড়া পাহারায় দাঁড়িয়ে।

অনুরাধা বলল, আমার ভাইয়ের জন্য করবে কেন ? নিজের বোন ভগ্নীপতি হলে··· এত যে সাত্যকি সাত্যকি করো, সাত্যকি তোমার কথা কতটা ভাবে ? একের নম্বরের চালিয়াৎ।

—কেন ? সে আবার তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিল ?

—কাজের কাজ কিছু নেই, লোককে খালি ভয় দেখিয়ে বেড়ায়। কত বার করে বললাম তুমি ফিরছ না, তোমার একটু খোঁজখবর করতে, একটি বার টিকিও দেখা গেল না তখন !

চন্দন নীরব।

—কদিন আগেও তো সাত্যকিকে সহ্য করতে পারছিলে না ! বোনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে ! পার্টির জোরে কব্জি ঘোরায় ! হঠাৎ যে তোমাকে কী যাদু করল !

—বুঝতে ভুল হয়েছিল। সাত্যকির মত ছেলে কটা আছে ! সেলফ্‌মেড ম্যান....

—হাতি। লাজু তো বলে চিটিংবাজির পয়সা। ওই জন্যই তো লাজুর সঙ্গে বনছে না।

—ও কিছু নয়। স্বামী স্ত্রীতে একটু আধটু খটাখটি হয়ই। তেমন বাড়াবাড়ি দেখলে আমি লাজুকে ধমকে দেব।

—হুঁহ্ ! তুমি ধমকাবে, আর লাজু সুড়সুড় করে গর্তে ঢুকবে। কত যে তোমায় কেয়ার করে।

—আমি বুঝিয়ে বললে ও নিশ্চয়ই শুনবে। ও আমার বোন।

অনুরাধা মুখ বেঁকাল, তুমিই বোন বোন করে মরো। সে তোমায় কত ভক্তিশ্রদ্ধা করে তা আমার জানা আছে।

চন্দন নিঃশব্দে উল্টো দিকে ফিরে শুল।

অনুরাধা আরেকটু হুল ফোটাল, দাদার খোঁজ নেওয়ার কী বহর। দাদার কি প্রেশার বেড়েছিল বৌদি ?

—আমার শরীরের কথা উঠল কিসে ?

—কেন উঠল তোমার বোনই জানে ! কথার কী কায়দা। যেদিন ট্যুর থেকে ফিরল, সেদিন কি দাদা অসুস্থ ছিল বৌদি ?

চন্দন নিম্ন স্বরে বলল, তুমি কী বললে ?

—বললাম, বাজে কথা। তুমি সুস্থ। এ-সব আলগা পিরীত যে কেন দেখায় !

চন্দন লম্বা নিশ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে। একটু সময় নিয়ে বলল, ওভাবে বলছ কেন ? দুশ্চিন্তা হয়েছে বলেই না জানতে চেয়েছে !

বিছানা থেকে নামল চন্দন। ছোট্ট উঠোনটা সমকোণ ছাঁদের বাড়ির ঠিক মাঝখানে। মধ্যনিশীথে চাঁদ মোহ বিছিয়েছে সেখানে। বড় নির্জন, বড়

www.boiRboi.blogspot.com

মায়াময় এ সময়। কয়েক মুহূর্ত বিজন দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকল চন্দন। তারপর ঘরের আলো জ্বালল। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার টেনে খুটখাট খুঁজছে কিছু।

অনুরাধা চোখ কুঁচকে তাকাল, কী খুঁজছ ? নাকের ড্রপ ? এখানে আছে ! তোমার বালিশের নীচে।

—না। দেশলাই।

—এখন সিগারেট খাবে নাকি ? আলোটা নিভিয়ে দাও।

আলো নিভিয়ে সিগারেট ধরাল চন্দন, জানলা অল্প খুলে কাঠি বাইরে ফেলল। তার হাত কাঁপছিল। অনুচ্চস্বরে বলে উঠল,

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করো অনু ?

চন্দনের গলায় এমন কিছু ছিল, অনুরাধার বুক কেঁপে গেল।

—এত দিন আমরা একসঙ্গে আছি, আমাদের সম্পর্কের ভিতটাই তো বিশ্বাস, তাই না ?

মশারির ওপারে চন্দন, ভেতরে অনুরাধা। দুজনের মাঝে এক ভৌতিক জালের ব্যবধান।

অনুরাধা উঠে বসল, —তোমার হঠাৎ কী হল ? রাত দুপুরে আবোল তাবোল বকছ কেন ?

চন্দন নিঝুম।

—এসো, ভেতরে এসো। শুয়ে পড়ো।

বাধ্য বালকের মত চন্দন বিছানায় এল। পাশাপাশি শুয়েছে দুজনে। অনুরাধা হাত রাখল চন্দনের বুকে, —হলটা কী ?

—আমি শালা এক জালি লোক। দুনম্বরী। আমার কোনও চরিত্র নেই।

পলকের জন্য স্থাণু অনুরাধা। তারপর চন্দনের গায়ে ভাল করে টেনে দিচ্ছে লেপটা, এতদিন পর এ-সব কথা উঠছে কেন ? অনুরাধা চন্দনের চুলে আঙুল ডোবাল। এই চুল পেয়েছে তার ছেলে। মোটা। রুক্ষ। শিশুকে ভোলানোর ভঙ্গিতে বলল, তুমি তো অন্য কাউকে ঠকাওনি। বঞ্চিত করোনি। অন্যের টাকা ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নাও নি। যারা অন্যায় করে তারাই চুরি ঢাকতে তোমাকে টাকা দেয়।

—ঠিক। ঠিক। যে যেখান থেকে পারছে লুটে পুটে খাচ্ছে। একজনও শালা ঠিক নেই। আমি একা বউ বাচ্চা নিয়ে আঙুল চুষব ? আমাদের কলেজের সুখময় কেঁদে কেটে ফরট্টি পারসেন্ট পেয়েছিল। সে এখন তিনটে গাড়ির মালিক। ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা করে অট্টালিকা হাঁকিয়েছে। আমাদের স্কুলের রাঘব, ফালতু ছেলে, বাপের পয়সায় আমেরিকা ঘুরে এসে এখন কম্পিউটার এক্সপার্ট। বছরে ছ লাখ টাকা মাইনে ! আমি তাদের থেকে কিসে কম ছিলাম ? আমি কেন তাদের মতো করে বাঁচতে পারব না ? চন্দনের স্বর গমগম করছে,— সব্বাই দুনম্বরি। মন্ত্রী আমলা নেতা বিজনেসম্যান থেকে

সাধুসন্ন্যাসীরা পর্যন্ত। ভগবান যে ভগবান সেও শালা ঘুষ খায়। মাল্‌দার ভক্ত দেখলে তারও লাল পড়ে। তা হলে আমি খেলে দোষ কি ?

—সবই যখন বোঝ, এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?

—প্রথম প্রথম টাকা দেখে তুমিও তো বুলি ঝাড়তে। পাপ লাগবে ! কী হয়েছে আমাদের ? কেউ চুলের ডগাও ছুঁতে পেরেছে ? বিপদ এসেছে, সে তো পুণ্যবানদেরও আসে ! আমার বাবার আসে নি ? যাই হক, সব বিপদ থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে তো পেরেছি ! ওই যে ওই ঘরে শুয়ে আমাদের ছেলে, ওর জন্য এতগুলো মাস্টার লাগিয়েছি, দেখো ও ঠিক মাধ্যমিকে স্টার পাবে। উচ্চ মাধ্যমিকেও ভাল রেজাল্ট করবে। করিয়ে ছাড়ব। দশ জনকে দেখিয়ে দেব ছেলে মানুষ করা কাকে বলে ! ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিছু একটা হবে, ঘ্যামা চাকরি করবে, অঢেল টাকা কামাবে, আর আমরা বুড়োবুড়ি পায়ের ওপর পা তুলে...

—অনেক দূর ভেবে ফেলেছ। এবার থামো। অনুরাধা রাতচরা পাখির মতো হেসে উঠল। আরেকটু ঘন হল চন্দনের,—আমি কিন্তু মাকে বলেছি আমরা শীগ্‌গিরই বাড়ি শুরু করছি।

—আলবত করব। চন্দন অনুরাধাকে জড়িয়ে ধরল ; বৈশাখে শুরু করে বর্ষার আগে ছাদ ঢেলে দেব। পুজোর আগে ঢুকে যাব নিজের বাড়িতে।

—কত টাকা লাগবে খেয়াল আছে ? ছ সাত লাখ। অনুরাধা একটু কমিয়ে বলল।

—হয়ে যাবে। চন্দন অনুরাধাকে টেনে নিয়ে গালে গাল ঘষল। বেশ অনেকদিন পর শরীরে শরীর মিলছে আজ। অভ্যস্ত দুই চেনা দেহে বুনো নবীন ঘ্রাণ।

ক্লান্ত চন্দন চোখ বুজে শুয়ে আছে, অনুরাধা ফিসফিস করে বলল, —ছোটকুর বন্ধুর প্ল্যানটা একবার দেখলে পারতে। বেশ ভাল করেছে।

—দিও। দেখব।

ভেতরের উঠোনে শব্দ হচ্ছিল। নিস্ফলা পেঁপে গাছে বাতাস বাজছে। বাতাসকে টোকা দিয়ে কোণার ঘরের ছিটকিনি নামল। প্রতিভা বাথরুমে যাচ্ছেন। তাঁর পা ঘষে ঘষে চলার শব্দ, একা একা দেওয়ালে হাত রাখার আওয়াজ, এমনকি নিশ্বাসের ধ্বনিও স্পষ্ট ভেসে আসছিল ঘরে।

চন্দন কান পেতে শব্দ শুনছিল। অনুরাধা ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত

আজকাল যখন তখন দৃশ্যগুলো চন্দনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দৃশ্য নয়, বিভীষিকা। শীলা সেনের ফ্ল্যাট। অনুরাধা। থানার লকআপ ! রাজা। কাঠগড়া। চন্দনের কোন বিপদের আশঙ্কা নেই আর। তবুও। কেন এমন

www.boiRboi.blogspot.com

হয় ?

চন্দন একগোছা রিটার্নে মুখ গুঁজে দিল। খুব একটা কিছু দেখার নেই, সব কোম্পানিই এখন মাথাঅলা অ্যাকাউন্টেন্ট পোষে। মাসিক হিসাবে কতটা দুধে কতটা জল মেশাতে হবে তারাই স্থির করে দেয়। যেটুকু তারা পারে না, তার জন্য কম্পিউটার আছে। বিজ্ঞান এখন লুণ্ঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

তবু কোথায় দুধ, কোথায় জল তা ঠিক ধরে ফেলে চন্দন। বাজপাখির দৃষ্টি তার। চন্দন একটা রিটার্নে এসে থামল। মেসার্স অ্যাপেক্স কেমিকালস। তরুণ পাঞ্জাবি ইঞ্জিনিয়ারের কোম্পানি। বছর দুয়েক ধরে কপার ওয়্যার নিয়ে জোর লড়ছে ছেলেটা। সরকারি কাগজপত্র সব ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করে। ভেজাল না মিশিয়ে। কালও পরমজিৎ অফিসে এসেছিল। ট্যাক্সের বহর দেখে খেপে কাঁই। একটুও আঙুলে ঘি লাগাতে রাজি নয় ছেলেটা। এবার ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আরে তুই চুরি করিস আর না করিস, আমার যে তোকে বিপদে ফেলার ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাটাকে সম্মান জানাবি না তুই !

পেল্লাই হলঘরের এক ধারে টানা কিউবিক্‌ল্‌-এর সারি। প্লাইউডের পার্টিশন। সুয়িংডোর। দরজায় দরজায় নেমপ্লেট। আশি নব্বই বর্গফুট আয়তক্ষেত্রের ছোট ছোট সাম্রাজ্য। পৃথক পৃথক শাসনকক্ষ। প্রতিটি ঘরে কাঠের র‍্যাকে ডাঁই কাগজের স্তূপ, ফাইল, খাতাপত্র। সাম্রাজ্যের দলিল দস্তাবেজ। এত ধুলো সেখানে, যে আরশোলা মাকড়সারাও ঘোরাফেরা করতে বিরক্তি বোধ করে। কেবল ইঁদুরদেরই এখানে অবাধ প্রবেশাধিকার। নির্দিষ্ট কাগজ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট প্রয়োজনে নির্বিবাদে খেয়ে চলে যায় তারা। হলঘরের বাকি অংশ একটি আধুনিক গ্রাম্য হাট। মাত্র তিন বছর বয়স হয়েছে ভবনটির, এর মধ্যেই প্রত্যেকটি দেওয়াল পানের পিক, কফ, নানারকম রহস্যময় দাগে আকীর্ণ। নিষ্প্রভ। সিলিং-এর ঝুলন্ত কালো জটা অফিসের মহিমা বাড়িয়েছে। বাথরুমে উগ্র অ্যামোনিয়ার ঝাঁজ এই দেওয়ান-ই-আমের পবিত্র সৌরভ।

শুদ্ধশীল ভট্টাচার্য চন্দনের দোলদরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল,— রায়চৌধুরী, তোমার ইনকাম ট্যাক্সের অ্যানুয়াল রিটার্ন হয়ে গেছে ?

অফিস কলিগদের সামনে অফিসের কাজ করে না চন্দন। সে ডটপেন বন্ধ করল,— আমি তো জমা দিয়ে দিয়েছি।

—কপি আছে ?

—তোমার চাই ? চন্দন ড্রয়ার খুলে গার্ডার মোড়া একটা কাগজ বার করল,— আমি এ মাসে বারোশো কাটিয়ে দিচ্ছি।

শুদ্ধশীল চন্দনের ব্যাচমেট। ছোটখাটো ফরসা চেহারা। সর্বদা টিপটপ থাকতে ভালবাসে। ইকনমিক্সে এম.এ.। এই চাকরি পাওয়ার পরেই কলেজে প্রফেসরি পেয়েছিল। যায়নি। লোককে বলে, যেতে পারিনি। যদি যেতে পারতাম, এতদিনে রিডার হয়ে যেতাম।

শুদ্ধশীল সামনে এসে বসল,— তুমি তো মাসে মাসে কাটাও, তাও এত ট্যাক্স ?

প্রতি বছর কতটা ট্যাক্স দেবে চন্দন গোড়া থেকেই হিসাব করে রাখে। মাসে একশো, বছরের শেষে থোক হাজারখানেক। সেই অনুযায়ী বউ ছেলের নামে জীবনবীমা করা আছে। নিজের নামেও। কোনটারই প্রিমিয়াম এত বেশি নয় যাতে অফিসে কারুর শ্যেনদৃষ্টি পড়ে। পলিসিগুলোর মেয়াদও মাপা। রিটায়ারমেন্টের আগে হাতে আসবে একে একে। এ ছাড়াও দরকার হলে চন্দন অল্পস্বল্প কর বাঁচানোর সার্টিফিকেট কেনে।

শুদ্ধশীল মনোযোগ দিয়ে কাগজটা দেখছিল, চন্দন বলল— অত দেখে কী হবে ভট্টচায্যি ? সব টাকা কি আলমারিতে পুরলে হবে ? কিছু অন্তত সরকারকে দাও।

—সে তো দিচ্ছিই। ডি এ-র এক কাঁড়ি টাকা পি এফ এ নিচ্ছে না গভর্নমেন্ট ? খাটাচ্ছে না ?

—কায়দা মেরো না, তুমি হেভি চিপ্পুস আছ। শোনো, থার্টি পারসেন্টের বেশি সেভিংস দেখিও না। গাড্ডায় পড়ে যাবে।

—তোমাদের মালিনী তো অর্ধেকের ওপর সেভিংস দেখায় !

—মিসেস ঘোষের সুবিধে আছে। কর্তা গিন্নি দুজনের রোজগার থাকলে অনেক মারপ্যাঁচ করা যায়। ওকে তো আর অ্যাসেটে হাজ্‌ব্যান্ডের ইনকাম দেখাতে হয় না !

—শালা পরের জন্মে যেন মেয়েছেলে হয়ে জন্মাই। আমরা খেটে মরব, বাটপারি করে পাপী হয়ে থাকব, ওঁরা শুধু পায়ের ওপর পা তুলে ভোগ করে যাবেন। আর একটু এদিক-ওদিক হলেই মেজাজ। অফিসে চাকরি করলে তো কথাই নেই, এই তোমার মালিনী ঘোষদের মতো। ডুব জলে ডানা মেলে হাঁসের মতো টাকা খিঁচে যাবে, স্লাইট্ গা-ও ভিজবে না। কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে তো আছেই। আর দ্যাখো, দিব্য ছেলেটা এত অনেস্ট, এত আপরাইট, সে বেচারাকে নর্থ-বেঙ্গলে পচতে হচ্ছে। মা-র ক্যান্সার হয়েছে বলে এদিকে আসার প্রেয়ার করল, পুরো কেসটাই ধামাচাপা !

—এ ভাই নারী প্রগতির যুগ। আমাদের দেখাদেখি ওরাও যদি মাল না খিঁচতে পারে, সমান হবে কী করে ? পার্টিরাই বা পাত্তা দেবে কেন ? চন্দন সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট বাড়িয়ে দিল,— নেবে নাকি ?

—নাহ্, ছেড়ে দিচ্ছি। সকালে একটা, রাত্তিরে একটা।

—চা ?

—না। অফিসের চায়ে বড় মিষ্টি দেয়। সুগারটা বাড়ছে। এখানে আর চা খাব না।

তা খাবে কেন ব্যাটা মক্ষিচুষ ! প্যাকেট ড্রয়ারে রেখে শব্দ করে ড্রয়ার বন্ধ করল চন্দন। পার্টিরা ফরেন সিগারেটের কার্টন দিয়ে যাচ্ছে, গোটা কার্টনই

www.boiRboi.blogspot.com

চালান হয়ে যাচ্ছে পাশের দোকানে। হাফ দাম, হাফ দামই সই। পেচ্ছাপে চিনি বজবজ করছে, ওদিকে পার্টি মিষ্টির প্যাকেট আনলে না নেই মুখে। নিজে খেতে পারে না তো কী আছে ? বেড়াল খাবে। শালা ভট্‌চাজের মিষ্টি খেয়ে খেয়ে অফিসের বেড়ালগুলোর পর্যন্ত ডায়াবেটিস হয়ে গেল। কেঁদো কেঁদো রয়াল বেঙ্গলের মিনি এডিশনের মতো চেহারা সব কটার, অথচ কেমন ম্যাদা ম্যাদা ! দিন-রাত লাইন দিয়ে ঝিমোচ্ছে। হুঁহ্। বাবুর এখন দিব্যর জন্য দরদে প্রাণ ফেটে পড়ল !

চন্দন সিগারেটে জোর টান দিল,— যাই বলো ভটচাজ, তোমাদের দিব্যর আবার বড় বেশি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ভাব। পার্টি প্রেমিসেসে চা খাব না, কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাব না। আরে মন্ত্রীরা সব মালিকদের সঙ্গে হোটেলে বসে ব্যাঙ্কোয়েটে লড়াচ্ছে, তুই কোথাকার কোন্ হরিদাস পাল এত সতীপনার ফুটুনি মারিস ? চোখ ছোট করে চন্দন সামনে ঝুঁকল। ঈষৎ নিচু স্বরে বলল,— আমার মনে হয় ব্যাটা নপুংসক। মরদের বাচ্চা মরদের মতো থাকবি, রগড়ে পার্টিদের শুইয়ে দিবি, পায়ের কাছে কেঁউ কেঁউ করবে সকলে, তবে না চাকরির দাপট !

—এসে যাবে। ঠিক লাইনে এসে যাবে। শুদ্ধশীল খিকখিক করে হাসল, বিয়ে থা হোক, একটু রক্তের জোশটা মরুক...

—অত দূর যেতে হবে না। দ্যাখো না মা-র ক্যান্সারেই রস কতটা মরে। কথাটা বলেও ঠিক তৃপ্তি হল না চন্দনের। সে কি দিব্যর মতো ছিল কোনওদিন ? তার বাবার অসুখে... ! বাবার হার্টের প্রবলেম হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওই বয়সে বাইপাস করলে কি বাবা বাঁচত ! তবু তো চন্দন মুখ ফুটে অপারেশানের কথা বলেছিল। বাবা নিজেই বলল, সত্তর বছরের হৃদয়টাকে আর কাটাছেঁড়া করব নারে। খাঁচা পুরনো হয়েছে, শিকলেও মরচে ধরেছে। পাখি এবার উড়ে যাবে। দু'দিন আগে নয় দু'দিন পরে। মিছিমিছি একগাদা টাকা গচ্ছা ! হয়তো বা বাবা দুদিন পরেই যেত। লাজুর বিয়ের ধাক্কাটাই শেষ করে দিল লোকটাকে, চন্দন কী করবে ! বাবারও বাড়াবাড়ি ছিল। সাত্যকির মতো ছেলেকেও পছন্দ নয় ! কারণ কী ? না সাত্যকির চোখ নাকি পরিষ্কার নয় ! উদ্ভট বিটকেল সব ধারণা !

একজন উর্দিপরা বয়স্ক লোক উঁকি দিল ঘরে— স্যার, আপনার গাড়ি এসে গেছে।

—তুমি বেরোচ্ছ নাকি রায়চৌধুরী ?

—হুঁ। ডিউটি আছে। পারিবারিক ডিউটি। মাকে নিয়ে ডাক্তার। চন্দন সিগারেট নেভাল,— মা-র হাঁটুটা খুব বখেড়া করছে। অর্থোপেডিক দেখালাম, তিন তিনজন স্পেশালিস্ট, তিনজনেরই এক মত। অপারেশান। মা-র আবার অপারেশানে হেভি আতঙ্ক। আজ একটা ভাল হোমিওপ্যাথের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

—হোমিওপ্যাথ ! তুমি যে এবারে ঠিকুজি কুষ্ঠি মানতে শুরু করবে হে !

—ইয়ার্কি মেরো না। তিনশো টাকা ফি। বাড়ি আসে না, পেশেন্ট নিয়ে যেতে হয়। চার ছ'মাসের আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না। কর্ড লাইন ধরে তাড়াতাড়ি ডেট পেয়েছি। তাও দু'সপ্তাহ পর।

শুদ্ধশীলের চোখে ভক্তি নেমেছে এবার, শুনে তো ভালই মনে হচ্ছে। তোমার মা-র যদি উপকার হয়, আমার পিসিমাকেও নিয়ে যাব। পিসতুতো বোনটা মাঝেমাঝেই এসে ঘ্যানঘ্যান করে, দাদা তোমার এত ক্ষমতা, মাকে একটা ভাল ডাক্তার দেখিয়ে দাও না।

চন্দন ব্রিফকেস গুছিয়ে উঠে পড়ল— কাগজটা সাবধানে রেখো। ফেরত এনো। এটা আমার পারসোনাল কপি।

শুদ্ধশীল উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, মেটালিক্সের কেসটার খবর কী হে? সেই সত্তর লাখ টাকার ডিসপিউট্?

—চলছে চলবে অবস্থা। থাকুক কোল্ডস্টোরেজে ক'দিন।

—আমার একটা বুদ্ধি নাও। তুমি এই কেসটা থেকে হাত ধুয়ে ফেলো।

চন্দনের ভুরু কুঁচকে গেল, কেন?

—আমার কাছে ইনফরমেশন আছে। ওদের চেয়ারম্যান আমাদের কমিশনারের সঙ্গে খুব বাতচিত চালাচ্ছে। মিনিস্ট্রিতে নাকি ওর পঁহুছ আছে। অযথা গোঁয়ার্তুমি কোরো না।

নাহ্, সত্যিই চন্দনের সময় ভাল যাচ্ছে না। শর্মার ভাষায় রাহু কেতুর দশা। অনুরাধা বাড়ি বাড়ি করে রোজ জ্বালিয়ে মারছে। এই কেসটা ঠিকমতো ভাসিয়ে তুলতে পারলে কিছু মোটা ক্যাশ আসত। ঠিক আছে। এক মাঘে শীত যায় না। আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে। চিল হয়ে। বক হয়ে। কাক হয়ে।

চন্দন সদর্পে গাড়িতে উঠল। পবন মালহোত্রা দারুণ সাজিয়েছে গাড়িটাকে। সিটে বসলেই শরীর ডুবে যায়। হরিণের চামড়া হেন সিট্‌কভার। স্টিরিও, কোয়ার্টজ ঘড়ি, এয়ারকন্ডিশনার কী নেই! সামনে টসটসে পাকা আঙুরের থোকা। মোমের। দুলছে।

গাড়ি কার্জন পার্কে এসে যানজটে আটকে গেল। এস্‌প্ল্যানেড ইস্টে জোর সমাবেশ। স্লোগান চলছে। চন্দন নিমেষে অধৈর্য হয়ে উঠল। দুটো পাঁচ। দুটো পাঁচ। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চারটেয়। এখান থেকে কাঁকুলিয়া গিয়ে আবার মৌলালি আসা...! নিজেদের কাজকর্ম নেই! কাউকে কাজ করতে দেবে না! কী যে হচ্ছে দেশটার! দিনরাত শুধু চলবে না। চলবে না। এই করে দেশ এগোবে? ওয়ার্ক কালচার ছাড়া?

কলেজে পড়ার সময় অদ্ভুত এক মিছিল দেখেছিল চন্দন। ধর্মতলা স্ট্রিটে। বন্ধ কোন কারখানার শ্রমিকরা যাচ্ছিল সারে সারে। মিছিলের সামনের লোক দুটোর হাতের ফেস্টুনে চোখ পড়েছিল হঠাৎ। লা লি চ ল বে না। চোখ রগড়ে ভাল করে দেখে বুঝেছিল— দালালি চলবে না-র দা ফেস্টুন থেকে মুছে

www.boiRboi.blogspot.com

গেছে, সেই ফেস্টুনের দিকে তাকিয়েই একটা লোক স্লোগান মেরে চলেছে, লালিচ লবে না। লালিচ লবে না। দেখাদেখি পিছনের লোকরাও হেঁকে উঠছে, লালিচ লবে না। এই তো দেশের অবস্থা! যে বলছে সে-ও জানে না কী বলছে। যারা পিছনে হুক্কাহুয়া করছে তারাও। এ-সব দেশে কি রাজনীতি চলে? চাই মিলিটারি রুল। ডিক্টেটারশিপ। তবে যদি সিধে হয় লোকজন।

বাড়ি পৌঁছে বিরক্তিটা বেড়ে গেল চন্দনের। ঢুকতেই কানের কাছে অনুরাধার ফুশফুশ, মা তো কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যেতে চাইছে না। কখন থেকে বলছি তুমি এসে যাবে, আপনি রেডি হয়ে নিন...

—কেন? তোমার সঙ্গে কিছু খ্যাচাখেচি হয়েছে নাকি? যা মুখ হয়েছে তোমার।

অনুরাধাও চটে গেল, হ্যাঁ, আমিই তো শুধু মুখ করি। এ বাড়িতে আর সব ভিজে বেড়াল! যাও না, গিয়ে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, আমি কি বলেছি।

প্রতিভা বিছানায় শুয়েছিলেন, ছেলেকে দেখেও উঠলেন না। চন্দন বলল, হল কী তোমার? যাও। কাপড় পরে নাও। চারটেয় টাইম। তিনটে বেজে গেছে।

প্রতিভা শুয়ে শুয়েই বললেন, আমাকে ছেড়ে দে চাঁদু। আমার ব্যথা অনেক কমে গেছে।

—বাজে বোকো না। কালও তুমি বাথরুমে যাওয়ার সময় কোঁকাচ্ছিলে। তোমার জন্য কত খেটেখুটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম...! ডাক্তারের ফি-ও অ্যাডভান্স জমা করা আছে।

প্রতিভা খাটে ভর দিয়ে উঠলেন,— যেটুকু ব্যথা আছে ও আর সারে না রে।

—সারে কি না সারে ডাক্তার বুঝবে। তুমি চলো। তিন তিনশো টাকা জলে চলে যাবে?

প্রতিভা আর কথা বাড়ালেন না। নীরবে তৈরি হলেন। সরু কালো পাড় ধবধবে সাদা শাড়ি সাদাসিধে করে পরেছেন। বেরনোর আগে মাথায় আঁচল টেনে নিলেন। লাঠি ডানহাতে শক্ত করে ধরা।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল,— তুমি ফিরছ তো?

চন্দন আজ একবার অফিসক্লাবে যাবে ভেবেছিল। মেটালিক্সের কেসটা নিয়ে চ্যাটার্জির সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার। শুদ্ধশীল যতই ব্যাচমেট্ হোক, ওর কল্‌জের জোর কম। তনুময় চ্যাটার্জিই তার বিপদের বন্ধু। চাণক্যের শ্লোকটা যেন কী ছিল? রাজদ্বারে, শ্মশানে যে সঙ্গে থাকে, সেই প্রকৃত দোসর! রাজদ্বার কি জেলহাজত?

চন্দন কি ভেবে মত বদলাল,—নাহ্, মা-র সঙ্গেই ফিরব। ফিরে বেরোতে পারি। রাজার আজ লাইফসায়েন্সের মাস্টারমশাই আসবেন না?

—আসবেন। আজ একটু দেরিতে আসবেন। রাজা তো ওঁর টাস্কই করছে

বসে। অনুরাধা গলা নামাল, —কী সুন্দর ছবি আঁকছে গো রাজা!

ছেলের ঘরের পর্দা বাতাসে উড়ছে। চন্দনের চোখ পড়তেই লম্বা ডোরাকাটা পর্দা নিমেষে গরাদ হয়ে গেল। উফ্, আবার সেই বিভীষিকা!

মার্বেল পাথরের চৌকো চাতাল ঘিরে খাড়া উঠে গেছে বাড়িটা। ছতলা। প্রতিটি তলার টানা বারান্দা বর্গক্ষেত্রের সীমানার আকার নিয়েছে। বারান্দার কোলে সার সার ঘর। ছোটখাটো অফিস। ডাক্তারের চেম্বার। প্রেস্। এক্সরে ক্লিনিক। গৃহস্থের ঘরবাড়িও। শতাব্দী প্রাচীন বাড়ির সর্বাঙ্গ জরাজীর্ণ। নোনায় খাওয়া। শ্যাওলা ধরা। এর মধ্যেই কোথাও কোথাও নতুন রঙের প্রলেপ আরও কুৎসিত করে তুলেছে বাড়িটাকে।

চন্দন প্রতিভাকে নিয়ে লিফ্‌টে উঠতে যাচ্ছিল, ধুতি পাঞ্জাবি পরা তাগড়াই দারোয়ান আটকাল তাদের, ইয়ে পেরাইভেট্ লিফট্ আছে। আপলোগকো লিয়ে নেহি।

—চারতলায় ডাক্তারবাবুর কাছে যাব। সঙ্গে পেশেন্ট আছে। ইনি হাঁটতে পারেন না।

—তো কেয়া? সিঁড়িসে চড়ুন। আহিস্তা আহিস্তা।

—চড়ুন বললেই হল? বলছি না ওঁর হাঁটুতে ব্যথা।

লোকটা চন্দনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্য দিকে তাকাল। একটু দূরে এক ঝাড়ুদারনি চাতালে জল ঢালছে, তার সঙ্গে গলা ছেড়ে রসিকতা জুড়েছে লোকটা।

অবিকল সেদিনের কনস্টেবল্‌টার মতো নির্বিকল্প হাবভাব। চন্দনের কি এখন শুধু অপমানিত হওয়ার কপাল চলছে! কন্‌স্টেব্‌লের হাতে! চোরছ্যাঁচোড় পকেটমারের হাতে! দারোয়ানের হাতে!

গাড়িতে গোটা পথ নিজে থেকে একটাও কথা বলেননি প্রতিভা। জোর করে আনার জন্য একটু যেন অভিমানের ভাব লেপটে আছে তাঁর মুখমণ্ডলে। লাঠি হাতে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন ছেলেকে, চলে আয়। আমি হেঁটে উঠতে পারব।

—থামো তো। চন্দন রায়চৌধুরী আর নতুন করে হারতে রাজি নয়। ফস্ করে পার্স থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করেছে। দারোয়ানকে টাকাটা দেখিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল, এবার যাবে তো?

—আইন নেই বাবু। মালিক জানলে বহুত গুসসা করবেন। নোট দুটো পকেটে পুরল লোকটা, —আসুন। মাইজির যখন তকলিফ হচ্ছে, কী কোরা যাবে!

লিফ্‌ট্ থেকে বেরনোর সময়ে চন্দন আদেশের সুরে বলল, আমার কিন্তু তোমাকে আরেকবার লাগবে। নামার সময়ে।

— কোই বাত নেই। আপনি স্যার একবার হাঁক দিবেন, আমি এসে যাব।

www.boiRboi.blogspot.com

ডাক্তারের ঘরে ঢুকে আরাম করে সোফায় হেলান দিল চন্দন। বিরক্তির ভাব কাটছে ধীরে ধীরে। পাশে প্রতিভা। তাঁর চক্ষু দুটি বোজা।

দুখানা বড় ঘরের একটাতে ডাক্তার বসেন, অন্যটায় অপেক্ষমান রুগী, রুগীর সঙ্গীসাথী। দুটো ঘরই আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। গোটা তিনেক কাচের আলমারি ভর্তি অজস্র ফাইল। সানমাইকা বসানো সেন্টার টেবিলের ফুলদানিতে দুটো টাটকা গোলাপ। টেবিলের তাকে কয়েকটা পুরনো ইংরিজি বাংলা ম্যাগাজিন। দেওয়ালে বড় অক্ষরের এক পাতার ক্যালেন্ডার। লাগোয়া খুপরিতে এক যুবক নিষ্ঠাভরে ওষুধ বানিয়ে চলেছে। কাজ করতে করতেই সে চন্দনের দিকে তাকাল, —আপনাদের অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট আছে?

—হুঁ। প্রতিভা রায়চৌধুরী।

লম্বা খাতা খুলে দেখল ছেলেটা, চারটেয়?

—হ্যাঁ।

—বসুন। ডাক্তারবাবু নিজেই ডাকবেন।

চন্দনরা ছাড়াও বেশ কয়েক জন বসে আছে সোফায়। চেয়ারে। প্রতিভা অনেকক্ষণ পর কথা বললেন। ছেলেকে ডাকলেন, চাঁদু....

—কী হল? জল খাবে? বসতে অসুবিধে হচ্ছে?

প্রতিভা চোখ খুললেন না। সোফায় হেলান দিয়ে দু দিকে মাথা নাড়ালেন, —চাঁদু তোর মনে আছে?

—কী?

—সেই একবার আমরা হরিদ্বার বেড়াতে গিয়েছিলাম। তুই তখন খুব ছোট। সাত আট হবি। আমরা দুজনে মনসা পাহাড়ে উঠলাম.... কী খাড়া খাড়া সিঁড়ি পাহাড়টার!

চন্দন অবাক হল, তোমার মনে আছে!

উদাস বাতাসের মতো হাসলেন প্রতিভা, তোর বাবা উঠল না। গঙ্গার ধারেই বসে রইল। তার অত দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল না। আমি আর তুই শেষে... চাঁদু তোর মনে পড়ছে?

মনে পড়ছে। মনে পড়ছে চন্দনের। দু পাশে ঘন জঙ্গল, তার ফাঁক দিয়ে মন্দির প্রায় দেখাই যায় না, তবু কী অদম্য টানে উঠছেন প্রতিভা। পরনে লাল পাড় গরদ, কপালে সিঁদুরের চাকা টিপ। আরেকটু বাবা, আরেকটু চল্।

শস্তার ঢলঢলে হাফপ্যান্ট পরা চন্দন জুতো খপ্‌খপ্ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে,— আমি আর যেতে পারছি না। তুমি যাও।

—এত কাছে এলি, ঠাকুর দর্শন করবি না?

—আমার পা ব্যথা করছে যে।

—পুণ্যি করতে হলে কষ্ট সহ্য করতে হয় বাবা।

চন্দনের বুকে কেউ যেন ছোট্ট চিমটি কাটল। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন খুলল।

প্রতিভা বললেন, আজও তুই কষ্ট করতে শিখলি নারে চাঁদু ?

চন্দন কান বন্ধ করে রইল। সুদর্শন নায়ক অবলীলায় নিজের অবৈধ প্রেমের কাহিনী শোনাচ্ছে। নায়কের স্ত্রীরও ইন্টারভিউ আছে সঙ্গে। সে স্বামীর নতুন সম্পর্ক নিয়ে তেমন ভাবিত নয়, তার মতে কেরিয়ার গড়তে গেলে এরকম ছোটখাটো ঘটনা ঘটবেই। শরীরী প্রেম তো মোটেই বিচিত্র নয়। তবু এত কিছুর পরও, তার স্বামীর ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু যে সে নিজেই, তাতে তার তিলমাত্র সংশয় নেই।

চন্দনের ঠোঁটে টেরচা হাসি ফুটল। অনুরাধা কি এসব গপ্পো পড়ে! নাহলে কী করে মেনে নিল সেদিনের আষাঢ়ে কাহিনী! নাহ্, গুলটা সেদিন একটু হেভি ডোজ হয়ে গিয়েছিল। অথচ ওই মিথ্যেটা অফিসেও তো সত্যি হয়ে গেল! তনুময় এমন নিখুঁত পেটখারাপের বর্ণনা দিচ্ছিল, চন্দনের নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সত্যি বোধহয় চ্যাটার্জির ফুড পয়জনিং হয়েছিল সেদিন। পাকে চক্রে চ্যাটার্জির বউ ছেলেমেয়েও সেসময় শিলিগুড়িতেই।

চন্দন ম্যাগাজিন রেখে বারান্দায় এসে সিগারেট ধরাল। সাড়ে চারটে বাজে, এখনও ডাক এল না প্রতিভার। ডাক্তাররা কেন যে টাইম ধরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়! আজ পর্যন্ত কোনও ডাক্তারকে ঘড়ি ধরে রুগী ডাকতে দেখল না চন্দন।

আকাশে হঠাৎ মেঘ জমছে। কাল মাঘের শেষ। দিন এখন আর ছোট্টটি নেই, তবু এর মধ্যেই আলো বেশ কমে এসেছে। নীচের চাতাল এখন আবছা গহ্বর যেন। সেদিকে তাকাতেই মাথাটা কেমন দুলে গেল চন্দনের। অনেক উঁচু থেকে নীচে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ হঠাৎ কেন যে ঝাঁপ মারতে ইচ্ছে হয়। ছুঁতে ইচ্ছে করে নীচটাকে!

ডাক্তারের ঘরে ঢুকে চন্দন খানিকটা আশ্বস্ত হল। ডাক্তারটি বেশ সৌম্যকান্তি। বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। কণ্ঠস্বর সহৃদয়। কাগজ কলম টেনে কেসহিস্ট্রি লিখতে শুরু করলেন তিনি, মা, আপনার বয়স কত ?

—সত্তর। না একাত্তর।

—ছেলেমেয়ে কটি ?

—এই এক ছেলে। আর এক মেয়ে আছে।

—ব্যাস্ ?

—না....মানে আরও দুজন এসেছিল। প্রতিভা অল্প ইতস্তত করলেন। মুখে আলগা ছায়া পড়ল যেন, দুটো ছেলে হয়েছিল। জন্মেই মরে গেছে। এই ছেলে হওয়ার আগে। লোকে বলত মড়ুঞ্চে পোয়াতি। আসে, কিন্তু থাকে না।

চন্দন বিস্মিত মুখে প্রতিভার দিকে তাকাল। এ ঘটনা তার জানা ছিল না। ছোটবেলায় শুনেছে মা কোন এক চন্দনেশ্বরের মন্দিরে মানত করার পর সে হয়েছিল। বাবা কথায় কথায় বলত, চন্দন তো তোমার মানতের ছেলে। বাবা কি ব্যঙ্গ করত মাকে ? নইলে চন্দন জন্মানোর পনেরো বছর পর, প্রায় বৃদ্ধ

www.boiRboi.blogspot.com

বয়সে লাজু হতেই পাগলের মতো আত্মহারা হয়েছিল কেন! মা অত লজ্জা পাওয়া সত্ত্বেও!

ডাক্তারবাবু ঝুঁকেছেন প্রতিভার দিকে, তারপর বলুন। আপনার প্রবলেমটা কী ?

চন্দন বলে উঠল—হাঁটু। তিন চার বছর ধরে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন।

—এই বয়সেই হাঁটুর ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন ? আমার মা তো আশিতেও ফিট। শুধু নাচতে পারে না, এই যা।

প্রতিভা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, উনি ছ বছর আগে চলে গেলেন, আমার পায়ের জোরও চলে গেল। তখন থেকে ব্যথা বাড়ছে তো বাড়ছেই।

কথাটা চন্দনের বুকে বাজল। মা কি বলতে চায় ছেলে ছেলের বউ মা-র যত্ন করে না ? এক্সরে প্লেটের বিশাল খামগুলো টেবিলে রাখল। পুরনো প্রেসক্রিপশনও। কপাল কুঁচকে বলল, —অনেক চেষ্টা করেছি। সব ডাক্তারই বলছেন অপারেশন করতে হবে। মা রাজি নন।

ডাক্তার একবার শুধু তাকালেন কাগজগুলোর দিকে, কাটাছেঁড়া না করে ভালই করেছেন। ওতে অনেক সমস্যা আসতে পারে। শরীরের স্বাভাবিক সাম্য বিঘ্নিত হয়। শরীর হল ফ্যামিলির মতো। হাত পা নাক চোখ সব এর মেম্বার। ফ্যামিলির একজন কেউ বিগড়ে গেলে আপনি তার ওপর লাঠিসোঁটা ছুরি চালাবেন ? বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনতে হবে।

প্রতিভা চোখ পিটপিট করলেন, তাতেও যদি না শোনে ?

—শুনবে না কেন ? নিশ্চয়ই শুনবে। না শুনলে গোটা ফ্যামিলিকেই কষ্ট ভোগ করতে হবে। ডাক্তারও হাসছেন, —ছোটবেলায় কী কী অসুখ হয়েছিল ?

—তেমন বড় অসুখ হয়নি। একবার শুধু জলবসন্ত...

—খুব ছোটতে হাম হয়নি ?

—সে তো সকলের হয়।

—ফেনিনজাইটিস ? ল্যারিঙজাইটিস ? টাইফয়েড ? মেনিনজাইটিস ? ডিপথেরিয়া ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মেনিনজাইটিস হয়েছিল। প্রতিভা সমুদ্রের তলা থেকে যেন কুড়িয়ে পেয়েছেন হারানো পাথর, শুনেছি নাকি এখনতখন অবস্থা হয়েছিল। কতদিন হাঁটতে চলতে পারিনি।

—ঠিক ধরেছি। তারপর ছেলেমেয়ে হওয়ার সময় অ্যানিমিয়া হয়নি ? বিকোলাই ?

চন্দন ডাক্তারের ঠোঁট নড়া দেখছিল শুধু। মেনিনজাইটিস শব্দটা বুকে টোকা মারছে তার। এখন তখন অবস্থা থেকে বেঁচে উঠে প্রতিভা সন্তানের মা হয়েছেন, নতুন শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে। অথচ বুবুন মরে গেল। বুবুনের থেকেও আরেকটা ধারা তো শুরু হতে পারত পৃথিবীতে!

প্রতিভা যদি না বাঁচতেন, চন্দনের অস্তিত্ব কি থাকত কোথাও ! অথচ চন্দন আছে। ভীষণভাবে আছে। জীবন মৃত্যুর এক চুল ব্যবধানের জন্য !

ডাক্তারের চেম্বার থেকে ওষুধ নিয়ে বেরোতে বেরোতে আঁধার নেমে গেল। পেট্রল আর ডিজেলের ধোঁয়ায় মহানগরীর দেহে কৃত্রিম কুয়াশার আবরণ। আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। মেঘ, মানুষ আর গাড়িঘোড়ার জঙ্গলে বাতাস নিথর। বৃষ্টি নামছিল।

জানলার কাচ নামিয়ে চন্দন সিগারেট ধরাল, গরম লাগছে ? তোমার কাচটা নামিয়ে দেব ?

—দে।

কাচ নামাতে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন প্রতিভা। তারপর হঠাৎই ঘুরে তাকালেন ছেলের দিকে, ওই লিফ্‌টের দারোয়ানটাকে তখন কত টাকা দিলি তুই ?

চন্দন কিছু না ভেবেই বলল, —যাতায়াতের জন্য মোট তিরিশ।

—লোকটাকে টাকা দিতে তোর হাত কাঁপল না ?

—কেন ! হাত কাঁপবে কেন !

প্রতিভা সিটে হেলান দিয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন, অন্যকে অন্যায় টাকা দিতে যার বাধে না, অন্যায় টাকা নিতেও কি তার বাধে ?

গাড়ির আয়নায় মালহোত্রার ড্রাইভারকে একপলক দেখে নিল চন্দন, আজ তুমি ভীষণ বকবক করছ মা। ডাক্তার কি জিজ্ঞেস করছে না শুনেই হুড়হুড় করে নিজের কথা সাতকাহন করে বলে যাচ্ছিলে ! তোমার স্কুল পাঠশালার গল্প শুনে ডাক্তারের কী হবে ?

প্রতিভার যেন ভর হয়েছে, বিড়বিড় করে আবারও বললেন, সারা জীবনই তো চুপ করে আছি, একদিন নয় বললামই।

—হয়েছে। এবার চুপ থাকো।

সার্কুলার রোড ধরে টিকিয়ে টিকিয়ে এগোচ্ছে গাড়ি। পার্ক স্ট্রিটের মুখে এসে ট্রাফিকে আটকাল। জানলায় এক শীর্ণ ভিখারিনী ঘ্যান ঘ্যান করছে। কোলে শীর্ণতর শিশু। ভগবান তোমাকে রাজা করে দেবে বাবু। ছেলেমেয়ে তোমার সুখে থাকবে।

চন্দন হাত নাচাল, ভাগো ভাগো।

গাড়ি স্টার্ট নিতে প্রতিভা পিছন ফিরে ভিখারিনীকে দেখলেন একবার। তারপর সোজাসুজি ছেলের দিকে, এই গাড়িটা কার রে চাঁদু ?

—আমাদের অফিসের একজনের।

—তোর সঙ্গে কাজ করে ?

—ওই আর কী। চন্দনের স্বরে রাগ ফিরল, এত জেরা করছ কেন ?

প্রতিভা ম্লান হাসলেন, তুই তো এখন বড়লোক। রাজা। কত লাখ লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছিস। তুই নিজে গাড়ি কিনিসনি কেন ?

www.boiRboi.blogspot.com

—কে বলল তোমায় আমি লাখ লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছি ? অনু বলেছে বুঝি ?

প্রতিভা জবাব দিলেন না।

চন্দন গলা নরম করল, তোমার ছেলে যথেষ্ট বড় চাকরি করে মা।

—সে তো করিসই। তবু কেমন ধন্দ লাগে। আট দশ লাখ টাকা জমাতে...মাসে মাসে কত বাঁচালে তবে... ! তোর বাবা সারা জীবনে দশ হাজার টাকাও সঞ্চয় করতে পারেনি।

—আজকালকার ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর দাম দেখেছ ? গভর্নমেন্টের তৈরি ফ্ল্যাট ? আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের জন্য ? সেগুলোরই পাঁচ ছ লাখ টাকা দাম। আমাদের মতো মানুষরা যদি জমাতেই না পারে, সরকার অত দাম করে ?

—আমি অত বুঝি না রে চাঁদু। খালি ভাবি কত টাকা মাইনে পাস তুই ? সাত হাজার ? আট হাজার ? দশ হাজার ? বারো হাজার ? যেরকম ঠাটবাটে থাকিস, রাজার পেছনে খরচাপাতি করিস, তাতে জমে কত ? তোর তো বাড়ি ভাড়াই সাড়ে তিন হাজার রে !

—তুমি তো সুবিধের লোক নও মা। চন্দন ঠাট্টা করতে গিয়েও রুক্ষ হয়ে গেল, পষ্ট করে বলো তো কী বলতে চাও তুমি ? তুমি কি বলতে চাও তোমার ছেলে চুরিডাকাতি করে ?

প্রতিভার ছানিপড়া চোখ বাইরে মেললেন। একটু ফাঁকা পেয়েই হু হু করে ছুটছে গাড়ি। টুকরো টুকরো বৃষ্টির দানা ধেয়ে এল ভেতরে।

—কোন ছোট্টটি থেকে তোকে দেখছি রে চাঁদু। মিছে কথা বলে ধরা পড়লেই গলা বাজাতে শুরু করতিস তুই। অফিসের নাম করে দুদিন ফিরলি না, ফিরে এসে অনু কথা বলতেই চোটপাট। আমি কি কিছুই বুঝি নারে ?

চন্দনের শিরদাঁড়ায় কেউ বুঝি ব্লেড টেনে দিল, কী বুঝেছ তুমি ?

এক দানা বৃষ্টি যেন ছিটকে এসেছে প্রতিভার চোখে, তোকে কত যত্ন করে মানুষ করেছিলাম আমরা। সে তুলনায় লাজু তো হেলাফেলায় বড় হল। তবু লাজু একরকম হল আর তুই একদম অন্যরকম।

চন্দনের জিভ শুকিয়ে গেল, —আমি কিরকম হয়েছি ?

—সে আমি কী বলব ? তুই নিজেকে প্রশ্ন কর।

চন্দনের হঠাৎ শীত করছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে জানলার কাচ তুলে দিল। সিগারেটের প্যাকেট পায়ের কাছে পড়ে গেছে। নিচু হয়ে প্যাকেটটা খুঁজছিল চন্দন, পাচ্ছিল না।

প্রতিভা বললেন, বউ ছেলেকেও মিথ্যে বলিস তুই ? কী পাপ যে করে চলেছিস বাবা...

—কী পাপ পাপ করছ ? ড্রাইভারের উপস্থিতি ভুলে চন্দন গলা চড়িয়ে ফেলল এবার, পাপ যদি করেই থাকি, সেই পাপের অন্ন তো তোমরা সকলে

ভোগ করছ। কারও তো সুখের কমতি দেখি না।

প্রতিভা আঁচলের খুঁটে চোখের কোণ মুছলেন।

চন্দন চিত্রার্পিতের মতো মাকে দেখছিল। মা-র নিরীহ শান্ত চেহারার পিছনে এত দক্ষ এক শল্য চিকিৎসক কোথায় লুকিয়েছিল এতদিন। চন্দন প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল মা যেন আর একটাও কথা না বলে।

প্রতিভা ছেলের প্রার্থনা উপেক্ষা করলেন, মনে আছে চাঁদু তোর বাবাকে এক ছাত্র একবার ভিড় বাসে মদের বোতল ধরতে দিয়েছিল। বুঝতে পেরে তোর বাবা জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল বোতলটা। তোর বাবা অন্যের কোনও অন্যায় কাজেরই দায় নিতে রাজি হয়নি কখনও। তাই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। অসহায় হওয়ার আগে। আমি মা। আমি কি তা পারি?

চন্দন প্রতিভাকে থামাতে চাইল, স্বর ফুটল না গলায়।

ছেলের গায়েপিঠে হাত বোলাচ্ছেন প্রতিভা, তুই যেমনভাবে চাস তেমনভাবেই বাঁচ বাবা। তোর পাপ আমি আমার শরীরে ধারণ করে নেব। যতটা পারি। ওই বিষ আরও যন্ত্রণা হয়ে ফুটে বেরোবে দিনদিন। বৃথা ডাক্তার দেখিয়ে কী লাভ!

চন্দনের চোখে জল ছিল না। তবু চন্দন কাঁদছিল। নিঃশব্দে।

আট

যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ!

ঝাঁক ঝাঁক বোমারু বিমান ঢুকছে শত্রুপক্ষের এলাকায়। স্থলপথে ধেয়ে এল পাল পাল দুর্দমগতি ট্যাঙ্ক। সমুদ্রের নীল জলে ফ্রিগেট, সাবমেরিন। মিলিটারি প্লেন উগরে দিচ্ছে পিলপিল প্যারাট্রুপার। এক। দুই। তিন। চার। অসংখ্য। বর্ণহীন বায়ুস্তর কালো বিন্দুতে ছেয়ে গেল। রাইফেল স্টেনগান গ্রেনেডে সজ্জিত সৈনিক আক্রমণ হানছে অবিরাম। কামান মর্টারের গোলা আছড়ে পড়ল শত্রুভূমিতে। বুম বুম। বুম বুম।

পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু হল এবার। আগুন জ্বেলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে বিমান ট্যাঙ্ক সাবমেরিন। প্যারাট্রুপাররা শূন্যেই ধ্বংস হয়ে চলেছে। সৈনিকদের দেহ ছিন্নভিন্ন। ভূলুণ্ঠিত।

রাজার চোখ বিস্ফারিত। আরও বিস্ফারিত। দাঁতে দাঁত চেপে বাটন্ টিপছে, স্টিলের হাতল ঘুরিয়ে চলেছে ক্ষিপ্র গতিতে। হাতল ওপরে ওঠাল, দুটো প্যারাট্রুপার মরল। একটু কোণাকুণি নামাল, দপ করে জ্বলে গেল বোমারু বিমান। পাশে আরেকটু চাপ, সাবমেরিন গেল। হাতল নীচে, ট্যাঙ্ক খতম।

পর্দার এক কোণে হু-হু করে পয়েন্ট উঠছে রাজার। পাঁচশ। হাজার। দশ হাজার। বিশ হাজার। পঞ্চাশ হাজার। লাখ।

www.boiRboi.blogspot.com

সময় শেষ। রণাঙ্গন শান্ত। এক লাখ চল্লিশ হাজার ন'শোতে রাজাকে থামতে হল। যন্ত্রের প্রান্তদেশে আজকের সর্বোচ্চ স্কোর জ্বলজ্বল করছে। দু লাখ এগারো হাজার। রাজা মুষ্টিবদ্ধ দু হাত অধৈর্যভাবে ঝাঁকাল। আবার খেলতে হবে। আরও বেশি ধ্বংস করে পেতেই হবে সর্বোচ্চ পয়েন্ট। এক্ষুণি কয়েন চাই কয়েকটা। এক্ষুণি।

রাজা পকেটে হাত দিল। ধ্যাৎতেরি, শুধু একটা পঞ্চাশ টাকার নোট। মা ওষুধ কেনার জন্য দিয়েছে। কাশির ওষুধ। জোর সর্দিকাশি লেগেছে মা-র। রাজা ভিডিও পার্লারের তরুণ মালিকের দিকে তাকাল, —দুটো কয়েন হবে বাবলুদা? একদম খুচরো নেই।

—খেল না। কটা কয়েন চাই?

দুটো কয়েন ফেলে আবার যুদ্ধে নামল রাজা। হল না। দেড় লাখে আটকে গেছে।

আবার দুটো কয়েন ফেলল। এবার দেড় লাখেরও কম।

আবার দুটো কয়েন। এক লাখ সত্তর হাজার তিনশ। রাজার জেদ চেপে যাচ্ছিল। গোটা চোদ্দ কয়েন খসিয়েও কিছুতেই দু লাখে পৌঁছতে পারল না। নোট ভাঙিয়ে রাজা হতাশ মুখে বেরিয়ে এল পার্লার থেকে। না, এই গেমটা বড় টাফ্। কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না।

ফাল্গুনের বিকেল, তবু বসন্ত শহর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে। মাঝে কদিন বেশ গরম পড়েছিল, মাঘ মাসের শেষ দু দিন ভারী বৃষ্টি হয়ে বদলে গেছে আবহাওয়া। গুটিগুটি পায়ে শীত ফিরেছে নতুন করে। শেষ কামড় বসাতে। ঘরে ঘরে সর্দিকাশির প্রকোপ বাড়ছে। জ্বরজারিও।

মোড়ের বড় ওষুধের দোকানে অনেক ক্রেতার ভিড়। রাজা কিছুতেই কাউন্টারে পৌঁছতে পারছিল না। দুই বয়স্ক লোকের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে চেষ্টা করল।

—এ কী! গোঁতাচ্ছ কেন খোকা!

—কই গোঁতালাম! কাউন্টারে যাব না?

—যাবে বইকি। নিশ্চয়ই যাবে। পরপর এসো। আগে আমার হোক।

রাজা ভদ্রলোকের পরোয়া করল না, কাউন্টারের লোকটিকে উচ্চৈঃস্বরে নাম বলল সিরাপের। লোকটির ভ্রূক্ষেপ নেই, সে ঠাণ্ডা মাথায় ক্যাশমেমো লিখে চলেছে। ওষুধের ফাইল ধরে ধরে নাম, ব্যাচ নাম্বার, রিটেল প্রাইস্। একবারে হল না, আবার প্রেসক্রিপশন ধরে মেলাচ্ছে, ক্যালকুলেটার টিপে চলেছে টকটক।

রাজা উশখুশ করল, —কী হল? আমারটা দিন।

—হচ্ছে। হচ্ছে। কথা বোলো না। বিলে ভুল হয়ে যাবে।

—আমার পরে এসে সব আগে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমার বেলায় যত দেরি!

—কেউ তোমার আগে নেয়নি। লোকটা বিকারহীন মুখে তাক থেকে অন্য একটা ওষুধ নামাচ্ছে, —কেন যে এই বাচ্চা ছেলেদের ওষুধ কিনতে পাঠায়? এতটুকু তর সয় না!

রাজা তপ্ত হল, —ফালতু কথা বলছেন কেন? আপনার ওষুধ দিতে দিতে রুগী তো মরে ঢোল হয়ে যাবে।

দোকানদারও ধৈর্য হারাল, —নেবে তো কাশির সিরাপ, তার আবার কত কথার কায়দা!

—কাশির ওষুধ কি ওষুধ নয়! নাকি আমি ওষুধ মাগ্‌না নিতে এসেছি! পয়সা ফেলে ওষুধ নেব। বিশটা দোকান পড়ে আছে...

রাজা গটগট করে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি থেকেই দোকানদারের মন্তব্য শুনতে পাচ্ছিল সে।

—দেখলেন কথার ছিরি। কী যে সব তৈরি হচ্ছে আজকাল। মাঝবয়সী এক টেকো লোক ফুট কাটল, —সময় নেই, এদের একদম সময় নেই। মারবে তো গিয়ে আড্ডা! নয়ত টিভির সামনে বসে খেমটা নাচ দেখবে!

রাজা ঘুরে আগুন চোখে লোকগুলোর দিকে তাকাল। দেখলে দেখব, তাতে তোর কিরে বুড়ো ভাম! ওষুধের দোকানে লাইন মেরে মেরেই তো মাথা পাকা বেল করে ফেললি! তোর মতো তীর্থের কাক হয়ে লাইন মারার জন্য জন্ম হয়নি রাজার। সময়ের মর্যাদা কাকে বলে বুঝিস!

গোলপার্কের কাছে এসে রাজা অন্য দোকান থেকে ওষুধটা কিনল। একটু এগোলেই বাঁদিকে আরেক ভিডিও গেমসের পার্লার। নতুন দোকান খুলেছে বলে দশ টাকার খেললে ছোটখাটো গিফট্ দেয়। খেলাগুলো এমন কিছু নতুন নয়। বেশির ভাগই মোটর সাইকেল আর কার রেস। তবু রাজার হাত নিশপিশ করছিল। একটু ঢুকলে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মা-র মুখ মনে পড়ে গেল। মা-র মুখ নয়, বাঘিনীর মুখ যেন। বাঘিনী আজ বেশ কাদায় পড়েছে। কাল রাতে অল্প অল্প কাশছিল, আজ সকাল থেকে কেশে গলা চোট। ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বর বেরোচ্ছে, কি বেরোচ্ছে না! দেরি করিস্ না রাজা। ওষুধটা খেয়ে একটু শোব ভাবছি। জ্বর আসছে বোধহয়।

বাঁচা যায়। কদিন বিছানায় লেটে থাকলে যদি ট্যাকট্যাকানি কমে! পরীক্ষার যে ঠিক দু সপ্তাহ বাকি, তা কি রাজা জানে না! না রাজার কোনও ভাবনা চিন্তা নেই! রাজা যথেষ্ট সিরিয়াস। তা বলে কি সারা দিনে দু সেকেন্ডও মাথা ছাড়ানো যাবে না!

রাজা ওষুধের শিশি দু হাতের তেলোয় পাক খাওয়াল। দোকানদারের ইঙ্গিত খুব ভুল নয়। কাশির ওষুধ দু ঘণ্টা পরে খেলে কেউ মারা যায় না। নয় মা কিছুক্ষণ কাশলই। ওষুধ যখন পড়ার ঠিক পড়বে।

...ক্লাস ফোরের রাজা পাবলিক বাসে স্কুল থেকে ফিরছে। গড়িয়ামুখী বাসে সর্বে রাখার স্থান নেই। একটা লেডিজ সিট খালি হতেই চতুর মাজারীর

www.boiRboi.blogspot.com

তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল অনুরাধা। তিন চার জন মহিলাকে কনুই-এর ঠোক্করে টপকে সিটের দখল নিয়েছে। চেঁচাচ্ছে, —রাজা আয় আয়। বসবি আয়।

রাজা সামনের বৃদ্ধার পা মাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধা হাউমাউ করে উঠলেন, —ও বাবারে, গেলাম রে...

সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধা ঝাপটে উঠেছে, —ওইটুকু বাচ্চা একটু পা মাড়িয়ে ফেলেছে তার জন্য এত চেঁচাচ্ছেন কেন?

বৃদ্ধা তখনও কাতরাচ্ছেন, —নামেই ওইটুকুন। ওজন তো কম নয় বাবা।

—আশ্চর্য! আপনি একটা নাতির বয়সী ছেলেকে নজর দিচ্ছেন? অনুরাধা ছেলেকে টেনে নিল, —বোস্। এখানে বোস্।

গাবলুগুবলু রাজা সিটে বসে মাকে বলল, —আমাকে ব্যাগটা দাও।

—না না, তুই বোস্ ভাল করে। ছেলেকে বসিয়ে অনুরাধা ভিড়ে টাল সামলাচ্ছে, কাঁধে ছেলের দুমনী বোঝা। ঝুঁকে জানলার রড ধরে দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখার চেষ্টা করছে।

এক ভদ্রলোক বললেন, —দিদি, ব্যাগটা ছেলেকে দিয়ে দিন না।

ঘামভেজা মুখে অনুরাধার উত্তর, —থাক, সেই নটা থেকেই তো এই বোঝা বইছে। বলতে বলতে কসরত করে ছেলের টিফিনকৌটো বার করে ফেলেছে ব্যাগ থেকে,—এ কী! আঙুরগুলো খাসনি কেন! সব পড়ে আছে!

জানলার ধারে বসে আঙুর খাচ্ছে রাজা। আরামে জুড়িয়ে যাচ্ছে তার মুখ চোখ। অনুরাধা ভিড়ের চাপে...।

এ-সব ঘটনা রাজার কিচ্ছু মনে নেই! মনে রাখার দায়ও নেই!

রাজা টাকা গুনল। উনিশ টাকা সত্তর। পার্লারে ঢুকবে, কি ঢুকবে না! মা হিসেব চাইবেই। কিছু ফেরত না দিতে পারলে...

—কী হিসেব করছিস রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

রাজা কাঁধে থাপ্পড় খেয়ে পিছন ঘুরে দেখল। টুকুন। টুকুনের হাতে প্রকাণ্ড মিষ্টির হাঁড়ি।

—তেমন কিছু না। এই একটু খেলব কিনা ভাবছিলাম। রাজা অপ্রতিভ মুখে হাসল। হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল, বাড়িতে প্রচুর গেস্ট এসেছে বুঝি?

—গেস্ট বলে গেস্ট্। পঙ্গপাল। হবু বর, তার বাপ মা, দিদি, দিদির দুটো গেঁড়ি গেঁড়ি, মামা মামি...

—রুমদির বিয়ে ফিক্সড্?

—বড়দিভাই-এর না, ছোড়দিভাই-এর। পুজোর পর বরের বাবা মা দেখে পছন্দ করে গিয়েছিল। বর গত সপ্তাহে দিল্লি থেকে এসেছে। ছোড়দিভাইকে দেখে সে একেবারে থ্রিলড্। আজ আশীর্বাদ।

—বিয়ে কবে?

পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত-১৮৯৭

—ওদের তো মার্চেই ইচ্ছে ছিল, আমার পরীক্ষা বলে বৈশাখে পিছিয়ে গেল।

—রুমদির আগে ঝুমদির বিয়ে হয়ে যাবে ?

টুকুন চোখ টিপল। —এক মাস পিছনোর সেটাও একটা কারণ। বড়দিভাই-এরও জোর দেখাশুনো চলছে, এর মধ্যে যদি লেগে যায়! আসল ব্যাপারটা হল কপাল। ছোড়দিভাই-এর লাক ভাল। এ ছাড়া নিজেও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। মালটিন্যাশনালে ঘ্যামচ্যাক চাকরি করছে। বিয়ের বাজারে এক সিটিং-এ বেরিয়ে গেল। বড়দিভাইটা যদি চাকরি বাকরি করত... তুই-ই বল বড়দিভাই বেশি ফর্সা না ?

—শুধু ফর্সা কেন, রুমদির মুখটাও কত সুন্দর! সরস্বতী ঠাকুরের মতো। রাজা পলকা কৌতূহল ছুড়ল, —ঝুমদির বর করে কী ?

—পুষ্পলদাও ইঞ্জিনিয়ার। মেকানিকাল। তবে ছোড়দিভাই-এর মতো অত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট নয়। চাকরি অবশ্য ভালই করে। ভাল ফার্ম। ফরিদাবাদে কোয়ার্টার পেয়েছে...

—বিয়ের পর কী হবে! ঝুমদির চাকরি তো জামসেদপুর! দিল্লি জামসেদপুর করে বেড়াবে!

—তা কেন! ছোড়দিভাইদের দিল্লিতেও অফিস আছে। ট্রান্সফার নেওয়ার চেষ্টা করবে। না হলে চাকরি ছেড়ে দেবে।

—অত বড় চাকরি ছেড়ে দেবে!

—উপায় কী। ঘরসংসার তো করতে হবে। টুকুন অবিকল প্রবীণদের মতো কথা বলছে, —মেয়েদের আগে বর, পরে চাকরি।

—আমার এক মাসিরও সেম প্রবলেম চলছে। মা-র খুড়তুতো বোন। মাসি গোঁ ধরে আছে চাকরি ছাড়বে না, ওদিকে মেসো একা একা আগরতলায় পচছে। রিসেন্টলি দুজনের হেভি ফাইটিং হয়েছে।

—হুঁ, মেয়েদের এ-সব কেসে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়াই উচিত। ছোড়দিভাই ঠিক করে নেবে। টুকুনের গলা ভারিক্কি আরও, —তুই ফিরবি ? না খেলবি এখন ?

—আজ থাক। খেলব না।

রাজা দু চার পা এগিয়েও থেমে গেল। কাল টিউটোরিয়ালে সাগ্নিক বলছিল দেয়ার বাবা নাকি একটা দারুণ হিস্ট্রির সাজেশান তৈরি করেছে। দেয়া নিজে অবশ্য রাজাকে বলেনি। আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে দেয়াটা! আগে টিউটোরিয়াল শেষ হওয়ার পর দু পাঁচ মিনিট দাঁড়াত, রাজার সঙ্গে ফিরত গল্প করতে করতে; আজকাল টিউটোরিয়াল শেষ হলেই ভ্যানিশ। এমনিতে রাজার সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, সবই ঠিক আছে, তবু কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব। রাজা সেদিন ওদের বাড়ি যেতে চাইল, মুখের ওপর বলে দিল, আজ নয়রে। আজ আমি গিয়েই পড়তে বসব। হঠাৎ এমন ভাব করছে যেন ও

www.boiRboi.blogspot.com

একাই মাধ্যমিক দেবে! রাজারা সব এলেবেলে! একবার গিয়ে দেখলে হয় কী এত মন দিয়ে পড়ছে দেয়া!

টুকুন রাজাকে টানল, —কী হল রে তোর ? স্টিল হয়ে গেলি কেন ?

—তুই এগো। আমি একটা বন্ধুর বাড়ি যাব। হিস্ট্রির সাজেশান আনতে হবে।

—ভাল সাজেশান ?

—ভাল তো বটেই। বন্ধুর বাবা হিস্ট্রির প্রফেসার। তুই কাল সকালে আমার বাড়ি আয়, তোকেও দিয়ে দেব।

—উরেব্বাস্। টুকুন আঁতকে ওঠার অভিনয় করল, —আমি বাবা আর তোমার বাড়ি যাচ্ছি না। মাসিমা এমন চোখ পাকিয়ে তাকান...! গিয়েই বা কী লাভ! তুই তো নাকি কোনও সময়েই বাড়ি থাকিস্ না! আজ পিসিমণির বাড়ি! কাল মামার বাড়ি! আরও যেন কার কার নাম বলেন মাসিমা! হিহি। হিহি।

টুকুনের হাসিতে অস্বস্তি হচ্ছিল রাজার। মা'টা যেন কী! গুল মারতে হয় মারো, লিমিট রেখে মারো! রাজাকে বেইজ্জত করা কেন!

রাজা লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, —কাল আয় না। আমি তো বলছি আমি দেব।

হাঁটতে হাঁটতে আনমনে আকাশ দেখছে রাজা। আকাশ বহু ওপরে আজ। দূর নীলে পাতলা পাতলা সাদা মেঘ। এ মেঘে বৃষ্টি হয় না। রাজা জানে। এ মেঘ আকাশের বাহার। কী যেন নাম এই মেঘের ? নিম্বাস্ ? না সিরাস্ ? নিম্বাস্ তো বৃষ্টির মেঘ ? নাকি সিরাসেই বৃষ্টি হয় ? বই-এর ছবিটা মনে করতে চাইল রাজা। গুলিয়ে যাচ্ছে। ভূগোল বড় ঝামেলার সাবজেক্ট। কোনও বাঁধা ছক নেই, কিছুতেই মুখস্থ রাখা যায় না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই রাজার হাসি পেয়ে গেল। গড়িয়ার বাড়িতে বড়মা কিসব অদ্ভুত অদ্ভুত মেঘেদের নাম বলত! কুণ্ডল মেঘ! কোদালে মেঘ! হাঁড়িয়া মেঘ! কুড়ুলে মেঘ! বড়মা রাজাকে দু-একটা মেঘ চেনাবার চেষ্টাও করেছিল সেসময়। দূর দূর, কি হবে জেনে! পরীক্ষায় যদি না'ই আসে, খামোকা মেঘ চিনে রাজা কেন সময় নষ্ট করবে!

রাস্তা দিয়ে রাজার একা একা হাঁটার দৃশ্যটি ভারী মনোরম। তার চোখের সামনে তখন একটার পর একটা ছবি ফুটে ওঠে। আর ঈষৎ দুলে দুলে হেঁটে চলে রাজা। ছবিগুলোকে চোখে রেখে। এই একলা চলার সময় সে পথচারীদের উপস্থিতি মনে রাখে না, বাস-ট্যাক্সি গাড়ি মিনির নির্ভীক বিচরণভূমি গোচরে আসে না তার।

রাজার ছবিরা অবশ্য সংখ্যায় খুব বেশি নয়। রঙিন পর্দার ভিডিও গেমের খেলারাই তার একান্ত ছবি। চলমান রাজা কাল্পনিক রিমোট কন্ট্রোলে চাপ দেয়। হু-হু করে উল্টো দিক থেকে ছুটে আসে গাড়িরা। তাদের ক্রমাগত

কাটাতে কাটাতে রাজার গাড়ি এগিয়ে চলে। চকিত ধাক্কায় লেন্ থেকে ছিটকে যায় মাঝে মাঝে। রাজা দ্রুত হাতল ঘুরিয়ে আবার পথে নিয়ে আসে তাকে। গাড়িরা বদলে কখনও মোটরসাইকেল হয়ে যায়, কখনও বা স্পিডবোট। কিন্তু ছবির চরিত্র, মাত্রা, রঙ, ঘনত্ব বদলায় না খুব একটা। ইদানীং যুদ্ধের মহড়াটাই বেশি আসছে চোখের সামনে। ধূমকেতুর মতো মিসাইল ছুটে বেড়াচ্ছে চারদিকে। স্কাড আর টোমাহকের মারণলড়াই দেখতে দেখতে রাজা পা চালায়। এ সময়ে দৃশ্যত তাকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, তার হাঁটার ছন্দেও পরিবর্তন ঘটে না তেমন। শুধু হঠাৎ হঠাৎ ঠিকরে ওঠে রাজার চোখের মণি, কখনও বা তা নিষ্প্রাণ। বছর কয়েক আগেও স্পাইডারম্যান সুপারম্যানরা ছিল তার ছবির তালিকায়। এখন তারা উধাও হয়ে গেছে মহাশূন্যে।

কিছুদিন ধরে আরেকটা ছবিও আসতে শুরু করেছে। ছবিটা এখনও তেমন স্পষ্ট নয়, এসেই মিলিয়ে যায়। এই ছবি রাজার মনে তার মা বুনে দিয়েছে। তাদের আগামী বাড়ি।

গড়িয়ার বাড়ি থেকে কাঁকুলিয়ায় এসে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিল রাজা, —মা কী দারুণ বাড়ি গো! চকচক করছে মেজেটা! ঠিক বড়লোকদের বাড়ির মতো! আমরা কি বড়লোক হয়ে গেছি মা!

অনুরাধা ছেলের গাল টিপে দিয়েছিল, —দূর বোকা, বড়লোকদের তো নিজের বাড়ি থাকে। ইয়া বড়। প্রাসাদের মতো। এটা তো ভাড়া বাড়ি।

সেই প্রাসাদই তৈরি হবে এবার। কাচের ঘর, অর্কিড হাউস, মোটা মোটা নরম ঘাসের সবুজে লন, এ-সব তো থাকবেই। তার সঙ্গে আরও একটা অনুষঙ্গ যোগ করে নিয়েছে রাজা। মনে মনে। অ্যাকোয়ারিয়াম। রাজার নিজস্ব ঘরে। গোটা দেওয়াল জুড়ে। কালো হলুদ লাল সোনালি হরেক রঙের মাছ তিরতির সাঁতার কাটবে নীলচে জলে। রাজা যখন ছোট, প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাঝে মাঝেই উপচে যেত তাদের গড়িয়ার বাড়ির পাশের পুকুরটা। খলসে পুঁটি চ্যাঙ-মৌরলা জলের সঙ্গে ঢুকে পড়ত উঠোনে। কিলবিল খেলা করত। দাদু নাতি গামছা ফেলে মাছ ধরত। তখন থেকেই কি মাছেরা...! কাচের মৎস্যাধার ভরে থাকবে নুড়িপাথর আর জলজ লতায়, বাতাস বুদবুদ কাটবে অবিরল। দীপেদের বাড়িতে যেরকম আছে ঠিক সেইরকম। চঞ্চল মাছেদের দেখতে দেখতে রাজার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসবে। ঘুম। ঘুম। স্বপ্নমাখা ঘুম।

নাহ্, স্বপ্নজড়ানো ঘুম আর কোথায় রাজার! অনেক দিন হয়ে গেল তার ঘুমে কোনও স্বপ্ন আসে না। সে এখন জন্তুদের মতোই স্বপ্নহীন। ছোটবেলায় তার ঘুমে পরীরা আসত। পক্ষীরাজে চড়ে রাজপুত্র। সোনার কাঠি রুপোর কাঠি। প্রতিভার গল্প বেয়ে। তারা যে কবে হারিয়ে গেল! তারপর এল ফ্লাইংসসার। ইউ এফ্ ও। তারাও আর নেই। এখন রাজার শুলেই ঘুম। মড়ার মতো ঘুম। স্বপ্নের ভিডিও যদি কখনও চলতে চায়, অসহ্য এক চাপ

www.boiRboi.blogspot.com

অনুভব করে রাজা। বুকের ভেতর। বই খাতা পেনসিল কলম, জিওমেট্রি বক্স, টিফিনবক্স ভর্তি ব্যাগের চাপ। সুপ্ত রাজা সেই চাপে ক্রমশ বেঁকে যেতে থাকে বিছানায়। নুয়েপড়া শিরদাঁড়া ঋজু রাখতে চেষ্টা করে আপ্রাণ, পারে না। কোথা থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলির শব্দ আছড়ে পড়ে রাজার কানে। ঘুম শেষ।

দিন আর রাতের মাঝে, আলো আর আঁধারের মাঝে, পূর্ণ জাগরণ আর গাঢ় নিদ্রার মধ্যিখানে আরও একটা সময় আছে রাজার। সেই সময়টুকুই রাজার গোপন সুখ। রাজার দেওয়াল তখন ভরে ওঠে অগুন্তি কল্পচিত্রে। নাম না জানা, চেনা, অচেনা, নানান নারীদের শরীর জ্যামিতিক নক্সার মতো ফুটে ওঠে, বদলাতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। এ দৃশ্য এত গোপন, এত নিষিদ্ধ যে রাজা দিনের আলোয় তাদের দেখতে সাহস পায় না। ভুলে থাকে। থাকতে চায়।

আজও রাজা চোখ রেখেছিল যুদ্ধে। দেয়াসিনীদের বাড়ি পৌঁছে হুঁশ ফিরল। দরজার সামনে এসে রিমোট টিপে অফ্ করে দিল যুদ্ধের ছবি।

দেয়াসিনীকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কোমল গোলাপি নাইটির অন্তরালে প্রস্ফুটিত দেয়ার নতুন যৌবন। চুলের তরঙ্গে, ভ্রূপল্লবে কী তীব্র চোরা আকর্ষণ! অপূর্ব এক সুরভি ক্ষণেকের জন্য সম্মোহিত করে ফেলেছিল রাজাকে, রাজা চোখ বন্ধ করে চোখ খুলল, —পড়ছিলি নাকি?

দেয়া পাশ কাটানোর ভঙ্গিতে বলল, —এটা তো পড়ারই সময়।

রাজা ওষুধের শিশিটা তুলে দেখাল, —মা-র ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম অনেকদিন তোর বাড়ি ঢুঁ মারা হয়নি, আজ তোকে একটু ডিসটার্ব করে যাই।

দেয়া বাড়ির ভেতরটা টুক করে দেখে নিল, —আয়।

দেয়ার পড়ার টেবিল সুবিন্যস্ত। দেখলেই বোঝা যায় এখন দেয়া মোটেই পড়াশুনা করছিল না।

রাজা মোড়া টেনে বসল, —তুই কবে থেকে বিকেলে পড়া শুরু করলি?

—পড়ছি। তোর প্রিপারেশন শেষ?

পলকের জন্য আকাশের পেঁজা পেঁজা মেঘটাকে দেখতে পেল রাজা— জিওগ্রাফিটা ঠিক গ্রিপে আসছে না। হিস্ট্রিটাও। কিছুতেই সাল তারিখ মনে থাকে না। রাজা দেয়ার চোখে চোখ রাখল,— মেসো কী সাজেশান তৈরি করে দিয়েছেন শুনলাম?

—তুই নিবি?

—দে। জেরক্স করে ফেরত দিয়ে যাচ্ছি।

দেয়া বইখাতা সরিয়ে সাজেশান খুঁজছিল, রাজা জিজ্ঞাসা করল,— অ্যাডমিট কার্ড কবে আসবে শুনেছিস?

—পাঞ্চালীর মা কাল এসেছিলেন। পাঞ্চালীকে নাকি স্কুল থেকে বলেছে কামিং উইকে আসবে। সোমবার, কি মঙ্গলবার। নিজেদের সই করে নিয়ে

আসতে হবে।

শিপ্রা পাশের ঘর থেকে চেঁচাল,— কে এসেছে রে দেয়া ? কার সঙ্গে কথা বলছিস ?

নিমেষে দেয়ার মুখ সাদা,—সৌভিক এসেছে মা।

শিপ্রা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীমাতার মতো উড়ে এসেছে ঘরে। রাজাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মেয়েকে বলল,— তুমি আজকাল ভীষণ অবাধ্য হয়ে গেছ দেয়া। কত বার বলেছি পরীক্ষার আগে আড্ডা মারবে না।

রাজা থতমত খেয়ে গেল— না মাসি, আমি ঠিক আড্ডা মারতে আসিনি।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। যা কাজ আছে তাড়াতাড়ি সেরে চলে যাও। দুদিন পরে পরীক্ষা... !

রাজা শিপ্রার আচরণের মাথামুণ্ড বুঝতে পারছিল না। মাসির কি আজ মেজাজ ফেজাজ খারাপ নাকি ! কাজের লোক আসেনি ! মেসোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে !

সাজেশান না নিয়ে ক্ষুণ্ণ মুখে উঠে দাঁড়াল রাজা। শিপ্রা চলে যেতে গিয়েও আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে— সৌভিক, তুমি যে আগের দিন আমাদের এখানে এসেছিলে, সেদিনই তো তোমার বাবা বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, তাই না ?

রাজা কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। অত তুচ্ছ কথা এতদিন মনে থাকে ! পরক্ষণেই মনে হল সত্যিই তো সেদিনের পর আর আসা হয়নি। বাবার খবরটা রাজা দিয়ে যায়নি বলেই কি চটে আছে মাসি ! রাজা লজ্জিত ভাবে বলল, — হ্যাঁ মাসি। দেয়াকে তো আমি বলে দিয়েছিলাম ! অবশ্য আমার নিজেরই তোমাদের খবর দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

শিপ্রা রাজার কথা শুনলই না, খানিকটা বিদ্রূপের ঢঙে বলল, —তিনি এখন আছেন কেমন ?

—বাবা ! রাজা ভীষণ অবাক,— বাবা যেমন থাকে তেমনই আছে। ভালই আছে।

—হুঁ। ভাল থাকলেই ভাল। সংসারের মঙ্গল। বাঁকা ভাবে শব্দ কটা ছুড়ে দিয়ে চলে গেল শিপ্রা।

দেয়া একরকম রাজাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে,— একটা কথা বলব, প্লিজ কিছু মনে করবি না ?

—কী ?

—তুই প্লিজ আমাদের বাড়ি এখন আসিস না। আমি তোর সঙ্গে বাইরে কথা বলব।

রাজা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল,— কেন ?

—জানতে চাস না। প্লিজ।

—জানতে তো চাইবই। মাসি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলল কেন রে ? আমি কি মাসিকে কোনও ভাবে অপমান করেছি ?

www.boiRboi.blogspot.com

—তা না। দেয়া থুতু গিলছে, —তুই যে সেদিন এসে বললি মেসোমশাইকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার পর দিন থেকে মা তোর ওপর ভীষণ খেপে আছে।

রাজার অভিমান হল,— আমি কি মিথ্যে বলেছিলাম ! সত্যিই তো আমার বাবা দুদিন ফেরেনি ! আমি জানব কি করে বাবা সেদিনই অফিসের কাজ সেরে ফিরে আসবে !

—সেখানেই তো গণ্ডগোল। সুভাষজেঠু এসেছিল। পরদিনই। মাকে বাপিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিসব বলল। তোর বাবাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল। আমি শুনেছি।

—কী কথা ?

—সব কথা কী শুনতে পেয়েছি নাকি ? ঘরের সামনে ঘুরঘুর করছিলাম বলে মা কী বকা লাগাল আমাকে। দেয়া আঙুলে চুল পাকাল, —যত দূর মনে হয়, তোর বাবা অফিসের কাজে যাননি।

—যাহ্। হতেই পারে না।

—হ্যাঁ রে। বিলিভ মি। কিসব পার্ক স্ট্রিট থানা, হাইকোর্ট, বেল এ-সব নিয়ে বলাবলি করছিল। একটু থেমে দেয়া নিম্ন স্বরে বলল,— তোর বাবা কি কোনও অফিসের ঝামেলায় অ্যারেস্ট ফ্যারেস্ট হয়েছিলেন ?

হাঁটুর জোর কমে যাচ্ছিল রাজার। তার বাবা, অত সুন্দর একজন স্বাস্থ্যবান স্নেহশীল মানুষ, এত ভালবাসে রাজাকে, সে কেন গ্রেপ্তার হতে যাবে ! হ্যাঁ, রাজা অবশ্য জানে বাবা সাংঘাতিক বড় কিছু চাকরি করে না, গভর্নমেন্টের মাঝারি মাপের অফিসার, সে তুলনায় বাবার হাতে অনেক বেশি টাকা। মা দামি দামি শাড়ি কিনছে, বাড়ি ভর্তি শৌখিন জিনিস, রাজা একবার মুখ ফুটে বলতেই ভি সি আর চলে এল, টেপডেকও। রাজার এইটিন্থ বার্থডেতে মোটরসাইকেল কিনে দেবে বলেছে, তারও দাম কম নয়। বাইরে বেড়াতে গেলে হোটেলে কী জলের মতো পয়সা খরচ করে বাবা। এ সি রুম। ভাল ভাল খাওয়াদাওয়া। সাধ্যের অতিরিক্ত করে বাবা আরাম কিনে দিচ্ছে রাজাদের। হ্যাঁ বাবা মাঝে মাঝে মদ খায়, রেসের মাঠে যায়। যায় ! রাজাদের লুকিয়ে তো কিছু করে না। এর জন্য হয়তো কিছু উপরি টাকাও... ! রাজা চিন্তাটাকে ধমকে থামাল,—অসম্ভব। আমার বাবা অফিসের কাজে গিয়েছিল।

—জানি না বাবা। দেয়া ঠোঁট ওলটালো,— সুভাষজেঠু বাবা মাকে সব বলেছে। ডিটেলে।

রাজার চড়াং করে রক্ত উঠে গেল মাথায়,— আমার বাবার নামে উল্টোপাল্টা বলছিস কেন রে ?

—আমি কেন বলব ! সুভাষজেঠু বলেছে। সুভাষজেঠু সব খবর রাখে।

—তোর সুভাষজেঠু কি ভগবান নাকি ? পুলিশের লোকেরা কী আমার জানা আছে। ঝাড়েবংশে মিথ্যেবাদী।

—এই, মুখ সামলে সৌভিক। সুভাষজেঠু মোটেই অন্য পুলিশদের মতো নয়। ভীষণ অনেস্ট।

—ছাড় ছাড়। কত সাধুসন্ত সব জানা আছে।

দেয়াও ভদ্রতা হারাল,— সুভাষজেঠু মিছিমিছি তোর বাবার নামে বলতে যাবে কেন? নিশ্চয়ই তোর বাবা এমন কিছু কেচ্ছা করেছেন .... মা তো কাল পাঞ্চালীর মাকেও বলছিল।

— কী বলছিল সাফ্ সাফ্ বল্। প্যাঁচ মারিস না।

—তোকে এত কৈফিয়ত দিতে যাব কেন রে? তুই শুনে রাখ্ তোর বাবা এমন কিছু খারাপ কাজ করেছিলেন, যেটা বাবা মা আমাদের কাছে বলতে পারছে না। তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করছে। বিশ্বাস না হয়, পাঞ্চালীকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস্।

রাজা অপমানে মাটিতে মিশে গেল। ঘাস বালি পাথর হয়ে গেল যেন। পরমুহূর্তেই অন্ধ ক্রোধে দু হাতে খামচে ধরেছে দেয়ার কাঁধ। এত জোরে যে কঁকিয়ে উঠেছে দেয়া,— ছাড় আমাকে। ছাড় বলছি।

শিপ্রা মেয়ের আর্তনাদ শুনে ছুটে এসেছে বাইরে। এক হ্যাঁচকায় ছাড়িয়ে নিয়েছে দেয়াকে। লাল চোখে তাকিয়ে রইল রাজার দিকে, তারপর নিষ্ঠুর মুখে হাসল,— বাহ্ চমৎকার! যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। মেয়ে দেখলে দুজনেরই কোনও জ্ঞান থাকে না, না? রক্তের ধারা যাবে কোথায়?

রাজা তখনও ফুঁসছে।

শিপ্রা রাজাকে ধাক্কা দিল,— বেরিয়ে যাও। তুমি আর কক্ষনো এ বাড়িতে পা দেবে না।

শূন্য মস্তিষ্কে বুনো ষাঁড়ের মতো ফিরছে রাজা। লোকের সঙ্গে রাস্তায় ধাক্কা লাগছে, ভ্রূক্ষেপ নেই, এলোপাথাড়ি হাত ছুড়ে সরিয়ে দিচ্ছে পথচারীদের। নিজেই জানে না চোখের কোলে বাষ্প জমেছে কখন। কখনই বা নাগরিক সন্ধ্যা ঢেকে গেছে গাঢ় কুয়াশায়।

অনুরাধা ছেলেকে বকতে গিয়ে চমকে উঠল, —হাঁপাচ্ছিস কেন রে! মুখ চোখ এরকম লাগছে কেন! রাস্তায় কারও সঙ্গে মারপিট করেছিস নাকি!

রাজা মা-র দিকে তাকাল না।

—ছিলি কোথায় এতক্ষণ? তোর ছোটমামা কতক্ষণ এসে বসে রইল, দেখা হল না তোর সঙ্গে?

রাজার প্রতিক্রিয়া নেই।

—ওষুধ এনেছিস আমার?

রাজা পকেট থেকে শিশি আর টাকা বার করে খাবার টেবিলে রাখল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে অনুরাধার মুখের ওপর।

www.boiRboi.blogspot.com

রাত গভীর। রাজার কক্ষে আঁধার নেমেছে। নির্জন রাত্রিতে জেগে আছে শুধু দুটি চোখ। শুকনো। জ্বলছে। শিপ্রার কথাগুলো এখনও তপ্ত শলাকার মত বিঁধছে রাজাকে। রক্তের ধারা! রক্তের ধারা!

রাজার ভেতরে একটা গর্জন জমাট বাঁধছিল।

চুলোয় যাক বাবা মা। ধ্বংস হয়ে যাক বাড়িঘরদোর। আজ রাত্রেই অ্যাটমবোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক পৃথিবী।

নয়

প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশে পার্টি নেতাদের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ নিয়ে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ বেরিয়েছে কাগজে। যাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রযন্ত্রের সামান্যতম সংশয় ছিল, কি ভাবে তাদের জেলে পচতে হয়েছে তারই আনুপূর্বিক বিবরণ। কোথাও কোথাও কিছুটা অতিরঞ্জিত, বিকৃত। তবু সত্যটুকু চিনে নেওয়া যায় সহজেই। এখনকার হতদরিদ্র অবস্থার কারণগুলোও ফুটে উঠেছে লেখায়।

সাত্যকি মন দিয়ে খানিকটা পড়ে কাগজ বালিশের পাশে মুড়ে রাখল। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে বিদিশাদের বাড়ির থেকে ফেরার সময়ই মাথা বেশ দপদপ করছিল, ভেতরে ভেতরে কেমন একটা চোরা কাঁপুনির ভাব। ঘুমেও থেকে থেকে জানান দিয়েছে যন্ত্রণাটা। এখন মনে হচ্ছে ভালই জ্বর এসেছে। মুখ হাকুচ তেতো। বিস্বাদ। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

নতুন করে সাত্যকি সুজনিতে আপাদমস্তক ঢেকে নিল। মার্চের শুরুতেও শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছে। গরম এক কাপ চা দরকার।

লাজু অনেকক্ষণ উঠে গেছে, রোজ যেমন যায়। ভোর ভোর উঠে স্নান সেরে ফেলে লাজু। শীত গ্রীষ্ম বারোমাস। তারপর সোজা চলে যায় রান্নাঘরে। সাত্যকির সঙ্গে সকালে তার কথাবার্তা প্রায় হয়ই না। হুঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইরকম গোটা তিন চার শব্দ, ব্যাস্। সাত্যকিরও অবশ্য সকালে লাজুর দিকে তাকানোর সময় নেই। রাতে সে দেরি করে শোয়, ওঠেও একটু বেলা করে। উঠেই টগবগ টগবগ। এই বেরিয়ে গেল, এই বসছে, এই ছুটল মোড়ে। অবিরাম ব্যস্ততা। একের পর এক লোক দেখা করতে আসছে। পাড়ার ছেলেরা। ক্লাবের ছেলেরা। নাগরিক কমিটির লোকজন। জমির দালাল। আগে ফ্ল্যাটের খরিদ্দাররাও ভিড় জমাত, লেক মার্কেটে অফিস খোলার পর বাড়িতে তাদের উৎপাত কম এখন। এর সঙ্গে পার্টির লোকজন তো আছেই। তাদের সময় অসময় নেই। তারা ভোরেও আসতে পারে। রাতদুপুরেও।

আজ যদি সব কাজ থেকে ছুটি পাওয়া যেত!

আজ যদি লাজু সারাদিন বসে থাকত মাথার কাছে!

সাত্যকি শুয়ে শুয়েই টের পাচ্ছিল পঙ্কজ ঘরে ঢুকেছে। খুটখাট করছে কীসব। কলিংবেলের শব্দে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আবার ঢুকেছে, মামা, কাজলমামারা এসেছে।

সাত্যকির জিভ আরও তেতো হয়ে গেল। কাজলের আসার কথা ছিল বটে। পার্টির কয়েকটা ছেলেকে নিয়ে। কাজলের বাবা এবার মিউনিসিপাল ইলেক্‌শানে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়ানোর মূলে সাত্যকির অবদান কম নয়। লোকাল অফিসে অনেক দড়ি টানাটানির খেলা খেলতে হয়েছে সাত্যকিকে। চেষ্টা করলে নিজেও নমিনেশান পেতে পারত, কিন্তু কেমন একটা ভয় ঢুকে গেছে তার। ভয়টা যে কিসের, কিছুতেই বুঝতে পারে না সাত্যকি। কেবলই মনে হয় কোন এক অজানা আক্রমণে তছনছ হয়ে যাবে সাত্যকির জীবন। তবে কাজলের বাবার জন্য যতটা লড়েছে সাত্যকি, নিজের জন্য হলেও অতটা লড়ত না। তার অবশ্য আরেকটা কারণও আছে। সে এখন টাকার গন্ধ পেয়েছে।

সুজনি থেকে মাথা বার না করেই সাত্যকি বলল, বাইরের ঘরে বসা। আমি আসছি।

বার কয়েক মাথা তুলেও সাত্যকি শুয়ে রইল। ভার ভার গলায় পঙ্কজকে ডাকল, —আমাকে ঘরে এক কাপ চা দিয়ে যা তো আগে।

সাত্যকি খুব আশা করেছিল চা নিয়ে লাজু আসুক ঘরে, পঙ্কজ নয়। বিয়ের পর পর লাজুই চা এনে তার ঘুম ভাঙাত, কী পড়ে পড়ে বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছ! ওঠো, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে যে।

তখনও সাত্যকি করপোরেশান স্কুলের মাস্টার। বেশির ভাগই গরিব ছাত্র। একেবারেই নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। বস্তি থেকেও পড়তে আসত কেউ কেউ। অনেকেই অপুষ্টিতে ভোগে, পড়াশুনা করতে চায় না, স্কুল ফাঁকি দেয়, তবু তার মধ্যেই দু চারজনের চোখে কী বুদ্ধির ঝলক! সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিলে আচ্ছা আচ্ছা নামী দামি স্কুলের রেজাল্টকে টেক্কা দিতে পারে। সাত্যকি তাদের জন্য আলাদা সময় দিত। সন্ধেবেলায়। লাজুও আদাজল খেয়ে লেগে পড়ত ছেলেমেয়েগুলোর পিছনে। নিজের টিউশ্যনির টাকা থেকে তাদের নতুন নতুন বই কিনে দিচ্ছে, রুটি সুজি ঘুগনি জলখাবার বানাচ্ছে তাদের জন্য। সাত্যকির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাত্যকির থেকেও লাজুর ভাবনা বেশি।

সাত্যকি মজা করে বলত, আজ থাক্। আজ একটা সি এল্ নিই।

—কেন?

—বারে, নতুন বিয়ে হয়েছে, সামনে এমন টসটসে মিষ্টি বউ, একদিন বুঝি পাওনা ছুটি নিতে নেই?

লাজু দুহাতে তার চুলের মুঠি ধরে টানত, ওঠো বলছি শিগগির। ওঠো। আল্‌সের ডিম কোথাকার।

সাত্যকি হেঁচকা টানে লাজুকে কাছে টেনে নিত, তুমি দায়ী। তোমার জন্যই

www.boiRboi.blogspot.com

আমি অলস হয়ে গেলাম। নইলে এ শর্মাকে কোনওদিন শুয়ে বসে থাকতে দেখেছ?

—হয়েছে। আর নিজের বড়াই করতে হবে না। না উঠলে এবার গায়ে জল ঢেলে দেব। বলতে বলতে লাজু নিজেও ডুবে যেত সাত্যকির শরীরে, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিত সাত্যকিকে।

কত দিন যে লাজু আর কাছে আসে না!

কবে থেকে আসা বন্ধ করল লাজু! স্কুলের চাকরি ছেড়ে সাত্যকি ব্যবসা ধরার পর! উঁহু, তার পরও তো একটা সম্পর্ক ছিল দুজনের! দুদিক থেকে টান পড়ছে রবারে, মোটা ব্যাস বিপরীতমুখী টানে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে ছিটকে যাবে কোথায়, তবু তো ছিল! কবে থেকে যে এমন নিষ্ঠুর হল লাজু। গর্ভ যেদিন নষ্ট হল, সেদিন থেকেই কি? তার ঈর্ষার সন্ধান পেয়ে কি তাকে চাবুক মারছে লাজু? নাকি এটা লাজুরই এক ধরনের আত্মনিপীড়ন?

লাজু এল না, পঙ্কজই চা এনেছে। গরম চা খেয়ে একটু চাঙ্গা হল শরীর। নিজেকে আলোয়ানে মুড়ে প্যাসেজ দিয়ে যাওয়ার সময় সাত্যকি লাজুকে খুঁজল একবার। দেখতে পেল না। গলা উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই পঙ্কজ, বাইরে চা দিয়েছিস্ তো?

কাজলরা সাত্যকিকে দেখে অবাক।

কাজল বলল, —তোর জ্বর হয়েছে নাকি?

লম্বা বেতের সোফায় সমীর পার্থ। কাজলের পাশে জাপান। বাপি আলাদা। মোড়ায়। বাপি ছেলেটার সম্প্রতি খুব রমরমা। এলাকার সকলে সমঝে চলে ছেলেটাকে।

সাত্যকি সবাইকেই এক ঝলক দেখে নিল, শরীরটা বড় বেয়াদপি করছে।

কাজল বলল, সাবধানে থাকিস্। সিজন চেঞ্জের সময়, এখন খুব পক্সফক্স হচ্ছে। ইলেকশানের আগে বিছানা নিস্ না।

বেলা আটটাতেই সূর্য বেশ উষ্ণ, তবু শীত ভাব যাচ্ছিল না সাত্যকির।

জাপান প্রশ্ন করল, আমরা তা হলে কাল কোথ্‌থেকে কাজ শুরু করব?

পার্টি অফিসেই এ-সব স্থির হওয়ার কথা, তবে সাত্যকি বাড়িতেই প্ল্যান প্রোগ্রাম ছকে রাখে কিছুটা, বলল, আমার মনে হয় তিন নম্বর বস্তি থেকে শুরু করা উচিত। ওখানেই আমাদের মার্জিনটা বাড়াতে হবে।

পার্থ বলল, ও বস্তিটা তো আমাদেরই ছিল, কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। গত বছর চারটে টিউবওয়েল বসানো হল, তিনটে খারাপ। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, রাস্তা চওড়া করার নোটিস হয়েছে, ম্যাপে বস্তিটাও আছে।

সাত্যকি হাসল, সে রাস্তা চওড়া করার কাজ নয় পিছিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু পার্টি অফিসে বসে দিনরাত করিস কি তোরা? শতদলবাবুকে দিয়ে টিউবওয়েল ঠিক করাতে পারছিস্ না?

—ঠিক করিয়ে দিয়েছি। তাও লোকগুলোর রাগ পড়েনি এখনও। তুমি চলো না একদিন সাত্যকিদা, ওই বস্তিতে এখনও তোমার ভাল হোল্ড আছে।

—দূর, আমি কি আর এ-সবের মধ্যে সেভাবে থাকি আজকাল? বিনয়ের ভান করলেও সাত্যকি যথারীতি কৌতূহলী,আমার হোল্ড আছে কী করে বুঝলি?

—তোমার কিছু পুরনো ছাত্র আছে না ওখানে? ওরাই তো এখন বস্তির হেক্কড়। তুমি বললে কাজ হবে।

সাত্যকি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে কত ভাবে দেখা হয়েছে পুঁজিকে! এক সময়ের নিষ্ঠাও যে অন্য সময়ের পুঁজি হয়ে যায়, এ কথা কি জানত দাড়িঅলা সাহেবটা! একবার সাত্যকি ভাবল ঘুরে আসবে বস্তিটা, তবু মনে কোথাও একটা কাঁটা খিচখিচ করছে। সাত্যকি ভাল করে গায়ে আলোয়ান টেনে নিল, —দেখি, যদি পারি তো যাব।

সাত্যকি জাপানের দিকে ফিরল, রবার কারখানার দেওয়ালটা ওরকম হাফ আঁকা অবস্থায় ফেলে রেখেছিস কেন রে? ওয়ালিংগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল।

জাপান বলল, ছেলেটা আজ সকালেই কাজে লেগে যাবে। কালকের মধ্যে ফিনিশ করে দেব।

পার্থ বলল, সাত্যকিদা, লিফলেটগুলো নিয়ে খুব প্রবলেম হচ্ছে। সুধীরদা ভীষণ ভ্যানতারা করছে। আমাদের আগে একটা বুলেটিন বেরিয়েছিল, তার পয়সা পায়নি... বলছে মেয়ের বিয়ে গেল, প্রচুর খরচা হয়েছে... বিলটা না দিলে...

বাপি মোলায়েম স্বরে বলল, সুধীরদার সঙ্গে কথা বলতে হবে? আমি আজই বলছি।

সাত্যকি হাত তুলল, না। তুই সুধীরদার সঙ্গে কথা বলবি না। যা বলার আমি বলব। সবার সঙ্গে এক টেকনিক চলে না।

কাজল বলল, অত কথা বলাবলির দরকার কী? পেন্ডিং বিল সব নিয়ে আসিস, আমি পেমেন্ট করে দেব। বাবা বলে দিয়েছে এ সময়ে কোন ভাবেই পার্টির ভাবমূর্তি যেন নষ্ট না হয়।

ভাবমূর্তি সমাস ভাঙলে কী হয়? ভাবের মূর্তি? ভাব রূপ মূর্তি? যেমন ভাব, তেমন মূর্তি? ভাব দেখানো মূর্তি?

সাত্যকি কাজলকে বলল, মেসোমশাইয়ের প্রেশার রেগুলার চেক করাচ্ছিস তো? বেশি দুশ্চিন্তা করতে বারণ করিস।

—সে নয় করলাম। ওদিকে শতদলবাবু যে তলায় তলায় করাত চালাচ্ছে, তার কী হবে? ওর ছেলেগুলো তো সব বসে গেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, তবু পোস্টারে হাত লাগাচ্ছে না।

এতাবৎকাল শতদল বসুই পার্টির নমিনেশন পেয়ে জিতে আসছিল

www.boiRboi.blogspot.com

এখানে। এবার পার্টি বয়সের অজুহাতে তাকে বসিয়ে দিয়েছে। সাত্যকিদের পার্টিতে এ-সব নিয়ে বিরোধের প্রচলন ছিল না এতদিন। সিংহাসন অনেক রীতিকেই বদলে দেয়।

কাজল বলল, শতদলবাবুর যত খার এখন আমার ওপর। দেখলি না খাটালের জমিটায় ইনজাংশন করিয়ে দিল!

—ও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঝাঁকাতে গিয়ে সাত্যকির মাথা জোর চক্কর দিয়ে উঠেছে। দু আঙুলে কপাল টিপে চুপ করে থাকল কয়েক সেকেন্ড। মহাবীরতলার ঝামেলাটা আগে ফয়সালা হওয়া দরকার। সেই লোকটা আবার এসেছিল অফিসে। একবারে সব টাকা না পেলে প্রেসকে খবর দেবে বলে শাসাচ্ছে। প্রেসকে সাত্যকি ভয় পায় না, তবে এই মুহূর্তে গুডউইলে হাত না পড়াই ভাল।

সাত্যকি অন্যের কান বাঁচিয়ে কাজলকে বলল, —একবার করপোরেশানে যাস্ তো। বীরেন রায়ের সঙ্গে একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে আসিস।

কাজল গাঁক গাঁক করে চেঁচাল, ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ওই লোকটা পুকুর বোজানোর ব্যাপারে হেভি অ্যাডামেন্ট। কীসব প্রকৃতিপ্রেমিক ক্লাব হয়েছে, লোকটা তার বড় পাণ্ডা।

সমীর বলল, লোকটা শুনেছি খুব অনেস্ট। টেটিয়া।

জাপান মুখ বেঁকাল, কত টাকার অনেস্ট? দু হাজারের? না দুলাখের?

কাজল হো হো হেসে উঠেছে, সামনে ইলেকশান বলে চুপ মেরে থাকতে হচ্ছে, নইলে কবে সাত্যকি ফিট করে ফেলত।

ব্যবসা নিয়ে সকলের সামনে আলোচনা সাত্যকির পছন্দ নয়। কাজলটার এখনও জ্ঞানগম্যি হল না। বয়স তো কম হয়নি, সাত্যকিরই বয়সী, যদিও ফেল মেরে মেরে বছর তিনেকের জুনিয়ার ছিল স্কুলে। আরে বোকা, যতই এদের সঙ্গে রাজনীতি কর, মনে রাখিস্ এটা তোর খোলস। শীতে ছেড়ে রেখে গর্তে ঢুকে যাবি, গরম পড়লে নতুন খোলস এসে যাবে গায়ে।

কাজলরা উঠে যাচ্ছিল, বাপিকে আলাদা করে ডাকল সাত্যকি, নিচু গলায় বলল, ওরা যেদিন বনধ্ ডেকেছিল, সেদিন তুই দোকান খোলা রাখার জন্য ফোর্স করেছিলি?

—কেন? কী হয়েছে তাতে?

—কাজটা ভাল করিসনি। ব্যবসায়ী সমিতি ঘোঁট পাকাচ্ছে।

—ওটা ব্যবসায়ীদের স্বভাব। দরকার হলে চুমু খাবে, খোঁচা খেলে লাঠি তুলবে। দেব নাকি কড়কে? অমরদা বলেছে এ-সব অবাধ্যতা শুরুতেই নির্মূল করে দিতে।

সাত্যকি জোর করে প্রতিবাদ করতে পারল না। গণতন্ত্রের ছাতা মেলে রাখতে হলে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাই বুদ্ধিমানের ধর্ম। ক্ষমতার মুঠি একটু আলগা হলে কী হয়ে যায় কে বলতে পারে।

সাত্যকি দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই লাজুর সঙ্গে চোখাচোখি। লাজু বাইরের ঘরে এসে বসেছে। বলল, তোমাদের সঙ্গে জার্মান নাজীদের এখন তফাত কোথায় বলতে পারো ?

সাত্যকি গোমড়া মুখে সিগারেট ধরাল, তুমি কি আজ সকাল থেকেই টিজ্ শুরু করবে ?

—টিজ কেন ? জানতে চাইছি।

—অনেক তফাত। আমাদের আদর্শ আলাদা। লক্ষ্য আলাদা।

—তাই ? লাজু ফিক করে হাসল, বেশ। একদিন নয় তোমার আদর্শ লক্ষ্যদের একটু ছুটি দাও। তোমার মুখচোখ ভাল লাগছে না। আজ বেরিয়ো না।

সাত্যকিরও তাই ইচ্ছে। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। শুয়ে শুয়েই হুকুম করল, পঙ্কজ, আমাকে আরেক কাপ গরম চা খাওয়া তো দেখি।

জানলার ঠিক বাইরে শিমুল গাছে পাতা নেই একটাও। তবু ফুলে ফুলে ভরে আছে গাছ। লাল ফুল। রক্তলাল।

না চিনে, শুধু নাম জেনেই কি অজস্র রঙ দেখার অনুভূতি জাগে মনে ! রক্তলাল রঙটাকে তো শুধু শব্দেই চেনে সাত্যকি। তার মতো রঙকানার কাছে লাল নীল হলুদ সবুজে তারতম্যই বা কোথায় ! হায়রে !

বাঙালোর থেকে ইন্দুভূষণের চিঠি এসেছে। ওখানে তাঁর ভালই কাটছে। আশপাশের কোয়ার্টার থেকে বাঙালি অবাঙালি সঙ্গীও জুটিয়ে ফেলেছেন, কলকাতার মত সেখানেও জোর তাসের আড্ডা বসছে। চিঠিতে নিজের আর নিজের ছোট ছেলের কথাই বেশি। লাজুর সম্পর্কেও খোঁজখবর নিয়েছেন বার বার। এ বাড়ির ফুলগাছদের খবরও। একেবারে শেষে সাত্যকির উদ্দেশে দুটো মাত্র শব্দ। ভাল থেকো।

সাত্যকি চিঠি শেষ করে লাজুর দিকে তাকাল। ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে লাজু সাজছে। তার চুল এখনও বেশ লম্বা, অনেকক্ষণ ধরে জট ছাড়াতে হয়। সামনের চুল উল্টে বিনুনি বাঁধল। ঘন ভুরুর মাঝে ছোট্ট টিপ। চোখে কাজলের আলতো রূপটান। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লাজু ভরা বর্ষার দিঘি হয়ে গেল।

জ্বর মাথাব্যথার ট্যাবলেট খেয়ে সাত্যকির শরীর এখন কিছুটা ঝরঝরে, স্নায়ু জুড়ে ঝিমঝিম আরাম ভাব। লাজু আজ অনেকদিন পর নিজের হাতে গরম গরম রুটি তৈরি করে খাইয়েছে সাত্যকিকে। সামনে বসে। সাত্যকির মেজাজও তাই তুলোর মত হাল্কা।

লাজুর সঙ্গে কথা বলার জন্যই কথা শুরু করল সাত্যকি, কোথায় বেরোচ্ছ ?

—ন্যাশনাল লাইব্রেরি।

—কখন ফিরবে ?

www.boiRboi.blogspot.com

—দেখি।

—তাড়াতাড়ি ফিরো।

—কেন ?

এ প্রশ্ন করার কোনও মানে হয় ? যে কোন অসুস্থ মানুষেরই তো ইচ্ছে করে তার পাশে প্রিয়জন বসে থাকুক। লাজু না হয় আজকের দিনটা নাই বেরোল !

লাজু বিছানার ধারে এসে সাত্যকির কপাল ছুঁল, জ্বর তো নেই।

সাত্যকি মনে মনে বলল, আসতে পারে তো।

—শরীর বেশি খারাপ লাগলে সন্ধেবেলা গোস্বামী ডাক্তারকে দেখিয়ে এসো।

লাজু ফিরে গেছে। আলমারি খুলে শাড়ি বার করল। সাদা। আজকাল রঙিন শাড়ি পরা লাজু ছেড়েই দিয়েছে। তিরিশে পৌঁছবার আগেই যোগিনী যেন। লাজু কি সাত্যকির রঙ না চেনার গোপন দুর্বলতা জেনে গেছে !

ব্লাউজ হাতে পাশের ঘরে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল লাজু, ছোটকু কাল একটা মজার ব্যবসার কথা বলছিল। আমাকে পার্টনার করতে চাইছে।

ছোটকুকে সাত্যকিরও বেশ পছন্দ। হাসিখুশি দিলখোলা ছেলে, মনে মারপ্যাঁচ নেই। একটু বেশি বকবক করে এই যা।

সাত্যকি প্রসন্ন মনে বলল, কাল সেই জন্যই এসেছিল বুঝি ? কী বলে পাগলা ?

—ওর স্কিম খুব প্লেন আর সিম্পল। পাইকারি হারে প্রচুর মাদুলি কিনে ভেতরে শুকনো ঘাসপাতা শিকড়বাকড় পুরে দেবে।

—মাদুলি বিক্রির ব্যবসা পুরনো হয়ে গেছে।

—বিক্রি করবে কেন ? ট্রেনে বাসে ঘুরে ঘুরে বিনে পয়সায় বিলি করবে। সঙ্গে একটা করে হ্যান্ডবিল। মনস্কামনা পূর্ণ হলে অমুক ঠিকানায় সিদ্ধাই মাকে পুজো পাঠান। দশ টাকা, বিশ টাকা, যা আপনার সাধ্য।

—কচু পাঠাবে। লোক এখন আর অত বোকা নেই।

—তোমরা লোকজনকে চালাক করে দিয়েছ বুঝি ? লাজু চপল হাসিতে ভেঙে পড়ল, লোকজন বোকাই আছে, বোকাই থাকতে চায়। ধরো, প্রতি একশ জনের মধ্যে পাঁচ জনের তো মনস্কামনা পূর্ণ হবেই। এমনিই হবে। তারা ভয় ভক্তিতে টাকা পাঠাবে। দশ জন হলেও হতে পারে এই আশাতে টাকা পাঠাবে। মানুষ তো আর জানে না মানুষ ঠিক কী চায়। মনস্কামনা পূর্ণ করার ব্যবসাটাই এখন সব থেকে বেশি প্রফিটেবল, তাই না ?

সাত্যকি চকিতে গম্ভীর, সিদ্ধাই মা-টি কে হবে ? তুমি ?

—হয়ে গেলে মন্দ হয় না, কী বলো ? লাজু হাসতে হাসতেই বলল, তোমাকেও ছোটকু একটা নাম দিয়েছে। ডাইনোসর। তুমি দিন দিন যেভাবে প্রকাণ্ড হচ্ছ, এ ছাড়া নাকি অন্য কোনও নামে তোমায় ডাকাই যায় না ! আমি অবশ্য বলতে পারতাম আজকাল ডাইনোসরদের যত বড় করে দেখানো হয়,

অত বড় তারা নয়, সব বিজ্ঞানের ট্রিক্। ভোজবাজি। ছোট্ট জিনিসকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভয়ভক্তি জাগানোর চেষ্টা।

—বললেই পারতে। কী আর বাকি রাখো। তা ওই ছোটকুর ভরসাতেই কি বিদিশার চাকরিটা নিলে না ?

বাতাস গরম হয়ে উঠছে। তপ্ত হাওয়ার ঝলক ঘরে ঝাঁপিয়ে এল। সাত্যকি আর লাজুকে ছুঁয়ে থমকে দাঁড়াল এক পাশে।

লাজুর হাসি মুছে গেল, কেন চাকরিটা নেব না তা তো তুমি জানোই।

—না, জানি না। সাত্যকির স্বর তেতো আরও, —তোমার বন্ধুর অফিসের চাকরি কেন এত অচ্ছুত আমি কী করে বলব ?

লাজু উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ব্লাউজ বদলে ফিরেছে ঘরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুঁচি ঠিক করছে।

সাত্যকির মাথার যন্ত্রণাটা ফিরে আসছিল। গলা ওঠাতে গিয়েও সামলে নিল, আজকাল কি তুমি আমার কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করো না ?

—কী উত্তর দেব ? তোমার দেওয়া চাকরি আমি নেব না, একথা কি এখনও স্পষ্ট করে বলা দরকার ?

—আমার দেওয়া কেন হবে ? তোমারই বন্ধু অফার দিয়েছে।

—তার বিনিময়ে তুমি ওকে ফ্ল্যাটের সাইজ বাড়িয়ে দেওয়ার টোপ দিয়েছ।

—এর সঙ্গে চাকরির কী সম্পর্ক ?

—সম্পর্ক আছে। লাজুর স্বর অসম্ভব শান্ত। প্রতিটি কথা সে বলছে কেটে কেটে, পরিষ্কার উচ্চারণ করে, বিদিশার ওখানে চাকরি করলে তোমার নজরদারির সুবিধে হয়, তাই না ?

সাত্যকি ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল। লাজুর কাছে কি কিছুই অজানা থাকে না ? থতমত মুখে বলল, আমার কোনও কাজই কি তুমি ভাল মনে নিতে পারো না ?

—ভাল মনে নেওয়ার মতো একটা কাজও কি তুমি করো ? লাজুর গলা বরফের ছুরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো কেন ? তোমার কি ধারণা রুদ্রদা ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ?

ধরা পড়ে গিয়ে সাত্যকি একেবারে ক্ষুদ্র হয়ে গেল যেন, তবু দমল না, তুমি কি বলতে চাও, তুমি রুদ্রর সঙ্গে যোগাযোগ করোনি ?

লাজুর মুখমণ্ডল রক্তিম। উত্তেজনায় ওঠানামা করছে নিশ্বাস, —তোমাকে কেন বলব ?

—সে তো বটেই। বললে তো মিথ্যে কথা বলতে হবে।

—আমি মিথ্যে কথা বলি না। মিথ্যে বলো তুমি। দিনরাত মিথ্যের ব্যবসা করে চলেছ। আদর্শের ভাঁওতা দিয়ে আমাকে বিয়ে করেছিলে, আদর্শের দড়ি ধরে নিজের আখের গোছাচ্ছ...

www.boiRboi.blogspot.com

—ব্যাস ব্যাস থামো। লেকচার মেরো না। মিথ্যের মুখোশ তুমিই পরে আছ। প্রথম দিন থেকে। একজন পুরুষের সঙ্গে শুয়ে অন্য পুরুষের চিন্তায় বিভোর থাকো, লজ্জা করে না তোমার ? আমি যদি মিথ্যেবাদী হই, তুমি কি জানো ? দ্বিচারিণী। স্বৈরিণী।

—বাহ্ চমৎকার। বিদ্রুপে লাজুর মুখ বিকৃত হল, তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের হাতিয়ারগুলো বেশ ভাল ভাবেই শানাতে শিখে গেছ। অত্যন্ত নীচ তুমি। ছোটলোক। তোমার প্রতিটি অন্যায়, অপকীর্তি চোখের সামনে সহ্য করেও আমি তোমার সঙ্গে এতদিন থেকেছি। আশা ছিল তুমি হয়তো ফিরবে কোনদিন। না। তুমি সে লোক নও। তোমাতে আর রুদ্রদাকে স্বর্গ নরকের তফাত। তুমি বেসিকালি একটা নোংরা লোক। ঠগ। জোচ্চোর। আমার বাবা তোমাকে প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলেন।

লাজুর গালাগাল নয়, রুদ্রর নামটাই দাবানল জাগিয়ে দিল সাত্যকির বুকে। বিছানা ছেড়ে তীর বেগে ছুটে গেছে লাজুর দিকে। হিংস্র হানায় লাজুর শুভ্র আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লাজু কখনও যা করে না, তাই করল আজ। তার শরীরের ভোক্তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে। সাত্যকি টলতে টলতে আবার এগিয়ে এল। লাজুর দুহাত মুচড়ে ধরে কামড় বসাল লাজুর ঠোঁটে। এত দিনের অতৃপ্ত কামনা আগুনের হল্‌কা হয়ে বেরিয়ে আসছে রোমকূপ দিয়ে। লুকোনো নখ দাঁত সব বেরিয়ে গেল। উন্মত্ত সাত্যকি লাজুর ঠোঁট ছেড়ে থু থু করে লাজুর মুখে থুতু ছেটাচ্ছে। হিসহিসিয়ে ফণা তুলল, আমি নোংরা, না ? ঠগ ? জোচ্চোর ? তোমার ভদ্রলোক বাবার পুত্রটি কী ? ঘুষখোর। লম্পট। মাতাল। কোথায় কোথায় মেয়েমানুষের ঘরে গিয়ে পড়ে থাকে তার ঠিক নেই। যাও। তোমার পিরীতের দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো একত্রিশে ডিসেম্বর রাতে কোথায় পড়েছিলেন তিনি ! কোন্ মেয়েছেলের ঘরে ফুর্তি লুঠতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল ! যখন পুলিশ হাজতে কুঁই কুঁই করছিল, কে গিয়ে উদ্ধার করেছিল তাকে ! কে তোমার ফ্যামিলির মান বাঁচিয়েছিল !

লাজুর পাংশু মুখ অসহ্য যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেছে। যেন কোটি কোটি সূচ তার দেহে বিঁধিয়ে দিয়েছে সাত্যকি। তার মাথা ক্লেদাক্ত নর্দমায় চেপে ঘষে দিচ্ছে।

তোড়ের মাথায় কথাগুলো বলে সাত্যকিও হাঁপাচ্ছিল, তবু লাজুর শীতলতা আজ সে ভাঙবেই, সবাই দেবচরিত্র, অ্যাঁ ? আমি ছাড়া ? তোমার বাবা ? তোমার দাদা ? তোমার রুদ্রদা ?

লাজু মাটি থেকে আঁচল কুড়িয়ে নিল, আমি এক্ষুনি চলে যাব। তোমার সঙ্গে আর এক মুহূর্তও থাকব না।

—সেতো এখন যাবেই। রুদ্র তো এসে গেছে তোমাকে নিতে। ওর অপেক্ষাতেই তো আমার সঙ্গে ঘর করার নাটক চালিয়েছ এতদিন।

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল পঙ্কজ। লাজু হনহন করে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা গলায় পঙ্কজকে ডাকল, আয়। চলে আয় আমার সঙ্গে।

দশ

সকালে ফোন এসেছিল সাত্যকির। ফোন অনুরাধা ধরেছিল। অনুরাধা নয়, সাত্যকি চন্দনকেই চায়।

চন্দন তখনও বাজারে।

কাঁকুলিয়ায় উঠে আসার পর থেকে বাড়ির কাঁচা বাজার চন্দন নিজের হাতেই করে। সপ্তাহে সে দু দিন বাজারে যায়। বৃহস্পতিবার আর রবিবার। মাছ মাংস শাক সবজি তোলা থাকে ঢাউস ফ্রিজে, পছন্দ অনুযায়ী দিনের দিন বেরোয়। সংসারের টুকিটাকি, মাসকাবারি আনার জন্য রতনের মা আছে, অথবা অনুরাধা নিজেই।

চন্দনের বাজার করা বেশ দর্শনীয় ব্যাপার। সে একসঙ্গে অন্তত তিন রকমের মাছ কেনে। তার মধ্যে একটা অবশ্যই পাকা রুই অথবা কাতলা। রাজার ভাষায় কাটাপোনা। এর সঙ্গে মরসুমি মাছ, শীতকালে চিংড়ি বা কই, গ্রীষ্ম বর্ষায় ইলিশ। মুখ বদলানোর জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিতল ভেটকি পারসে আড় পাবদা। চন্দন বড়ই মৎস্যবিলাসী। বাজারে সে কখনও মাছের দাম জিজ্ঞাসা করে না। দরাদরি নয়, ব্যাগে তুলে দাও। কেটেকুটে। ধুয়ে। সব থেকে ভালটা। টাটকাটা। চন্দনের ধারণা দরদাম করলে মাছের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। রাজা কাটাপোনা আর চিংড়ি ছাড়া অন্য মাছ ছোঁয় না, তাই অনেকটা মাংসও নিতে হয় চন্দনকে। বৃহস্পতিবার মুরগি, রবিবার মাটন। আজ তার মুরগির দিন।

শাকসবজির বাজারে চন্দনের সময় বেশি লাগে না। দু তিন রকমের শাক, সময়ের সবজি। টোম্যাটো গাজর বিন ঢ্যাঁড়শ কপি পটল। চন্দন অনুরাধা বা রাজা কেউই বিশেষ শাকপাতার ভক্ত নয়, তবু প্রতিভার জন্য এ-সব নিতেই হয়। অদ্রিনাথের কোনও গাছপালাতেই অনাসক্তি ছিল না, চন্দনও প্রচুর শাকসব্জি খেয়েছে ছোটবেলায়। এখন সে শুধু প্রোটিন চায়। এ ছাড়া প্রভূত পরিমাণে আলু কেনে সে। রাজা আলু খাওয়ার রাক্ষস।

গোটা চারেক বড় থলিভর্তি বাজার নিয়ে চেনা রিকশাঅলাকে ডাকে চন্দন। রিকশায় বসে হাত পা মেলে দেয়। মৌজ করে বিলিতি সিগারেট ধরায় একটা। আহ্ কী আরাম! সে এখন বাদশা!

তবু চন্দনের আফসোস যেন যায় না। একটা মাত্র পেট তার, শরীরও পুরো আয়ত্তে নেই আজকাল, প্রেশার কোলেস্টেরল সব কিছু মিলিয়ে খাওয়া দাওয়া কমে গেছে বেশ। ঈশ্বর যে কেন চার পাঁচটা পেট, গোটা তিন চার শরীর

www.boiRboi.blogspot.com

দিলেন না তাকে!

বাজার থেকে ফিরতেই অনুরাধা বলল, একবার থলি হাতে বেরোলে আর জ্ঞান থাকে না! কটা বাজে খেয়াল আছে?

—আর বোলো না, পেছনের বাড়ির দীপ্তেন রাহার পাল্লায় পড়েছিলাম। ওর ছেলেটা জি আর ই টোয়েফ্‌ল্ দিয়ে শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে, তারই গপ্‌পো। ছেলে কত স্কোর করেছে, কিরকম স্কলারশিপ পাবে...

—কত টাকা খরচ করে পাঠাচ্ছে, সেটা শোনায়নি?

—হুঁ, বলেছে। আশি হাজার।

অনুরাধার ভুরু জড়ো হল, আমাকে যে ওর বউ বলল দেড় লাখ। এত বাড়িয়ে বলে ভদ্রমহিলা...!

সাত্যকি হা হা করে হাসল, হয়তো বউই ঠিক বলেছে, দীপ্তেনবাবু কমিয়ে বলল। অত বড় কোম্পানির পারচেজ অফিসার, ডাইনে বাঁয়ে পয়সা...! যদি আমাদের চোখ টাটায়!

—দীপু তো যাচ্ছে এম এস সি করে। আমি রাজাকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পর পাঠাব। এম বি এ করতে। অনুরাধা থলিগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গেল, ওহ্‌হো, ভুলে যাচ্ছিলাম। সাত্যকির ফোন এসেছিল।

—কখন?

—কিছুক্ষণ আগে। তোমার সঙ্গে কী দরকারি কথা আছে।

সাত্যকি সাধারণত এ সময়ে ফোন করে না। চন্দন সামান্য অবাক হল, কী ব্যাপারে?

—আমাকে বলল না। তোমাকেই বলবে। গলাটা কেমন উত্তেজিত শোনাচ্ছিল।

এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্য বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল চন্দনের, সেকেন্ডের মধ্যে স্বাভাবিক। ধুস্, ওই কেস তো কবে মিটে গেছে।

ফোনে সাত্যকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে কপাল কুঁচকে গেল চন্দনের। মুখটা কেমন মলিন হয়ে গেল ধীরে ধীরে। টেলিফোন রেখে থম মেরে বসে রইল চেয়ারে। দু হাতে কপালের রগ টিপে ধরল।

অনুরাধা এ সময়ে খুব ব্যস্ত থাকে। এক্ষুনি ঝটপট চন্দনের মাছের ঝাল আর একটা তরকারি রেঁধে ফেলতে হবে। চন্দন ঠিক দশটায় খেতে বসবে। তার আগে হাতের কাছে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম চাই, চা চাই একবার, প্যান্টশার্ট বিছানার ওপর রেডি থাকা চাই। প্রতিভা পুজো সেরে উঠবেন, তাঁকে কিছু জলখাবার দিতে হবে এখন। কদিন ধরে রাজার কী হয়েছে, একদম খাওয়াদাওয়ায় মন নেই, এক কাপ দুধসাদা চা দিলে হয়তো একটু ভাল লাগবে ছেলের। রতনের মা কাজকর্মে বেশ ঢিলে, তার পিছনেও অনবরত ট্যাকট্যাক করতে হয় অনুরাধাকে।

রাজাকে চা দিয়ে চন্দনের সামনে অন্য কাপটা রাখল অনুরাধা, —কদিন ধরে লক্ষ করেছ ছেলেকে ? কিরকম সিরিয়াস হয়ে গেছে ?

চন্দন কপাল থেকে হাত নামাল।

অনুরাধা নিজের খেয়ালেই বলল, বইখাতা ছেড়ে উঠছে না একবারও। বাড়ির বাইরে যাচ্ছে না, টেপ চালাচ্ছে না, টিভি খুললেও সামনে বসছে না। ঘর বন্ধ করে সারাক্ষণ শুধু পড়ছে। আমার সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলার সময় নেই বাবুর ! যেটুকুও বা বলে, তাও কেমন গম্ভীর গম্ভীর। পরীক্ষার মুখে ও যেন ঝপ করে বড় হয়ে গেল !

—তাই বুঝি ? চন্দন অন্যমনস্ক ভাবে একটা নিশ্বাস ছাড়ল, একটা খারাপ খবর আছে। লাজু চলে গেছে।

—লাজু চলে গেছে ! কোথায় ! কবে ! কেন !

—সাত্যকির সঙ্গে পরশু দুপুরে ঝগড়া হয়েছিল, তখনই বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। পঙ্কজকে নিয়ে। কোথায় গেছে সাত্যকি জানে না।

—ও, তাই কায়দা করে জিজ্ঞেস করছিল বাড়ির সব কে কী করছে !

—নাহ্, লাজু যে এখানে আসেনি, সেটা ও জানে। ও খালি আমাকে খবরটা দিয়ে দিল। চন্দনের কপালে ঘাম জমছিল, কিন্তু আমি এখন কী করি বলো তো ? কোথায় খুঁজব লাজুকে ?

এরকম আশঙ্কাই অনুরাধা করছিল এতদিন। অত একগুঁয়ে মেয়েকে কত দিন স্বামী সহ্য করবে ! তাও সাত্যকির মতো ছেলে বলে ছ বছর ধৈর্য ধরে ছিল। যখন সাত্যকির প্রেমে পাগল হয়েছিলি, তখন তো বাপকেও গ্রাহ্য করিসনি ! বাবা সাত্যকিকে পছন্দ করে না, থোড়াই কেয়ার ! মহারানি রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেললেন ! দাদার বোনের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল, তিনিও বিয়ের সাক্ষী হতে ছুটলেন ! বোনের জন্য বাবার অপ্রিয় হওয়া, সেও দাদা ! এখন বিয়ে ভাঙতে বসেছে, দাদা দৌড়োক মিটমাট করতে ! মেয়ের প্রেমেরও বলিহারি ! যখন বরের হাভাতে অবস্থা, চারদিকে শুধু ফাঁপা বুলি কপচে বেড়ায়, পকেট ঢন্‌ঢন্, তখন তো ভালবাসা উথলে পড়েছে। দেখা হলেই অবিরাম সাত্যকির কাহিনী। আজ সাত্যকির নাইটস্কুলের গল্প ! কাল সাত্যকির মিটিং মিছিলের গল্প ! মেদিনীপুরের কোন্ বন্যায় সাত্যকি গিয়ে মানুষের সেবায় নেমেছে, কোথায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছে, সাতকাহন করে শোনাতে গিয়ে ওই চাপা মেয়ের মুখেই খই ফুটছে ! আর যেই ছেলের মতি ফিরল, দুটো পয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছে, ওমনি তাকে কী হতচ্ছেদ্দা !

অনুরাধা কটু গলায় বলল, তুমি আবার কোথায় খুঁজবে ! তোমার বোন সহজে হারাবে না। নিজের ভালমন্দ সে যথেষ্ট বোঝে। খুঁজতে হলে তার বর খুঁজুক। এমন কিছু ছোট্টটিও নেই বোন। আমার ওই বয়সে রাজা স্কুলে পড়ছে।

—এ কী বলছ ? বোন আমার রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে,

www.boiRboi.blogspot.com

আর আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব ? বড় দাদা হয়ে ? মা শুনলেই বা কী ভাববে ?

—মাকে এখনই বলার দরকার কী ?

বাক্যটা বলেই অনুরাধা থমকে গেল। এটা তো ঠিকই, মেয়েটা নির্বিবাদে দাদার ঘাড়ে এসে বসতে পারত, দাদাও কিছুই বলত না আদরের বোনকে, কিন্তু সে এখানে আসেনি ! এও আরেক গোঁয়ার্তুমি। চিরটাকাল দাদা বৌদিকে শুধু হেনস্থা করে যাচ্ছে। দাদা বিলিতি পারফিউম এনে দিল বোনকে, বোন মাখলই না। অনুরাধা নিজের চোখে দেখে এসেছে তাদের দেওয়া দামি দামি শাড়ি কসমেটিক্স্ লাজু অবহেলায় ফেলে রেখেছে আলমারিতে, একটাও খোলেনি ! অথচ এই দাদাবৌদি কী না করেছে তোর জন্য ! তোর সঙ্গে তোর ওই বদরাগী বাবার আবার মিলন করিয়ে দিল কে ! অথচ দাদার গুরুদশার সময়ে তাকে তুই দিব্যি বলে দিলি, দাদা বাইপাসটা করাতে পারলে বাবা হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচত রে। যতই লাজু মিহি সুরে বলুক, অনুরাধা কি বোঝে না কার দিকে আঙুল দেখাচ্ছিল লাজু !

এখনই বা লাজু কতটুকু কথা বলে অনুরাধার সঙ্গে ! বাপের বাড়ি এলে সারাক্ষণ তো মা-র ঘরে বসেই গুজগুজ ফুশফুশ। আর যাওয়ার সময় অনুরাধার সঙ্গে নিয়ম রাখতে বাক্যচয়ন ! মাঝে মাঝে প্রতিদান হিসেবে শস্তা দামের জিনিসপত্র ! ভাইপোকে আলগা আদর !

এক মুখ ভাবনা নিয়ে বসে আছে চন্দন, অনুরাধা ভারী স্বরে বলল, —দ্যাখো, যা ভাল বোঝো করো। অফিস যাবে তো ? তা হলে রান্নাটা চড়িয়ে দিই।

রান্নাঘর থেকেই অনুরাধা টের পাচ্ছিল, প্রতিভা বেরিয়েছেন ঘর থেকে, ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন।

—তোর মুখ এমন থমথম করছে কেন রে ? কী হয়েছে ?

—কই, কিছু না তো।

—সাতসকালে গাল ফুলিয়ে বসে আছিস কেন ? অফিস যাবি না ?

—যাব। ছেলে কথা ঘোরাচ্ছে, তুমি তো আজ বেশ সোজা হয়ে হাঁটছ !

—হুঁ। ব্যথা আজ কম।

—ওষুধ তা হলে কাজ করছে বলো ?

— তা করছে।

—দেখেছ তো তুমি বলেছিলে ব্যথা সারবে না। আমি তোমার ব্যথা সারিয়ে ছাড়ব। তুমি শুধু ডাক্তারকে ফলো করে যাও।

—সাত্যকি ফোন করেছিল কেন রে ? লাজুর শরীর খারাপ ? মেয়েটা কদিন আসছে না, মনটা বড় আনচান করে।

বুড়ির কান তো নয়, ডিশ অ্যান্টেনা ! সিগনাল পেলেই চ্যানেল ধরে নিচ্ছে ! অনুরাধা প্রায় ঝাপটে এসে চন্দনকে ওঠাল, এখনও দাড়ি কামাতে

গেলে না ? এরপর তো বলবে আমরাই তোমার অফিসের দেরি করিয়ে দিই !

চন্দন কৃতজ্ঞ চোখে অনুরাধার দিকে তাকাল। তারপর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে চলে গেল বাথরুমে।

বিকেলের দিকে চন্দনের ফোন পেল অনুরাধা। লাজুর সন্ধান পাওয়া গেছে। সন্তোষপুরে আছে লাজু। স্কুলের বন্ধু কৃষ্ণার বাড়িতে। চন্দন অফিসফেরত বোনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে পাঠানো যায় সাত্যকির কাছে।

কৃষ্ণা অনুরাধার অপরিচিত নয়, গড়িয়ার বাড়িতে মেয়েটাকে দেখেছে অনেকবার। এ বাড়িতেও এসেছিল একদিন। বছরখানেক আগে। প্রতিভার সঙ্গে দেখা করতে। ভীষণ জোরে জোরে চেঁচায়, হা হা করে হাসে। বিশাল লম্বাচওড়া। হাঁটাচলা কথাবার্তায় রুক্ষ পুরুষালি ভাব। গায়ের রঙ খসখসে কালো। বাবা নেই। মাকে নিয়ে কৃষ্ণা একাই থাকে।

এখানে না এসে বান্ধবীর বাড়িতে কেন উঠল লাজু !

অনুরাধা মনে মনে একটু অসহায় বোধ করছিল। তার অন্তরে এক সূক্ষ্ম কামনা ছিল লাজু সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তার দরজাতেই এসে দাঁড়াক। দশ বছরের ছোট ননদটিকে কোনওদিন ঠিক হাতের মুঠোয় পায়নি অনুরাধা। গড়িয়ার বাড়িতে অদ্রিনাথের ছায়ায় মেয়েটা কেমন যেন পিছলে পিছলে থাকত। তারপর তো চলেই গেল সাত্যকির সঙ্গে। এ বাড়িতে চলে এলে অনুরাধা কি তার অযত্ন করত ? মোটেই না। খাওয়া পরা থাকা সব দিকেই ভরিয়ে রাখত মেয়েটাকে। সঙ্গে সঙ্গে পরখ করেও দেখত একটু। আঠেরো বছর হল অনুরাধা এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছে, কিন্তু এক দিনের জন্যও লাজু তাকে আপন ভাবল না। মনের কোনও গোপন কথা অনুরাধাকে বলেনি কখনও। লাজুর বয়সী অন্য মেয়েরা প্রেম করলে প্রথম বৌদিকেই চুপিচুপি নতুন রোমাঞ্চের গল্প শোনায়, লাজু জানায়নি। চন্দনের মুখ থেকে প্রথম সাত্যকির সঙ্গে লাজুর সম্পর্কের কথা জেনেছিল অনুরাধা। লাজুর গর্ভ নষ্ট হওয়ার খবরও। খবরটা অবশ্য সাত্যকিই চন্দনকে জানিয়েছিল, লাজু নয়। গর্ভপাত দূরে থাক, গর্ভধারণের খবরই কি জানত কেউ ? নিজের মাকে পর্যন্ত লাজু বলেনি কিছু। বড় বেশি চাপা মেয়েটা। বেশি অন্তর্মুখী।

লাজুর কথা মনে পড়লেই আরেকটা ছবি ভেসে ওঠে অনুরাধার মনে। গড়িয়ার বাড়িতে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছে অনুরাধার, বাইরে হঠাৎই কিসের যেন শব্দ ! চুপিসাড়ে বাইরে এসে অনুরাধা হতবাক। উঠোনের দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে লাজু ! অন্ধকার মাড়িয়ে পুকুরপাড়ে চলে গেল। ঘাটের ভাঙা সিঁড়িতে গিয়ে বসেছে। বসেই আছে। পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। গরম কাল, মাঝে মাঝে সাপখোপও বেরোয়, লাজুর হুঁশই নেই ! আঁধার রাত, আকাশে তারারা টিপটিপ করছে, নারকেল গাছে হাওয়া বাজছে সরসর, লাজু যেন সেখানে এক অপ্রাকৃত ছায়া। রহস্যময়। কতই বা তখন বয়স

www.boiRboi.blogspot.com

মেয়েটার ? বড় জোর ষোলো। ওই টুকুনি মেয়েকেও সেদিন ডাকতে সাহস হয়নি অনুরাধার।

কেন যে শুধু ঘুরে ফিরে ওই ছবিটাই মনে আসে অনুরাধার !

দুপুরবেলা আজ বেশ তাপ ছিল, বিকেল থেকে ফুরফুরে বাতাস বইছে। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে বাতাস দোল খাচ্ছে ঘরে। সন্ধে হতেই তারায় তারায় আকাশ ভরে গেল।

অনুরাধা আকাশ দেখছিল। জানলা দিয়ে যতটুকু আকাশ দেখা যায় ততটুকুনি। এত তারা তবু আকাশ তেমন দীপ্তিময়ী নয়। মহানগরের নিওন ফ্লোরেসেন্টের দ্যুতিতে ঈষৎ নিষ্প্রভ যেন। ওই আকাশ, ওই কোটি কোটি মাইল দূরের তারারা অনুরাধাকে অত টানে না, যত টানে মাত্র দশ হাত দূরের ষোলো বছরের কিশোর। তবে সে ঘরের দরজা আজ বন্ধ। রাজা আজকাল ঘরের দরজা খোলা রাখছে না। মাঝে মাঝে দরজা ঠেলে উঁকি দিয়েছে অনুরাধা, ছেলেকে বই খাতার সামনে ধ্যানস্থই মনে হয়েছে সেসময়। অনুরাধা তাতেই খুশি। নজরদারিতে কিছুটা বাধা পড়া সত্ত্বেও।

আকাশ দেখতে দেখতে অনেক দিন পর অনুরাধার আজ বড় নিঃসঙ্গ লাগছিল নিজেকে। বিশ্বসংসারের সবাই কোনও না কোনও কাজে মগ্ন এখন, শুধু অনুরাধারই সময় নিশ্চল।

জানলা ছেড়ে অনুরাধা এলোমেলো ঘুরল খানিকক্ষণ। এ ঘর থেকে ওঘর। রান্নাঘর। স্টোররুম। প্রতিভার ঘরেরও পর্দা সরিয়েছে।

ছানি পড়া চোখেই এক মনে আসন বুনে চলেছেন প্রতিভা। অনেকটা অভ্যাসের মতো।

অনুরাধা মৃদু ধমক দিল, সন্ধেবেলা আবার আপনি ছুঁচসুতো নিয়ে বসেছেন ?

প্রতিভা নির্মল হাসলেন, লাজুকে করে দেব বলেছি, শেষ আর হচ্ছে না। আন্দাজে আন্দাজে যতটা পারি এগিয়ে রাখছিলাম।

অনুরাধা সামান্য দ্বিধা করে আচমকা বলে ফেলল, —লাজুর সঙ্গে সাত্যকির খুব ঝগড়া হয়েছে। লাজু ও বাড়ি থেকে চলে গেছে।

কথাটা বলেই অনুরাধার খুব আফসোস হল। কেন বলল ? এই সন্ধের নির্জন সময়টাই কি তাকে ঠেলে দিল বলতে ?

প্রতিভার হাত থেমেছে। ফোলা ফোলা চোখ অপলক অনুরাধার দিকে, কবে গেছে ?

—কাল দুপুরে। অনুরাধা শাশুড়িকে সান্ত্বনা দিতে চাইল,—চিন্তা করবেন না, ওর বন্ধু কৃষ্ণা, তাদের বাড়িতে আছে। আপনার ছেলে আজ দেখা করতে গেছে।

প্রতিভা স্থির। প্রশ্নহীন। তবু এক নিবিড় যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে চোখে। সূচ গেঁথে আসন আলগোছে সরিয়ে রাখলেন। নিচু স্বরে বিড়বিড় করছেন, লাজুটার বড় কষ্ট। মেয়েটাকে কেউ বুঝল না।

—কষ্ট তো আমাদেরও এসে বলতে পারে। আমরা কি লাজুর পর ? অনুরাধা গলা নরম করল, —বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার কী দরকার ছিল ? আমাদের এখানেই চলে আসতে পারত।

প্রতিভা উত্তর দিলেন না। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছছেন।

অনুরাধার শাশুড়ির পাশে একটু বসতে ইচ্ছে করছিল, পারল না। ঝনঝন করে কলিংবেল বেজে উঠেছে।

মেঘলা আকাশে এক ফালি সূর্যর মতো ছোটকু ঢুকল ভেতরে, রাজামশাই কোথায় ? রাজামশাই ? ওকে আমি উইশ করতে এসেছি।

ছোটকুর চোখমুখ যথারীতি চঞ্চল। রুক্ষ চুল ঝাইঝাপুর। চটি পরা পায়ে এক পুরু ধুলো। অনুরাধা হেসে ফেলল, দিলি তো কার্পেটটা ধুলো মাখামাখি করে ! যা, রাজাকে ডাকার আগে পা ধুয়ে আয়।

—না, না, আমার অত সময় নেই। আমার বলে এখন কত কাজ ! ডাক্ না রাজাকে, কথা বলেই চলে যাব।

অনুরাধা চোখে পল্‌কা ইঙ্গিত করল, বাবু এখন ঘর থেকেই আর বেরোচ্ছেন না। বেশ নার্ভাস হয়েছে। বাড়িতে কারুর সঙ্গে ভাল করে কথাও বলছে না। পরশু স্কুলে অ্যাডমিট কার্ড দিচ্ছিল। অন্য সময়ে বন্ধুদের দেখলে ছেলের জ্ঞান থাকে না, সেদিন শুধু গেল আর এল। এসেই আবার নিজের গর্তে। যা না, দেখে আয়।

ছোটকু নড়ল না। সোফায় হেলান দিয়ে হাঁক মারল, ম্যাজিশিয়ান, বেরিয়ে এসো।

ছোটকুকে দেখলেই উচ্ছ্বাস বেড়ে যায় রাজার, আজ সে অত্যন্ত গম্ভীর। ভাবহীন মুখে প্রশ্ন করল, কী বলো।

—সত্যিই তো রে দিদি ! এ তো একেবারে ব্যোম্ মেরে গেছে ! ছোটকু উঠে রাজাকে ঝাঁকাচ্ছে, —দশ দিনের জন্য কাল বাইরে যাচ্ছি, যাওয়ার আগেই তাই উইশ করতে এলাম তোকে।

—থ্যাংক ইউ।

—নো কায়দা। ওরকম ধুন্দ্ মেরে গেলে পরীক্ষা ভাল হয় না। টেক্ ইট ইজি ম্যান। চিয়ার আপ।

রাজা একবার অনুরাধার দিকে তাকাল, একবার ছোটকুর দিকে। দুজনকে এক কুচি বাঁকা হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল ঘরে।

ছোটকুর চিৎকারের বিরাম নেই, তোমার সৌভিক নামটা কিন্তু সার্থক করতে হবে বস্। পরীক্ষায় একটা দারুণ ভেল্‌কি দেখিয়ে দাও তো দেখি। আমরা একদিন কবজি ডুবিয়ে সাঁটাই।

—তোকে বুঝি খাওয়াই না ? অনুরাধার চোখে ছদ্ম কোপ, তা বিশ্ব বখাটের যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

—গোমিয়া। চন্দ্রপুরা। বোকারো। বরকাখানা। সে বলতে গেলে

www.boiRboi.blogspot.com

একটা মালগাড়ি হয়ে যাবে। ভাবছি চান্স পেলে ম্যাক্‌ল্যাক্‌সিগঞ্জেও ঢুঁ মেরে আসব ! মার্কেট স্টাডি করতে হবে।

—কিসের ? তোর সেই মাদুলির ?

—দূর, ওটা হবে না। লাজুকে এত করে বললাম পার্টনার হতে ! বড় বড় চোখ আছে, মুখটাও সুইট, গেরুয়া পরিয়ে দিলে ওকে সিদ্ধাইমা দারুণ মানাত। তোর ননদটা আমাকে পাত্তাই দিল না।

লাজুর প্রসঙ্গে সামান্য আড়ষ্ট হল অনুরাধা। দিদি দিদি ভঙ্গিতে কথা ঘোরাল, তুই তানিয়ার সঙ্গে এখনও দেখা করছিস্ ?

ছোটকু মাথা চুলকোল, কই আর। সোমেশ্বরবাবু যা কড়া পাহারায় রেখেছেন ! মেয়েরাও বুঝলি দিদি... পুরো বাবুই পাখির কেস। আমরা বাসা বানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, ওরা ঠোক্কর মেরে দেখে নেবে বাসাটা পোক্ত কিনা।

—মেয়েরা তা হলে খুব সেয়ানা হয়েছে বল্ !

—হেব্বি সেয়ানা। ওই একটু চাঁদ ফুল তারা ব্যাস্। কোন্ বাসাতে যে আসলে ঢুকবে দেবা না জানন্তি।

—তুই এখন নারীচরিত্র নিয়ে গবেষণা করছিস বুঝি ?

—নারে, ঠেকে শিখছি। ছোটকু অকস্মাৎ গোমড়া, যতই শিক্ষিত হোক, যতই অ্যাডভান্সড্, মেয়েদের আলটিমেট গোল হাঁড়ি বাড়ি শাড়ি।

অনুরাধার মজা লাগছিল শুনতে। এই সেদিন হামা টানত ছোটকু, এখন কেমন বিজ্ঞের মতো জীবনদর্শন আওড়াচ্ছে। প্রতিভা মাঝে মাঝেই বলেন, সময় যায়, না ঝড় যায় ! সত্যিই তাই।

ওঠার আগে ছোটকু বলল, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা। অশোকের ফাইনাল প্ল্যান রেডি হয়ে গেছে। কাল সন্ধেবেলা তোর কাছে নিয়ে আসবে। জামাইবাবু যদি থাকে তো ভাল হয়। যদি জামাইবাবু ওকে করে দেয়, তা হলে পরশুই ও করপোরেশানে কথা বলবে। প্ল্যান সেকশানে ওর এক বন্ধু আছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে প্ল্যানটা। টাকাও বেশি খাবে না। দু তিনশোতে হয়ে যাবে।

অনুরাধা ইতস্তত করল, প্ল্যান করে ফেলেছে ? তোর জামাইবাবুর খুব ইচ্ছা লাজুর বর করে বাড়িটা।

—এটা কিন্তু অশোকের ওপর খুব অবিচার হবে দিদি। আমার মতো অগাবগা ভ্যাগাবন্ড নয়, সিন্‌সিয়ার ছেলে, তাকে একটা চান্স দিবি না ? সাত্যকিদার তো হাইফাই ব্যাপার। এই অ্যাপার্টমেন্ট করছে, ওই কমপ্লেক্স করছে ! ...লাজু বলছিল এখন চেতলায় যে বাড়ি তুলছে, সেখানে নিজের জন্যও একটা ফ্ল্যাট রাখছে সাত্যকিদা। সে তোর বাড়ি করতে পেল, কি না পেল, তাতে কি এসে যায় ? কিন্তু ভেবে দ্যাখ্, অশোক যদি একটা সুযোগ পায় হয়তো ছেলেটা দাঁড়িয়ে যাবে।

অনুরাধা চাপে পড়ে গেল। অশোককে তারও ভাল লেগেছে। কিন্তু

চন্দন... ? দ্বিধান্বিত ভাবে অনুরাধা বলল, দেখি। প্ল্যানটা তো আনুক। যদি অশোক বাড়ি নাও করে প্ল্যানের জন্য ওকে আমি...

—নানাহ্। অশোকই করবে। সাত্যকিকে হাটা। তুই জামাইবাবুকে ফোর্স কর।

তা করা যায়। অনুরাধা চন্দনকে নিমরাজি করে এনেছে। তবু ভাইকে পাকা কথা দিতে পারছিল না অনুরাধা।

নটা নাগাদ চন্দন ফিরল। প্রতিভা ছেলের গলা পেয়েই বেরিয়ে এসেছেন, দেখা হল লাজুর সঙ্গে ? কী বলল ? ভাল আছে তো ?

—ভালই আছে। অনুরাধাকে দেখে নিল চন্দন। চন্দনের মুখ আষাঢ়ে মেঘের মতো গম্ভীর। থমথমে।

অনুরাধা বলল, এখানে ধরে নিয়ে এলে না কেন ?

চন্দন দায়সারা জবাব দিল, ওখানে ঠিকই আছে।

হাজার খুঁচিয়েও চন্দনের মুখ খোলাতে পারছিল না অনুরাধা। পরিষ্কার বোঝা যায় চন্দন কিছু লুকোতে চাইছে।

অনুরাধা বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি বলতে চাও লাজু তোমাকে বলেনি কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে সাত্যকির সঙ্গে ?

—আমি অত খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করিনি।

—সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে। কেন তুমি জিজ্ঞাসা করোনি ?

চন্দন একটু চুপ থেকে বলল, হাঁটুর বয়সী ছোট বোনের পারসোনাল লাইফ নিয়ে কৌতূহল দেখানো আমার পোষায় না।

—সাত্যকি কি লাজুর গায়ে হাত তুলেছিল ?

—সাত্যকি গায়ে হাত তোলার ছেলে নয়।

—তুমি সাত্যকির সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতে ?

—পারলে যাব।

—কী মনে হল লাজুর কথা শুনে ? ফিরবে ?

—জানি না। কিচ্ছু জানি না। সারাদিন পর...। আমার আর বকবক করতে ভাল লাগছে না। খেতে দাও। রাজার খাওয়া হয়েছে ?

—না, একসঙ্গে বসব সকলে।

চারজন মানুষ নির্বাক খাচ্ছে। রাজা তার ঘোরে বিভোর। থালার সঙ্গে মাথা সেঁটে আছে প্রায়। অনুরাধা আজ তার জন্য পরোটা করেছিল, রাজা রুটির থেকে পরোটা বেশি ভালবাসে। দুটো পরোটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ল রাজা, দু-চার টুকরো খেল, কি খেল না। মাংসর বাটিতে আঙুল ডুবিয়েও তুলে নিয়েছে। অনুরাধা ছেলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলল।

প্রতিভা চামচ দিয়ে দুধটাই ঘাঁটছেন। চন্দন নিঝুম।

নীরবতা ভেঙে প্রতিভা বলে উঠলেন, আমাকে কাল একবার লাজুর কাছে নিয়ে যাবি চাঁদু ?

www.boiRboi.blogspot.com

চন্দন জল খেয়ে গ্লাস নামাল, কাল আমাকে তাড়াতাড়ি অফিস বেরোতে হবে। কাল হবে না।

রাজা উঠে বেসিনে মুখ ধুচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে তাকাল, — বাবা তোমাকে নিয়ে যাবে না বড়মা। ঠিকানাটা নিয়ে নাও, আমি কাল সকালে নিয়ে যাব।

রাজার স্বর এমন কঠিন, অনুরাধা চন্দন দুজনেই চমকে উঠল। রাজা তা হলে সব শুনেছে! বইখাতায় ডুবে থেকেও।

অনুরাধা তিরস্কারের দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকাল একবার, কোমল স্বরে রাজাকে বলল, তুই এখন কী করে যাবি ? আমি দরকার হলে তোর বড়মাকে নিয়ে যাব।

রাজার ঠোঁটে বিদ্রুপের ঝিলিক, তুমি আমাকে ছেড়ে নড়বে ?

অনুরাধা রাজার শ্লেষ উপেক্ষা করল, প্রতিভাকে বলল, পরশু ভোরবেলা আমি রাজার জন্য পুজো দিতে বেরোব মা। আপনার ছেলে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ডাকাতে কালী, কালীঘাট, ফিরিঙ্গি কালী দক্ষিণেশ্বর সব জায়গাতেই যাব। আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। পুজোগুলো সেরে আমিও একবার লাজুর সঙ্গে দেখা করে আসব।

প্রতিভা অনুরাধার দিকে তাকালেন না, চন্দনের দিকে তাঁর চোখ স্থির, বেশ। যা ভাল বোঝ তোমরা।

সেই রাতে অনুরাধা এক উৎকট স্বপ্ন দেখল। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটছে অনুরাধা আর চন্দন। তাদের মাঝখানে ছোট্ট রাজা। যত ছুটছে বৃক্ষরাজি দীর্ঘ হচ্ছে ক্রমশ। জঙ্গলের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। আস্তে আস্তে আলো থেকে অন্ধকারের সুড়ঙ্গে ঢুকল তিনজন। নীলচে আঁধারে টিলটিল এক হ্রদ। হ্রদের মাঝখান থেকে খাড়া পাঁচিল উঠে গেছে আকাশে। যত ওপরে তাকায়, পাঁচিল আরও উঁচুতে ওঠে। আকাশের নীলে আটকে যায় পাঁচিল। সব কালো। মিশমিশে কালো।

এগারো

কৃষ্ণা খবর এনেছে রুদ্র ফিরে গেছে বয়লাডিলায়। গত সপ্তাহে। ভাগ্যিস লাজু সেদিন রুদ্রর খোঁজে যায়নি!

লাজু ছোট্ট শ্বাস ফেলল। রুদ্র এল, চলেও গেল। দেখা করল না, শুধু দূর থেকে উত্তাপ ছড়িয়ে জ্বালিয়ে দিল সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্কের আধছেঁড়া সুতোটাকে। আগের বার রুদ্রর সংবাদে নষ্ট হয়েছিল সাত্যকির সন্তান। দুটো ঘটনাই কি কাকতালীয় ? রুদ্র কে তার ?

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে লাজুকে ঠেলল, কী এত ভাবছিস্ রে ? নদীর ওপারের কথা ?

—উহুঁ, এপারের কথা। লাজু চেতনায় ফিরল, এত ঝামেলা নিয়েও কী

করে এত হাসিখুশি থাকিস তুই !

—হাসতে না পারলে কবেই মরে যেতাম। হাসি কী আর যে সে জিনিস রে ? হাসি হল বিধাতার শ্রেষ্ঠ টনিক।

কৃষ্ণাকে যত দেখছে মুগ্ধ হচ্ছে লাজু। স্কুলে কৃষ্ণা লেখাপড়ায় নেহাতই মাঝারি ছিল, কোনওক্রমে খেটেখুটে বিএ পাশ করেছে। দু তিন বার পরীক্ষা দিয়ে ঘষটে ঘষটে এখন এক অতি সাধারণ কেরানি। তার দুই দাদা আর ভাই তিনজনই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। বড়দা ইন্‌সিওরেন্সে চাকরি করে, মেজদা ব্যাঙ্কে। ভাই ডাক্তারি পাশ করে সম্প্রতি বর্ধমানের ভাতারে এক হেলথ সেন্টারে পোস্টেড। দুই দাদাই আপন আপন বৃত্তে সচেতন সংসারী। ভাই ব্যস্ত তার নতুন চাকরি নিয়ে। কৃষ্ণার মা ঘোরতর শয্যাশায়ী, বছর তিনেক আগে মস্তিকে রক্তক্ষরণ হয়ে তাঁর বাম অঙ্গ পড়ে গেছে। তাঁর মুখের কথাও বেশ জড়ানো। অসংলগ্ন। প্রায়শই চেনা লোককে চিনতে পারেন না তিনি। কৃষ্ণা সারাদিন অফিস করে, সারারাত মায়ের সেবা। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা, বারো ঘণ্টার জন্য এক আয়া আছে, তার পিছনে আট নশো টাকা খরচ হয়। বাড়িভাড়া বারোশো। শত কষ্টে থেকেও কখনও অভাবের কথা বলে না কৃষ্ণা। তার মুখের হাসিটি সদা অমলিন।

কোথা থেকে যে এত শক্তি পেল কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা লাজুর সামনে বসে পা দোলাচ্ছিল, তুই যাই বল লাজু, আমি দাদাদের দোষ দিতে পারি না। ওদের মতো অবস্থায় থাকলে আমিও হয়তো এরকমই করতাম।

—বাহ্ ! মাসিমা ওদের মা নয় ? ওরা কেউ নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে না ?

—বড়দা রেখেছিল তো। কিন্তু ওখানে কে দেখবে বল ? বৌদিও অফিস বেরিয়ে যায়। বাচ্চা রাখতে আয়া আছে, সেও তো ওই অসুস্থ মানুষের সেবা করবে না ! মা-র জন্য আলাদা লোক রাখতে হলে....ওরা নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে, কত টাকা করে কাটছে মাসে মাসে !

—আর তোর মেজদা ? মেজবউদি তো আর চাকরি করে না ?

—মেজদার বাড়ি ছোট, জায়গা নেই। তাছাড়া মেজবৌদিকে তো তুই দেখিসনি, ভীষণ নার্ভাসটাইপ। অসুস্থ মাকে দেখতে হলে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর বাবুন ভাতারে একা থাকে, ওর কাছে মাকে পাঠাই কোন্ ভরসায় ? তাকে কে দেখে তার ঠিক নেই।

—তা হলে আর কী। লাজু হাত ওল্টাল, মা তা হলে তোর একার ! কারও আর কোনও দায়িত্ব নেই !

—দায়িত্ব ভাবলে আছে, না ভাবলে নেই। ওরা তো মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায়। যে যেমন পারে। দুশো পাঁচশো।

—ব্যস্ ? আর মানুষটার দেখাশুনো করা, ঝক্কি সামলানো...তুইও তো

www.boiRboi.blogspot.com

চাকরি করিস।

—চুপ কর তো। আমার এমন কিছু কষ্ট হয় না। আলগা ধমক দিতে গিয়ে কৃষ্ণা হেসে ফেলল, সেই যে সিন্দবাদ নাবিকের গল্প আছে... ! লোকটা কাঁধে করে মানুষদের নদী পার করে দিত আর ছটফট করত তার মুক্তি নেই বলে... ! লোকটা কী ভাবে মুক্তি পেয়েছিল জানিস তো ?

—কী করে ?

—তা জানবি কেন ? যত সব ভারী ভারী বই দিয়ে মাথা ঠেসে রেখেছিস। লোকটা একদিন মাঝনদীতে মানুষটাকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে নদী পার হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে পরের মানুষটা টানছে, যতক্ষণ না আরেকজনকে সে কাঁধ থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। কৃষ্ণা হাসিতে ভেঙে পড়ল, কাউকে না কাউকে তো নদীতে থাকতেই হবে রে ভাই। নইলে লোকজন পার হবে কী করে ! যে বইছে সে যদি কষ্টটাকে কষ্ট না মনে করে, তা হলেই খেল খতম।

একেই কি মোটা বুদ্ধি বলে ? এর জন্যই কি স্কুলে থাকতে কৃষ্ণাকে অনুকম্পা করত লাজুরা ?

সেদিন পঙ্কজের হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে লাজু প্রথমটা কেমন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। কী করবে ? কোথায় যাবে সে ? মাথার ওপর অনন্ত আকাশ, পায়ের নীচে অসীম পৃথিবী, শুধু লাজুরই কোথাও হাত পা ছড়িয়ে থাকার ঠাঁই নেই ! দাদার বাড়িতে ওঠার প্রশ্নই আসে না। যে যে অপরাধের জন্য সাত্যকিকে লাজু মনে প্রাণে ঘৃণা করে, সেই সব অপরাধই আরও কুৎসিত ভাবে করে চলেছে তার দাদা। যেন ষড়রিপুর বিকাশই জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাত্যকিকে যদি লাজু ছেড়ে আসতে পারে, দাদার কাছেই বা সে কেন যাবে ? ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দেখেছিল, মাত্র একশো সতেরো টাকা পড়ে আছে। এই টাকা নিয়ে কোনও হোস্টেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো যায় না। তা ছাড়া পঙ্কজ সঙ্গে রয়েছে, তাকে নিয়ে হোস্টেলে যাবেই বা কী করে। বন্ধুদের মধ্যে বিদিশার বাড়ি যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সীমা মনীষার সঙ্গে তার ভালই যোগাযোগ আছে, কিন্তু তারা দুজনেই এমন সংসার পাগল। লাজু একবার চোখ কান বুজে রুদ্রর কাছে যাওয়ার কথাও ভেবেছিল। রুদ্র নিশ্চয়ই কলকাতায় তাদের গড়িয়ার বাড়িতেই উঠেছে। রুদ্রই কি লাজুর নিরাপদ আশ্রয় !

রুদ্রর কথা ভাবতেই লাজুর মাথা ঝিমঝিম। রুদ্র বলত, সাত্যকি আমাদের পূর্ণবয়স্ক নাবালক। বয়স যত বাড়বে ও ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। তিরিশে দৌড়বে, চল্লিশে টলমল পায়ে হাঁটবে, পঞ্চাশে হামা টানবে, ষাটে কোলে। তুই তখন ওকে সামলাতে পারবি তো লজ্জা ?

লাজু পারেনি। রুদ্রর সামনে সে দাঁড়াবে কোন্ মুখে ? দ্বিতীয়ত রুদ্র কলকাতায় এসে বিদিশার সঙ্গেও দেখা করেছে, লাজুর কাছে আসেনি।

আসেনি, না ইচ্ছে করে আসতে চায়নি ? লাজুর হৃৎস্পন্দন বাড়ছিল। সে যাবে না, কখনও রুদ্রর কাছে যাবে না। প্রাণ থাকতে না।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তখনই হঠাৎ কৃষ্ণার নামটা মাথায় এসেছিল লাজুর। রুদ্র কৃষ্ণাদের পাশের বাড়িতে থাকত বলেই কি ? হয়তো তাই। মনের যে কখন কাকে মনে পড়ে যায় ! দশ বিলিয়ান স্মৃতিকোষের একটাতে ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ....একবার গিয়েছিল কৃষ্ণার বাড়ি...মা ছাড়া কেউ সঙ্গে থাকে না কৃষ্ণার,...গেলে ভীষণ খুশি হয় মেয়েটা,...যাবে নাকি লাজু সেখানে ?

একটা স্ফুলিঙ্গই শেষে পথ দেখাল।

কৃষ্ণা তখন বাড়িতে ছিল না। নির্মলা লাজুকে চিনতেই পারেননি। লাজু বলেছিল, আমি লাজবন্তী মাসিমা। লাজু। কৃষ্ণার বন্ধু। গড়িয়ায় সেই পুকুরপাড়ের বাড়িটাতে থাকতাম।

নির্মলা অস্ফুটে কী বললেন লাজু বুঝতে পারল না।

—আমি আগে একদিন এখানে এসেছিলাম, মনে আছে ?

হাসতে গিয়ে মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে গেল নির্মলার। চোখ জলে পূর্ণ হয়ে গেল।

আয়া বলল, চিনতে পেরেছে আপনাকে।

লাজু আয়াকে জিজ্ঞেস করল —কৃষ্ণা ফেরে কখন ?

—সন্ধে সন্ধেই ফিরে আসেন। আপনারা বসুন না। ছটার মধ্যেই ফিরবেন।

লাজু কাঠ হয়ে বসেছিল। কৃষ্ণাদের বাড়ি সন্তোষপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে। বাস থেকে নেমে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হয়। দোতলা বাড়ির একতলার একটা ভাগ কৃষ্ণা ভাড়া নিয়েছে। দুটো খুপরি খুপরি ঘর, এক চিলতে গ্রিলঘেরা বারান্দা, রান্নাঘর, বাথরুম, এর ভাড়াই নাকি বারোশো। লাজু আগে যেদিন এসেছিল, সেদিন এত ছোট লাগেনি বাড়িটাকে।

কৃষ্ণা অফিস থেকে ফিরে লাজুকে দেখে ভীষণ খুশি, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম রে আজ ! কতক্ষণ এসেছিস ? বলতে বলতে পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছে, এটি কে ? তোর বডিগার্ড ?

লাজু হেসেছিল, চামচেও বলতে পারিস। সাত্যকি মেদিনীপুর থেকে তুলে এনেছিল। আমার হেল্পার করার জন্যে। আমিই এখন ওর হেল্পার হয়ে গেছি। মা নেই, মরে গেছে। বাপটা আবার বিয়ে করে...এই পঙ্কজ, তোর নাম বল্।

কৃষ্ণা হো হো করে হেসে উঠল, তুমহারা নাম কেয়া হ্যায় বাসন্তী...সরি, পঙ্কজ ?

পঙ্কজ দারুণ সপ্রতিভ, আমার নাম শ্রীমান পঙ্কজ কুমার বেরা।

— কী কী করতে পারিস ?

—চা করতে পারি। যোগ করতে পারি। রুটি বেলতে পারি। এবিসিডি

www.boiRboi.blogspot.com

পড়তে পারি। ঘর ঝাড়পোঁছ করতে পারি। বাসন মাজতে পারি।

—থাক। আর দরকার নেই। অনেক গুণপনা জাহির হয়েছে। লাজুর মুখে হাসি, যাও তো, ওঘরে দিদার কাছে গিয়ে একটু বোসো। আমি মাসির সঙ্গে কথা বলব।

সব কথা শুনে কৃষ্ণা মুহূর্তের জন্য গম্ভীর, তারপর সজোরে একটা থাপ্পড় লাজুর কাঁধে, ঠিক করেছিস। বেশ করেছিস। রুদ্রদার ওই স্যাঙাতটিকে আমার কোনওদিনই সুবিধের মনে হয়নি।

লাজু কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর এখন সমস্যাটা কী ? কোথায় থাকবি ?

লাজু নিরুত্তর।

—দাদা বৌদির গলগ্রহ হতে চাস না, তাই তো ? তুই এখানে থেকে যা।

—তোর অসুবিধে হবে। একে এই ছোট জায়গা, তার ওপর মাসিমার ওই অবস্থা...আগের বারও মাসিমাকে এতটা খারাপ দেখিনি।

—মা আর ভাল হবে না। তুই মাকে নিয়ে চিন্তা করিস না। আমাদের দুজনের যখন এ বাড়িতে জায়গা হয়, চারজনেরও হয়ে যাবে। সেই দাদুর দস্তানার মতো থাকব আমরা। তবে হ্যাঁ, তোর রাত্তিরে একটু অসুবিধা হবে। মা সারারাত জ্বালাবে। কথা বলতে পারে না তো, কিছু দরকার হলে বিচ্ছিরি গঁগঁ আওয়াজ করে মুখ দিয়ে। ঘুম ভেঙে যাবে বার বার।

লাজু বলেছিল —বোকার মতো কথা বলিস না। সে নয় আমি জাগব।

—একা জাগবি কেন ? আমি প্রথম রাতটা জেগে মাকে দেখব, তুই শেষ রাত্তির। রাজি ?

—সেটা কথা নয়। তোর বিশ্রাম হয় না। আমি নয় সারারাতই মাসিমাকে দেখব।

—ওটি হবে না। কৃষ্ণা চোখ পাকাল, এ বাড়িতে ওসব চ্যারিটি চলবে না। গিভ অ্যান্ড টেক্ পলিসিতে চলো। তোমার এখন চাকরি নেই, আমি সপ্তাহে তিন দিন আয়া রাখব, সে কদিন তুমি চাকরির খোঁজে ঘুরতে পারবে। অন্য তিন দিন তুমি আমার মাকে দিনে দেখবে। রোববার আমি। রাত সিক্সটি ফোরটি। ভোরের দিকে আমার মাইরি বড্ড ঘুম পায়। না ঘুমোলে অফিসে এত ঢুলুনি আসে ! চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত তোমার খাওয়া থাকা ফ্রি।

—ফ্রি কেন ? লাজু বলে ফেলেছিল, আমি তো টিউশনি করি। ছশো টাকার।

—দিস তা হলে দু একশ। আর তোর চামচেকে বলিস কিছু কাজকর্ম করে দিতে। ব্যাটা খায় কেমন ? প্রচুর টানে ?

লাজু দুশ্চিন্তা ভুলে হিহি করে হেসে ফেলেছিল, —সত্যিরে, গোড়ার দিকে রাক্ষসের মতো খেত। এখন শহরের হাওয়া লেগে গেছে। খুব বাধ্য। ওকে যদি বলিস্ মাসিমার পাশে সারাদিন বসে থাকতে, ও ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো বসে

থাকবে।

—মা মরে কাঠ হয়ে গেলেও নড়বে না বলছিস্ ? বলেই হাসিতে ফেটে পড়েছে কৃষ্ণা। হাসতে হাসতে ছুটেছে মাকে বেডপ্যান দিতে।

এ বাড়িতে প্রথম রাত্রিটা লাজুর ভারী অদ্ভুত কেটেছিল। সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকুক, একটা নিয়মের মতো একসঙ্গে ছিল তো এতদিন! রাতভর পাশে পরিচিত নিশ্বাসের শব্দ নেই, অভ্যস্ত পুরুষের ঘ্রাণ নেই, সবটাই কেমন যেন অবাস্তব। লাজু বুঝতে পারছিল সম্পর্ক ছিঁড়ে গেলেও তার রেশ অদৃশ্য সুতোর মতো থেকে যাবে বহুদিন। হয়তো বা আমৃত্যু।

পরদিন থেকে লাজু অবশ্য অনেক স্বাভাবিক। তবে লাজুর থেকে পঙ্কজ যেন আরও বেশি স্বচ্ছন্দ। মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে দেখে সে এতটুকু ঘাবড়ায়নি। দারিদ্র্যের এক তরল রূপ আছে, যে কোনও আধারেই সে খাপ খেয়ে যায়। মাত্র তিন দিনে পঙ্কজ পুরোপুরি এ বাড়ির মানুষ।

লাজু এক বস্ত্রে বাড়ি ছেড়েছে। ব্যাঙ্কের পাশবই চেকবই সঙ্গে আনার তো প্রশ্নই ওঠে না। কৃষ্ণার শাড়ি পরে তাও চালানো যায়, কিন্তু সায়া ব্লাউজ! কৃষ্ণা প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দশাসই, সে তুলনায় লাজু তো লিলিপুট। এক দিন পর কৃষ্ণাকে বলতে লাজু বাধ্য হয়েছিল, তোর অফিস তো বিদিশার অফিসের কাছেই, ওকে গিয়ে বল্ না ও যদি আমাদের বাড়ি থেকে আমার কয়েকটা জামাকাপড় এনে দেয়। আর পঙ্কজের প্যান্টশার্ট, বইখাতা।

দুপুরে বেরিয়ে লাজু চন্দনের অফিসেও ফোন করেছিল সেদিন। মা-না জানি মেয়ের খবর না পেয়ে কী অবস্থা হয়েছে! উল্টোপাল্টা কিছু যদি আশঙ্কা করে বসে!

চন্দন আসার আগে বিদিশা এসেছিল। বিকেলবেলা। হাঁপাতে হাঁপাতে। অফিসের জিপে করে। এই নে তোর চেক বই পাশবই। সাত্যকিকে ফোন করতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল বেচারা। দু হাজার টাকাও দিয়ে গেছে।

—তোকে তো খালি জামাকাপড়ের কথা বলেছিলাম। এই সব টাকা, পাশবই চেকবই নিয়ে আমি কী করব ?

—বারে, টাকা লাগবে না ? তুই যে কদিন এখানে থাকবি তার খরচ খরচা নেই ?

লাজু নীরস মুখে বলেছিল, আমি শুধু কদিনের জন্য আসিনি রে। আমি আর সাত্যকির কাছে ফিরব না।

—যাহ্। সাত্যকি তোকে সত্যিই ভালবাসে। বুঝেছি, তোর এখন মাথা গরম হয়ে আছে। ঠাণ্ডা হ'। রাগ পড়লে দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

—আমাকে কখনও রাগতে দেখেছিস ? আমি সাত্যকির টাকা ছোঁব না।

—পাশবই চেকবই তোর নামে, এ দুটো রাখ্।

—নাম আমার, কিন্তু টাকা সাত্যকির।

—পাগলামি ছাড়। সাত্যকি ভীষণ ভেঙে পড়েছে। তা ছাড়া স্বামীস্ত্রীতে

www.boiRboi.blogspot.com

তো ঝগড়া হয়ই। এই তো সেদিন তাপস রেগে গিয়ে আমার কান মুলে দিল। বুবুকার সামনে। দোষের মধ্যে আমি জা'কে ফ্ল্যাট বড় করে দেওয়ার গল্পটা বলে ফেলেছি। কী যাচ্ছেতাই মুখ করল আমাকে। পাঁঠা গরু কি বলেনি! কই, আমি তো পাত্তা দিইনি!

লাজু কী করে বোঝায় সাত্যকির সঙ্গে তার সংঘর্ষের গভীরতা কতখানি! চিন্তায় ভাবনায় কর্মে আদর্শে দুজন যদি দুই মেরুর মানুষ হয়, তারাও হয়তো চুম্বকের টানে সংসারে আটকে থাকতে পারে, কিন্তু একই মেরুর ভান করে বদলে যাওয়া মানুষ যে কী দুর্বিষহ!

—তুই বড় মিস্টিরিয়াস লাজু। চাকরি খুঁজছিস ; আমার অফিসে জয়েন করবি না! বেশ ছিলি সাত্যকির সঙ্গে, বলা নেই কওয়া নেই...! যা ভাল বুঝিস কর।

লাজু বলল, তুই আমাকে কিছু টাকা দিবি ? লোন ? শোধ দিতে কিন্তু দেরি হবে।

—লোন্ কেন ? তুই আমার অফিসে জয়েন কর, অ্যাডভান্স স্যালারির বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। বলেই বিদিশা খপ করে লাজুর হাত চেপে ধরল, —অফিসে আমি আরও টাইট কর্নারে পড়ে গেছি রে। ভেঙ্কট আর পাইন একটা আঁতাত গড়ে তুলেছে। আমার লাস্ট প্রজেক্ট রিপোর্টে তিনটে ফিগারের গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই নিয়ে ওরা ডিরেক্টারের কাছে ঘোঁট পাকাচ্ছে। তুই চলে আয় প্লিজ্। আই নিড ইউ লাজবন্তী। তুই চাকরি করলে সাত্যকিও রিলিভড্ হবে।

লাজু হেসে ফেলল, তোর অফিসে চাকরি করতে আমি পারব নারে। তুই কি চাস্ আমাদের এই সুন্দর বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাক ?

বিদিশা আর জোর করেনি। উঠবার সময় নির্মলার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। নির্মলার অস্বচ্ছ দৃষ্টি বিদিশায় নিবদ্ধ। বিদিশার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় বলেছিল, বাবার শরীরটাও খুব খারাপ যাচ্ছে রে। হাই প্রেশার। সুগার। বড্ড রোগা হয়ে গেছে।

—তুই বাপের বাড়ি যাচ্ছিস আজকাল ?

বিদিশা দু দিকে মাথা নেড়েছিল, ইচ্ছে করে। পারি না। কে যেন পা দুটো টেনে রাখে। একদিন কোর্টে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবাকে দেখে এসেছি।

—বাড়ি যাস্ না কেন ? গেলেই পারিস। মাসিমা তো তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

—যেতাম রে, যদি তাপস বাবার কথাগুলো ভুল প্রমাণ করতে পারত। বাবার কথা রাখতে তাপস নিষ্কর্মাই হয়ে গেল। যে মাকাল ফল, সেই মাকাল ফল। নিজের কাছে তো হেরেই গেছি, বাবার কাছেও হারব ? কভি নেহি। বিদিশা পাশবই চেকবই টাকা গুছিয়ে নিল ব্যাগে। আলাদা পাঁচটা একশো টাকার নোট বার করল, আজ এটাই আছে। রেখে দে। তোর শাড়ি জামা

আমি দু একদিনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বলতে বলতে বিদিশা হঠাৎই কপাল চুলকোল, আচ্ছা, আমিও যদি এসে এখানে থাকি ? বেশ একটা লেডিজ কমিউন তৈরি করে... ইচ্ছে মতো হাসব, নাচব, গান গাইব !

—হুঁ, তোর বর ছেলেমেয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে চলে আসুক আর কী ! তোর বরের তো আবার একটা বন্দুক আছে, নারে ?

—ওটা এয়ারগান। পাখিমারা বন্দুক। বিদিশা শ্বাস ফেলল, ছেলেমেয়ে দুটোই তো আমার পথের কাঁটা। একদিনের জন্য ওরা পিসির বাড়ি গেলে বুকটা কেমন হা হা করে। নইলে আর কী। আমি যদি কোথাও চলেও যাই, তাপস দু তিন দিনের আগে খেয়ালই করবে না আমি নেই। তাও হয়তো মাঝরাত্তিরে।

লাজুর চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কিছু কিছু মানুষ থাকে, যারা নিজেদেরই কাছে নিজেরাই অসহায়। বোধ আছে, যুক্তি আছে, কিন্তু নিজেই এমন মরচে ফেলে দিয়েছে তাতে যে ইচ্ছে করলেও সে মরচে আর তোলা যায় না। জোর করে তুলতে চাইলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে সবটুকুই ঝরে যায়। বিদিশার সঙ্গে সাত্যকির খুব মিল। না। ভুল হল। মিল থাকলেও বিদিশা সাত্যকির ছাঁচ আলাদা আলাদা।

এই যে শনিবার, অফিস ছুটির দুপুরে, অলসভাবে গড়াচ্ছে কৃষ্ণা আর অবিরাম কলকল করে চলেছে, এর ছাঁচটা কী ?

কৃষ্ণা অফিসের গল্প করতে করতে হঠাৎই প্রশ্ন করল, এই, তোর কাল চন্দনদার সঙ্গে কী কথা হল বললি না তো ?

লাজু আড়মোড়া ভাঙল, দাদারা যা বলে তাই। ফিরে যা। অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা কর।

—তোকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করল না ?

—করেছিল। লাজু চোখ বুজল, আমি রাজি হইনি।

—কেন ?

—বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের জন্য বাপের বাড়ির চৌকাঠ অনেক উঁচু হয়ে যায় রে। ফিরতে চাইলে ঠোক্কর খেতে হবেই। লাজু কায়দা করে মূল কারণটা বলল না কৃষ্ণাকে। যার প্রতি গভীর টান থাকে, তার চরিত্রের কালো দিকগুলোর কথা লোককে সহজে বলা যায় না। সাত্যকি সম্পর্কে লাজু বলতে পারছে কারণ সাত্যকির মধ্যে কিছু আদর্শ ছিল একদিন। সততা ছিল। অথবা এও হতে পারে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য সাত্যকিকে এখন আক্রমণ করতেই হয়। কিন্তু চন্দনের বেলায় অস্তিত্ব রক্ষার তো প্রশ্নই আসে না। বাকি থাকে অবক্ষয়। লাজুর দাদার মধ্যে আদর্শই ছিল না কোনওদিন, তার আর অবক্ষয় কিসের ?

ছাত্র বাসে মদের বোতল ধরতে দিয়েছিল বলে অদ্রিনাথ যখন বাড়ি এসে ফুঁসছিলেন, চন্দন অনায়াসে বলে দিয়েছিল, তুমিও ঠিক কাজ করোনি বাবা।

www.boiRboi.blogspot.com

তোমার খারাপ লেগেছে, তুমি ফেরত দিয়ে দিতে পারতে। বাইরে ফেলে দিলে কেন ?

অদ্রিনাথ হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন, বেশ করেছি ফেলেছি। মাস্টারমশাই-এর হাতে মদের বোতল রাখতে দেওয়া মাস্টারমশাইকে অপমান করা নয় ?

—অপমান কেন ? সে তো একটা কাগজে মোড়া জিনিস তোমাকে রাখতে দিয়েছিল, মদের বোতল বলে দেয়নি। তাছাড়া সে তোমার পুরনো ছাত্র, এখন যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক, ব্যক্তিগত জীবনে সে কি করছে না করছে তোমার দেখার কথা নয়। আমার মনে হয় তোমার থেকেও তার অপমান বেশি হয়েছে। বাসসুদ্ধ লোকের সামনে... তা ছাড়া অতগুলো টাকা দিয়ে কেনা...

লাজু তখন সবে কৈশোর ছাড়িয়েছে। সে বলেছিল, দাদা, তুই হলে মাস্টারমশাই-এর হাতে ওভাবে মদের বোতল রাখতে দিতিস ?

চন্দন উত্তর দিতে পারেনি। অদ্রিনাথ শুষ্ক হাসি হেসেছিলেন, তোর দাদার মনে ঘুণ ধরে গেছে। ও এবার উন্নতি করবেই।

পুরনো কথা ভাবতে গিয়ে দুপুরটা তেতো হয়ে যাচ্ছিল লাজুর। হাল্কা হওয়ার জন্য খোঁচাল কৃষ্ণাকে, অ্যাই, তুই বিয়ে করবি না ?

—তোর সাহস তো কম নয় ! তুই এখনও অন্যকে বিয়ে করতে বলিস ?

—সবার জীবন কি একরকম হয় রে ? তুই এখন ভাল চাকরি করছিস, এবার একটা রাঙা টুকটুকে গৃহকর্মে নিপুণ বেকার ছেলেকে বিয়ে করে ফেল। বিজ্ঞাপন দিয়ে দ্যাখ, লাইন লেগে যাবে বাড়িতে।

দ্বিপ্রাহরিক সূর্য পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করেছে। তেজী পুরুষের মতো রোদ্দুর এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। চিড়িক পিড়িক চড়ুই খুনসুটি জুড়ছে রোদের সঙ্গে। পুরুষরোদে গা ভিজিয়েই ছায়ায় ছুটে পালাচ্ছে। বাতাস হাসছিল ফিকফিক।

বালিশ বুকে চেপে উপুড় হল কৃষ্ণা, একবার খুউব বিয়ে করার শখ হয়েছিল। বছর দুয়েক আগে দাদারা কিছু করবে না তাই নিজেই দিলাম খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। পাত্রী সরকারি চাকুরিরতা। বয়স পঁচিশ। কমিয়েই লিখলাম। নিজেকে তো কালো বলা যায় না, তাই লিখলাম উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মেয়েদের লম্বা চওড়া লিখতে নেই, তাই স্বাস্থ্যবতী, উচ্চতা পাঁচ সাত। পাত্র সরাসরি যোগাযোগ করুন।

—রেজাল্ট পেলি ?

—পাইনি আবার ! দিস্তে দিস্তে চিঠি। বিপত্নীকদের বাদ দিলাম। পঁয়ত্রিশের ওপরে যারা ছিল, তারাও আউট। প্রবাসী বাতিল। তিনটে চিঠি ছিল মাহিনা উল্লেখ করিয়া যোগাযোগ করুন। সেগুলো কুটিকুটি করে ছিঁড়লাম।

—তারপর ?

—তারপর ঝাড়াই বাছাই করে গোটা পনেরো ইন্‌ল্যান্ড ছাড়লাম। দুজন

এসে মাকে দেখেই পালাল। পাঁচজন আমার থোবড়া দেখে। এক মক্কেল প্রথমেই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স জানতে চায়, সেটাকে চা পর্যন্ত দিইনি। বাকিগুলো সব আরও স্যাম্পেল্। কারুর ইয়া কোদাল কোদাল দাঁত! কারুর নাক মুখ চোখ সব ভুল ভুল জায়গায় বসানো। একটা তো বেঁটে এইটুকুনি। গুট্‌গুট্টি। বাবু আবার গর্বের সঙ্গে বলে আমি দেড় মিটার। কলকাতায় এত ডিফর্মড চেহারার মানুষ আছে বিজ্ঞাপন না দিলে দেখতে পেতাম না মাইরি। মিউজিয়ামে রাখলে মমিরাও লজ্জা পেয়ে পিরামিডের তলায় ঢুকে যাবে।

—তুই! তুই লোকের খারাপ চেহারা বলে...!

—আলবত। আমাকে যদি খারাপ চেহারা বলে ছেলেরা রিজেক্ট করতে পারে, আমি কেন পছন্দসই চেহারা ছাড়া বিয়ে করব? দুটোকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল, তারা আবার আরেক পদের! বিয়ের আগে মেলামেশা করে একটু টিপেটুপে দেখতে চায়! সব কটার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত। দূর শালা, বিয়েই করব না। মা মরে গেলে একটা বাচ্চা অ্যাডপ্ট করে নেব, দিব্যি কেটে যাবে, কী বলিস? একটাই শুধু প্রবলেম। বাড়ি। কৃষ্ণা চিত হয়ে ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকাল, একা একটা মেয়েকে কেউ এখনও বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। কেন দিতে চায় না বল্ তো? একা মেয়ে মানেই বাজারের মেয়ে? অথচ একা ছেলে মানে বোহেমিয়ান! রোমান্টিক! কত বাড়ি খুঁজেছি রে একসময়!

—তোরা গড়িয়ার বাড়িটা ছাড়লি কেন?

—দাদারা সব আলাদা হয়ে গেল যে। বাড়িঅলা রোজ পেছনে লাগত, তোমরা উঠে গেলে আমার বড় ছেলে থাকবে। আমাদের উঠোনে ময়লা ফেলছে। যখন তখন জল বন্ধ করে দিচ্ছে। মা একা সারাদিন কাঁটা হয়ে থাকে। কাঁহাতক পারা যায়? এই বাড়িঅলাও তো প্রথমে আমাকে দেখে ভাড়া দিতে চায়নি। শেষে বাবুনকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ থেকে এনে, শিখণ্ডী খাড়া করে তবে না ঠাঁই মিলল। বাবুন এখানে থাকে না তো কি, ব্যাটাছেলের নামে তো বাড়ি দিয়েছে! ভাবলাম কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হব, মা-র সেরিব্রাল হয়ে গেল। বাড়িঅলা মাঝে মাঝে মাকে দেখতে আসে। আমি তো জানি ওটা বুড়োর ছল। ব্যাটা দেখতে আসে নির্মলা দেবীর আর কদ্দিন! এখন তো তুলতে পারবে না, মা গেলেই গলাধাক্কা দেবে।

লাজু শঙ্কিত হল, কী করবি তখন?

পাশবালিশ শূন্যে ছুড়ে লুফল কৃষ্ণা, ব্যবস্থা একটা করছি। সরকারি ফ্ল্যাটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। মনে হয় শিগ্‌গিরই পেয়ে যাব। আমাদের কালীতলার রঞ্জুর বর হাউজিং-এ আছে, ওই একটা ম্যানেজ করে দিচ্ছে। ডানকুনিতে। যদি পেয়ে যাই, বুড়োকে এক কাঁদি কাঁচকলা প্রেজেন্ট করে যাব। আরে ভাই, দুবেলা ভাত জোটানোর ক্ষমতা যখন আছে, কিসের পরোয়া?

জীবন এত সহজ! এত স্বাভাবিক! লাজুর ঠিক প্রত্যয় হচ্ছিল না। হেলায়

www.boiRboi.blogspot.com

সমস্ত সমস্যাকে অগ্রাহ্য করছে কৃষ্ণা। নাকি বেঁচে থাকার জটিলতা আদতে সরলই! শুধু দৃষ্টিভঙ্গির তফাতে অনর্থক জট পড়ে যায় জীবনে।

পঙ্কজ পাশের ঘর থেকে চিৎকার করছে, ও মামি, ও মাসি, দিদিমা আসছে গো! সঙ্গে ও বাড়ির মামি! সাদা ট্যাস্‌কি থেকে নামল!

কৃষ্ণা দৌড়ে গ্রিলের দরজা খুলেছে। প্রতিভা লাজুর কাঁধে ভর দিয়ে চৌকিতে এসে বসলেন। ঘামছেন দরদরিয়ে। অনুরাধার কপালে সিঁদুরের টিকা, লালপাড় গরদের শাড়ি খোঁপার ওপর ঘোমটার মতো হয়ে আছে।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, কপালে এত সিঁদুর লেপে কোথ্‌থেকে আসছেন বৌদি?

অনুরাধা কোমরে গোঁজা রুমাল দিয়ে ঘাড়গলা মুছল, সেই কোন সকালে বেরিয়েছি। মা তো একেবারে কাহিল হয়ে গেছেন।

—হব না? প্রতিভা হাঁপাচ্ছেন এখনও, একটা নয়, দুটো নয়, ছ ছটা মন্দির! দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু! এত আমার সয়?

লাজু বলল, হঠাৎ এত ভক্তির বাড়বাড়ন্ত যে?

অনুরাধা বলল, তুমি হয়তো মানো না, আমি বাবা ঠাকুরদেবতা মানি। ছটা মন্দিরেই মানত করলাম। রাজার জন্য।

লাজুর বলতে ইচ্ছে হল ঠাকুরদেবতা কি রাজার হয়ে পরীক্ষা দেবে? নাকি মানত করলে রাজার স্মৃতিশক্তি প্রখর হবে? বলল না, কিন্তু গলায় খোঁচা এসে গেল, মাকে বাদ দিতে পারতে! মাকে দেখলে কি তোমার ঠাকুরদেবতারা বেশি খুশি হয়?

অনুরাধা ভ্রূকুটি হানল, তুমি আমাদের কথা না ভাবতে পারো, আমরা ভাবি। মা তো তোমার জন্য দুরাত্তির ঘুমোতেই পারেনি। তুমি সোজা ও বাড়ি গেলে মাকে আজ এত ছুটতে হত না।

লাজু মাকে জড়িয়ে ধরল। ঘাম নিঃসরণের পর প্রতিভার শরীর শীতল এখন। লাজু গাঢ় গলায় বলল, আমি কালপরশুর মধ্যেই যেতাম মা। এখানে একটু থিতু হয়ে নিয়ে... টিউশনিতেও তো যাওয়া হয়নি কদিন।

—থিতু ফিতু বুঝি না। অনুরাধা চৌকির এক পাশে বসেছে, তৈরি হয়ে নাও, তুমি এখন আমাদের সঙ্গে যাবে।

—তা কি করে হয়? লাজু এড়াতে চাইল অনুরাধাকে, সারাদিন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছ, নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি। পঙ্কজকে বলছি দুটো ভাত চড়িয়ে দিতে। খেয়ে টেয়ে একটু হাঁফ জিরোও।

প্রতিভা স্মিত মুখে বললেন, নারে, আমরা মিষ্টি টিষ্টি খেয়েছি। এই অবেলায় আর ভাত খাব না।

কৃষ্ণা দরজায় দাঁড়িয়েছিল, বলল, তা হলে একটু চা করে আনি?

অনুরাধা বলল, না না, চা ফার ঝামেলা করতে হবে না ভাই। অনেক বেলা হয়ে গেছে, রাজা বাড়িতে একা...। লাজু, তুমি গুছিয়ে নাও সব। এক্ষুনি

ফিরব। পঙ্কজও যাবে তো সঙ্গে ? পঙ্কওওজ, রেডি হয়ে নে বাবা। আজ শনিবার। ফিরবার সময় বড় ঠাকুরের থানেও একটা পুজো দিয়ে যাব।

অনুরাধা এই ভাবে টানাটানি শুরু করবে, লাজু ভাবতেও পারেনি। সে কাতর চোখে কৃষ্ণার দিকে তাকাল। কৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে হাল ধরে নিয়েছে, বৌদি, আমি একটু আপনাদের কথায় নাক গলাব ? লাজু এখানে এসে আছে বলেই বলছি। আপনাদের সঙ্গে লাজুর কি কোনও ঝগড়া আছে ?

অনুরাধার কপালে ভাঁজ পড়ল।

—আপনাদের বাড়িতে গেলে লাজুকে খাওয়ানো পরানোর ক্ষমতা আপনাদের আছে ?

অনুরাধার ভাঁজ বাড়ছে।

—আপনারা লাজুর আপন জন, আপনাদের কাছে গেলে লাজু অনেক ইজি থাকতে পারে ?

অনুরাধার ভাঁজ আরও ঘন, পারেই তো। লাজুর দাদা লাজুর জন্য প্রাণ দিতে পারে।

—লাজুও নিশ্চয়ই জানে সে কথা। তবু লাজু আপনাদের বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে উঠেছে। এর মানেটা কি আপনি আন্দাজ করতে পারছেন না বৌদি ? লাজু যে কোনও কারণেই হোক আপনাদের ওখানে থাকতে চায় না। এর পরও কি আপনার জোর করা উচিত ?

সরল সত্য এত সোজাসুজি বলতে পারে কেউ ? ধাক্কা সামলাতে অনুরাধার সময় লাগল।

প্রতিভা বললেন, থাক না অনু। ও যদি এখানে ভাল থাকে, এখানেই থাক। ওর মুখচোখ দেখছ না ? তিন চার দিনেই কত ঝকঝকে হয়ে গেছে ?

অনুরাধা আহত স্বরে বলল, লাজু, তোমাকে আমি জোর করব না। তবে তোমার সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা বলতে চাই। তুমি একবার বারান্দায় আসবে ?

কৃষ্ণা বলল, বারান্দায় কেন বৌদি ? আপনারা মা-র ঘরে গিয়ে কথা বলুন না। মা কিছুই বুঝতে পারে না।

নির্মলা বোবা চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে, দু জোড়া পায়ের শব্দেও চোখে সাড়া নেই। অনুরাধা সেদিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর অকারণ গলা নামিয়ে বলল, লাজু, তোর দাদা তোর ব্যাপারে ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছে। পরশু রাত্তির থেকে কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলছে না। রাজার সঙ্গেও না।

...লাজু চন্দনের মুখটা দেখতে পাচ্ছিল। বিবর্ণ গুটিয়ে যাওয়া মুখ। লাজুর চোখে চোখ রাখতে পারছিল না চন্দন।...

অনুরাধা লাজুর হাত ধরল, জানিসই তো তোর দাদার প্রেশারটা বেশির দিকে। কোলেস্টেরলের অবস্থাও ভাল নয়। তোর জন্য যদি লোকটার স্ট্রোক

www.boiRboi.blogspot.com

ফোক হয়ে যায়! আমার বুক কাঁপছে রে।

...স্খলিত পায়ে কৃষ্ণাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে চন্দন। মাথা মিশে গেছে বুকের সঙ্গে।...

অনুরাধার স্বর করুণতর, সাত্যকির সঙ্গে কি কোনওভাবেই মিটমাট করে নেওয়া যায় না ? বেসিক্যালি সাত্যকি ছেলেটা খারাপ নয়! হ্যাঁ, মানি তার অনেক দোষও আছে। চালবাজ। সুবিধেবাদী। সে আজকাল কে নয় বল্ ? এর মধ্যেই একটু মানিয়ে গুনিয়ে... সে তার মতো থাকুক, তুই তোর মতো থাক।

লাজু অনেকক্ষণ পর কথা বলল, সাত্যকিকে তুমি কতটুকু চেনো ? দাদার সম্পর্কে সাত্যকি কি বলেছে জানো ? জানো না। এই লোকগুলোকে বাইরে থেকে দেখে তুমি কিছু ধরতে পারবে না। কী নীচে নেমে গেছে এরা! একটা নোংরা সিচুয়েশানকে গার্ড দিয়ে, তাই নিয়ে আমাকে কুৎসিত গালিগালাজ...! লাজু দম নিল, দাদার সম্পর্কেই বা কতটা জানো তুমি ? দাদা কোথায় যায় ? কী করে... ?

—তোর দাদার কথা এর মধ্যে আসছে কেন ?

—দাদাকে নিয়েও তো সাত্যকি আমাকে কম কথা শোনায়নি! একত্রিশে ডিসেম্বর অফিসট্যুরের নাম করে দাদা কোথায় ছিল জানো ?

অনুরাধা যেন ঈষৎ চমকে উঠল, জানি।

—জানো! তুমি জানো!

—তোমার দাদা আমার কাছে কিছু গোপন করে না। সে অফিসের কাজে যায়নি, এক বন্ধু তাকে জোর করে ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে গিয়েছিল... তোতা পাখির মতো বলে যাচ্ছে অনুরাধা, —সেখানে বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তোমার দাদাও তাই আটকে পড়ে। আমাকে খবর দিতে পারেনি। তার জন্য আমার কাছে সে ক্ষমাও চেয়েছে।

লাজু বোবা হয়ে গেল। চোখ থাকতেও যে মানুষ তাকাতে চায় না, জোর করে কি তার দৃষ্টি উন্মোচিত করা যায়!

অনুরাধা হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে। কয়েক পলক নিরীক্ষণ করল লাজুকে, তারপর শিথিল স্বরে প্রশ্ন করেছে, তোর দাদার নামে সাত্যকি বাজে কথা বলল, আর তুই সেটা বিশ্বাস করে নিলি ? দাদাকে সন্দেহ করতে এতটুকু বাধল না তোর ? যে দাদা তোকে এত ভালবাসে! তোর জন্য এত করেছে!

লাজু অনুরাধার হাত চেপে ধরল, বিশ্বাস করো বৌদি, আমিও দাদাকে ভালবাসি। খুউব ভালবাসি। তা বলে দাদা যদি কোনও বড় অন্যায় করে, আমি কি করে সেটা মেনে নেব ?

—চুপ। অনুরাধা সহসা স্থানকাল ভুলে চিৎকার করে উঠেছে, তোর দাদার সম্পর্কে তোর মুখ থেকে আমি একটা কথাও শুনতে চাই না। আমাকে বলবি না। আমাকে কিচ্ছু বলার চেষ্টা করবি না তুই। অনুরাধা হাত ছাড়িয়ে ছিটকে

বেরিয়ে গেল। তার মুখ রৌদ্রের মতো অগ্নিময়। প্রায় ছুটতে ছুটতে গাড়ির দরজা খুলে সিটে বসেছে। জোরে জোরে শ্বাস টানছে। ছাড়ছে। লাজুর কথা ছুড়ে ফেলে দিতে চাইছে মন থেকে।

ড্রাইভার সিটে বসে ঢুলছিল, অনুরাধার শব্দে চমকে উঠেছে, ম্যাডাম, মা যাবেন না ?

প্রবল ভাবে দু দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে স্থিত করল অনুরাধা। সশব্দে গাড়ি খুলে আবার কৃষ্ণাদের বাড়িতে ঢুকেছে, মা চলুন।

কৃষ্ণা প্রতিভাকে গাড়িতে তুলে দিল। হতচকিত প্রতিভা পিছন ফিরে বার বার লাজুকে খুঁজছেন। অসহায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। লাজু, তখনও নির্মলার ঘরে নিস্পন্দ। দাঁড়িয়ে।

অনুরাধা গাড়ি অব্দি এসেও আবার ভেতরে গেছে। লাজুর সামনে গিয়ে আক্রান্ত নাগিনীর মতো ফণা তুলল, নিজের ঘর ভেঙেও শান্তি হয়নি, এখন আমার ঘর ভাঙতে চাস তুই ?

বারো

—হল কী রায়চৌধুরী, বোর্ডমানিটা ফেলুন !

—দিইনি বুঝি ? অনুরাধা আর মা আজ লাজুর কাছে গেছে। অন্যমনস্ক চন্দন টাকার বান্ডিলে হাত রাখল, ভুলে গেছি। সরি।

—প্রতিবারই তো ভুলে যাচ্ছ হে !

—রায়চৌধুরীদার ভুলো মন। অভিষেক রঙ্গ করল, —নেওয়ার সময় নয়, দেওয়ার সময়। তাই না দাদা ?

—ছি, এমন করতে নেই ভাই। কিছু অন্তত দাও, আজ তো তোমার শুধুই আসছে। মাঠে ট্রেবল লাগিয়ে দিলে ! ভাবতেও আমার পা কাঁপছে। কোথ্‌থেকে টিপস্ পাও বলো তো ?

—সিক্রেট সোর্স ভাই। আন্ডারওয়াটার কানেকশান। তনুময় চ্যাটার্জি চোখ মারল, আজ কিং মিডাসের কপাল যাচ্ছে রায়চৌধুরীর ! যা টাচ করছে, তাই সোনা। পর পর কটা ফুলবোর্ড মারলেন খেয়াল আছে ?

চন্দন তাঁস বাঁটতে শুরু করেছে। এক এক এক এক এক। দুই দুই দুই দুই দুই। তিন তিন তিন তিন তিন। লাজুর সঙ্গে আজ কী কথা হচ্ছে অনুরাধার ?

অভিষেক ভারিক্কি মুখে সিগারেট ধরাল, বছরটাই রায়চৌধুরীদার দারুণ যাচ্ছে। লাস্ট মান্‌থে রুটিন চেক করতে গিয়ে তিন তিনখানা পেল্লাই কাতলা জালে উঠে এল ! আমাদের শালা নলরাজার কপাল। পোড়া শোলমাছ ওই পারুলিয়ার কেস্...

—শুধু বছরের শুরুটাই যা স্লাইট খিঁচ মেরেছিল, তাই না রায়চৌধুরী ?

www.boiRboi.blogspot.com

প্যাকের তাস পাশে সরিয়ে রাখল চন্দন। কটমট করে তনুময়ের দিকে তাকাল, ফালতু কথা না বলে খেলুন।

উপুড় করা তাসে হাত ছোঁওয়ালো তনুময়। গ্লাসে চুমুক দিল, গো। শুদ্ধশীল হাতের চেটো টেনিস র‍্যাকেটের মতো দোলালো, চলুক।

সৌরেন মণ্ডল দোহারকি দিল, চলুক।

অভিষেকও একটা দশ টাকার নোট রাখল, গো।

পাঁচ নেশাড়ুর তিন তাসের আসর তুঙ্গে উঠছে ক্রমশ। জুয়ার টেবিলে টাকার স্তূপ। সুরা আর সিগারেটে ক্লাব টেন্ট ম ম। সন্ধ্যা মন্দির।

শুদ্ধশীল অন্ধের মতো হারতে রাজি নয়। ছ রাউন্ড টাকা ছুড়ে তাস খুলল। বেজার মুখে বলল, —প্যাক্।

দেখাদেখি সৌরেনও তাসে হাত রেখেছে। তাস তিনটেকে ঠোঁটের কাছে এনে ছোট্ট চুমু খেল। জাপানি পাখার মতো খুলছে তাস। হরতনের তিন সাত গোলাম। ঝটিতি দ্বিগুণ টাকা ফেলল বোর্ডে, চলুক।

চন্দন তনুময় আর অভিষেক নড়ে বসল। তারা অন্ধ খেলে চলেছে। শুদ্ধশীল লুব্ধ চোখে লক্ষ করছে খেলোয়াড়দের প্রতিক্রিয়া। সৌরেনের মুখ ক্রমশ লাল। চাপা উত্তেজনায় পুরো গ্লাস গলায় ঢেলে দিল।

তনুময় নির্বিকার, আপনার ছেলের প্রিপারেশান কেমন হল রায়চৌধুরী ?

লাজুর আজ কী কথা হল অনুরাধার সঙ্গে ! নিশ্বাস চেপে চন্দন দার্শনিকের ভঙ্গিতে বোর্ডে টাকা দিল, মনে তো হয় ভালই হয়েছে। খুব তো পড়ে দিনরাত। এখন পরীক্ষায় কী হয় !

—আপনার ছেলে ঠিক স্টার পেয়ে যাবে।

—ডোন্ট বি সো শিওর অভিষেক। ভাল রেজাল্টের অনেক হার্ডল আছে। কোয়েশ্চেন কেমন হয়, খাতা কোথায় যায়, কে দেখে, খাতা মুদির দোকানে কিম্বা রেলের বাঙ্কে পড়ে থাকে কিনা... তাছাড়া পরীক্ষায় একটা চান্স ফ্যাক্টর তো থাকেই।

—কারেক্ট। চান্স ফ্যাক্টরটাই বড় কথা। যে মাস্টার খাতা দেখবে সে যদি অফমুডে থাকে ! ধরুন তার বউ তাকে খুব রগড়েছে, ব্যস্ আপনার ছেলের হয়ে গেল ! এমনিতেই টিউশ্যনি আর কোচিং করে করে মাস্টারগুলো সব টায়ার্ড থাকে... ব্যাটাদের মাইনের স্কেল যত ভাল হচ্ছে তত টাকার খাঁই বাড়ছে।

—মাস্টাররা কোরাপ্ট হলে দেশের আর কী থাকে চ্যাটার্জিদা ?

চন্দনের ঝিম্ চোখের ওপর দিয়ে একটা শরীর দুলে দুলে চলে গেল। লিকলিকে। লম্বা। অদ্রিনাথ। অশান্ত পায়ে স্কুলের করিডোর ধরে হাঁটছেন মানুষটা। স্কুলের দেওয়ালে সার সার পোস্টার। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হোক।

চন্দন বিড়বিড় করল, শুধু কী কোরাপ্‌শান ? এডুকেশান সিস্টেমটাই নষ্ট

হয়ে গেছে। সেই সত্তর থেকে।

—আর যারা নষ্ট করেছিল তারা এখন বসে বসে ফ্ল্যাশ খেলছে। শুদ্ধশীল ভেংচে উঠল, কী হে সৌরেন, বিপ্লব শিকেয় তুলে এখন মাল খেতে কেমন লাগে ?

সৌরেনের লাল মুখ আরও লাল, চালবেন আপনারা ? না টেবিল উল্টে দেব ?

খেলতে খেলতে কথা। খেলতে খেলতে গ্লাসের টুংটাং। খেলতে খেলতে নেশা চড়ছে পাঁচজনের। একেবারে ফুলবোর্ডের মুখে এসে তাস দেখল তনুময়, ধুস। আমি আর নেই।

শুদ্ধশীল ঝুঁকে টাকা গুনল, হয়ে গেছে।

তিন হাতের তাস সোজা হচ্ছে। অভিষেকের হাতে চিড়েতনের সাহেব, হরতনের বিবি, রুইতনের গোলাম।

চন্দন নিজের তাস দেখে চোখ বুজে ফেলল। ইস্কাবনের দুই তিন চার। আবার জিত। পর পর চার বার।

রাত বেশি নয়, মেরে কেটে আটটা। ময়দান ঝিমোনোর তোড়জোড় করছে। আঁধার মাঠে আলোকময় তাঁবু লাইটহাউসের মতো দীপ্যমান। তাঁবুঘরে দুই ছোকরা নাগাড়ে টেবিল টেনিস খেলে চলেছে। ক্যারামবোর্ডে শব্দ বাজছে টকটক টকাটক। পাশের তাসটেবিলে আরেকটা হুইস্কির বড় বোতল এল। টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন।

চন্দনের হাই উঠছিল। দুপুর থেকে অবিরাম জিতে একটু যেন ক্লান্তি আসছে এবার। জয়ের চাপে উদ্বেগ পিছু হঠছে। স্নায়ুরা শিথিল থেকে শিথিলতর। আজ একটুও জেতার স্পৃহা নেই, তবু টাকারা যেন তাড়া করে চলেছে তাকে। পরশু রাজার পরীক্ষা শুরু, আজ শনিবারের জুয়ার আসরটায় না বসলেই ভাল হত। বাড়ি ফিরে না হয় রাজার কাছে বসত খানিকক্ষণ। ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে টাকা জোগানো ছাড়া চন্দনের কোনওদিনই কিছু করণীয় নেই। শৈশবে রাজাকে স্কুলে ভর্তি করা থেকে এই মাধ্যমিক পর্যন্ত অনুরাধা একাই একশো। তবু বাবা হিসাবে তো দায় থাকেই। অদ্রিনাথ চন্দনের লেখাপড়া নিয়ে কখনও তেমন মাথা ঘামাতেন না, চন্দন নিজে নিজেই পড়ত। একমাত্র পরীক্ষার আগে ঘাড়ের কাছে বাবার নিশ্বাস অনুভব করত চন্দন। ভয় পেত ঠিকই, আত্মবিশ্বাসও তো পেত অনেকটাই। ওই নিশ্বাসে শুধু শাসন নয়, এক ধরনের নৈকট্যও থাকে। বাবা ছেলের। রাজা যা চায় তার থেকে অনেক বেশি রাজাকে দিয়েও ছেলের কতটুকু কাছে যেতে পেরেছে চন্দন!

পর পর দু বোর্ড হেরে চন্দন আলগা স্বস্তিবোধ করল। খুব বেশি নয়, বড় জোর পাঁচ সাতশো, তবু যেন দম নেওয়া যাচ্ছে একটু।

—তাস ঘুরছে। তাস ঘুরছে। শুদ্ধশীল বেশ উত্তেজিত। মনে হয় লেডি

www.boiRboi.blogspot.com

ফরচুনের আমাদের দিকে চোখ পড়েছে।

—আপনার তো মশাই মুরগির কলজে। জিতলেও পাঁচশো, হারলেও পাঁচশো। লেডি ফরচুন আপনাকে আর কী দেবে ? তনুময় প্লেট থেকে বাদাম ভাজা তুলে মুখে ছুড়ল, রায়চৌধুরী, আপনার ছেলের পরীক্ষা কবে শেষ হচ্ছে ?

—রিটন্ পরীক্ষা বাইশ। তারপর ওয়ার্ক এডুকেশান আছে।

—আমার ছেলেমেয়েরও অ্যানুয়াল হয়ে যাচ্ছে, চলুন না সামারে নর্থ ইন্ডিয়া ঘুরে আসি। গিন্নি খুব সিমলা সিমলা করছে। নর্থবেঙ্গলের মেয়ে তো, একদম কলকাতার গরম স্ট্যান্ড করতে পারে না।

—দেখি। বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না চন্দনের। অনুরাধা এ বছর কেদারবদরি যেতে চায়, নিজের হাতে মন্দিরে পুজো দেবে। রাজার জন্য। প্রতিভারও খুব তীর্থ করার শখ। বদরিনাথ নিয়ে সমস্যা নেই, কিন্তু কেদারে কি মাকে নিয়ে যাওয়া যাবে! প্রতিভা চাইলে অবশ্যই ডুলি ভাড়া করবে চন্দন। যতই অসুবিধা হক তাঁকে এবার না নিয়ে চন্দনদের উপায়ও নেই। অন্য সময় লাজুর কাছে প্রতিভাকে জমা রেখে যাওয়া যায়। এবার তো তা চলবে না। কী যে কাণ্ডটা করল লাজু!

পলকে লাজুর মুখ চন্দনকে ঝাপটা মেরেছে। কী পাথর-চোখে লাজু প্রত্যাখ্যান করল চন্দনকে! —তুই আমার কাছে আর আসিস না দাদা। মাকে যদি দেখতে ইচ্ছে হয়, আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব।

লাজু সব জানে। সাত্যকি কথা রাখেনি। লাজুও অনুরাধাদের সব বলে দেবে! চন্দনের বাড়ি ফিরতে পা সরছে না আজ।

আরও তিনটে ডিল্ হারল চন্দন। ঝাঁকুনি খেয়ে মস্তিষ্ক সতেজ আবার। হঠাৎই প্রাণপণে জিততে চাইছে খেলায়। দাঁতে দাঁত কষে টাকা লাগিয়ে যাচ্ছে। টেক্কা টপে লড়ে গেল পুরো বোর্ড। পর পর দুবার রান নিয়ে মার খেল। হচ্ছে না। কিছুতেই হচ্ছে না। তাস দেখে খেলছে। তাস না দেখে খেলছে। তাসে চুমু খাচ্ছে। তাসে টাকা ছোঁয়াচ্ছে। কোনও তুকতাকেই কিছু হচ্ছে না আর।

চন্দন হারছে। চন্দন হারছে।

ট্রেপলটোট্ চলে গেল। পার্স প্রায় শূন্য। বিবির জোড়া নিয়ে শেষবারের মতো লড়ল চন্দন। ফেল। শুদ্ধশীল টেক্কার জোড়া তুলে ছিনিয়ে নিল শেষ কপর্দক।

চন্দনের চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। তনুময়কে বলল, আমাকে হাজারটা টাকা দিন।

তনুময় সন্ন্যাসীর মতো হাসল, জুয়াবোর্ডের এথিকস্ তো আপনি মানেন রায়চৌধুরী! ধার ফার চলে না।

চন্দনের মেজাজ চড়ছিল— মাত্র হাজার টাকা দিতে পারবেন না!

পারশোনাল লোন হিসেবে দিন !

তনুময় রাগটাকে আমল দিল না, খেলার জন্য আমি এক পয়সা দেব না। বাইরে চলুন, ফেরার জন্য ট্যাক্সি ধরুন, দু হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

—আমি হেরে চলে যাব ? ইমপসিবল্। মণ্ডল, আপনি দিন তো। হাজার দিলে দু হাজার ফেরত দেব।

—পারব না ভাই। লাখ টাকা দিলেও নিয়ম ভাঙতে পারব না।

অভিষেকের গলা নেশায় জড়িয়ে গেছে, আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না দাদা। শুদ্ধশীল গুনগুন গান ধরেছে, দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন। ধরো হুইস্কি সোডা আর মুরগি মটন। কলে পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করছে চন্দন। মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুড়ল। কিংডম ফর এ হর্স ! কিংডম্ ফর এ হর্স !

চন্দনের মুখ দেখে ভয় পেয়েছে শুদ্ধশীল। ফিস ফিস করে তনুময়কে বলল, আজ এখানেই শেষ করুন। শালা একদম আউট হয়ে গেছে।

মাতালের কান কখনও কখনও প্রখর হয়ে ওঠে। চন্দন শুদ্ধশীলের দিকে ফিরে গর্জে উঠল, —চোপ। আমি আউট হইনি। আমি খেলব।

সৌরেন টাকা গুছিয়ে উঠে পড়েছে। অভিষেক আর তনুময়ের ওঠার ইচ্ছে ছিল না, তাদেরও উঠতে হয়েছে অগত্যা। ঘরের অন্যান্য সকলে পান ও খেলা থামিয়ে চন্দনদের দিকে অভিনিবিষ্ট ছিল, তাস পার্টিদের কলহ বিবাদ এমন কিছু নতুন নয়, খেলুড়েরা উঠে পড়েছে বলে তারাও নিশ্চিন্ত, নিজের নিজের গণ্ডিতে মগ্ন আবার।

চন্দন চেয়ারে শরীর ছেড়ে বসেই আছে, সৌরেন তার কাঁধে হাত রাখল, চলুন। ফিরবেন তো ?

বসন্তের মধুর হাওয়ায় বাইরের লন জমজমাট। ছড়ানো ছেটানো চেয়ারে তারিয়ে তারিয়ে মলয় সেবন করছে কেউ কেউ। কেউ বা রঙিন পানীয়। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ব্যবসায়িক লেনদেনের আলোচনাও চলছে কোথাও কোথাও। অভিষেক আর তনুময় নতুন করে লনে চেয়ার টেনে বসেছে। শুদ্ধশীল খেলা ভাঙতেই হাওয়া।

অনেকদিন পর চন্দনের আজ পা টলছিল। অন্য দিন ছ পেগেও খাড়া থাকে সে, আজ মাত্র তিন পেগে স্নায়ু শরীরের দখল হারিয়েছে। সৌরেনও পুরোপুরি সজ্ঞানে নেই।

নরেন্দ্র শর্মা চন্দনকে দেখে এগিয়ে এল, —আপনাকেই খুঁজছিলাম। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে দাদা।

চন্দন চোখ টান করল, কী কাজ ?

শর্মা মুঠো করে মুখে পানমশলা ফেলল, কাজটা অবশ্য আপনার সঙ্গে নয়, আপনার বোনের হাজব্যান্ডের সঙ্গে। ভদ্রলোকের তো ভাল পলিটিকাল ইন্‌ফ্লুয়েন্স আছে ?

—তা আছে। চন্দন প্রাণপণে জড়ানো জিভ যথাস্থানে রাখার চেষ্টা

www.boiRboi.blogspot.com

করছিল, কাউকে উচ্ছেদ করাতে হবে ?

—হ্যাঁ দাদা। শর্মা গদগদ, আপনার ওই কেসটাতে ভদ্রলোকের কিছু পাওয়ার দেখেছিলাম। বিশ লাখ টাকা দিয়ে জমিটা কিনলাম দাদা, কিছুতেই বস্তি ওঠাতে পারছি না। কদিন ধরেই আপনাকে বলব ভাবছি...

—ঠিক আছে। বলে দেব। চন্দনের মনে পড়ল সাত্যকি লাজুকে তার কীর্তির কথা জানিয়ে দিয়েছে। সাত্যকি কথা রাখেনি। দু চার পা এগিয়ে ফিরে দাঁড়াল চন্দন, একটু চেঁচিয়ে বলল, —আপনার সঙ্গে তো তার ভাল আলাপ হয়ে গেছে ! আপনি নিজেই গিয়ে বলুন না। কাজ হয়ে যাবে।

সৌরেন ডাকল, কাকে বলছেন রায়চৌধুরী ? শর্মা তো চ্যাটার্জিদের কাছে পৌঁছে গেছে !

—অ। চন্দন আলগা হেঁচকি তুলল, ঠিক হ্যায়। কোই বাত নেহি।

ঘাস মাড়িয়ে রাজপথে এসে দাঁড়াল দুজনে। ফুটপাথ ধরে নীরবে হাঁটছে। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সোডিয়াম বাষ্পের বাতিরা পৌঁছেও পৌঁছতে পারছে না নীচে। আলোছায়া জাল বুনছিল। ছুটন্ত হেডলাইটের দ্যুতি মাঝে মাঝেই ছিঁড়ে দিচ্ছে জাল। শুকনো পাতারা চমকে উঠছে।

ফোর্ট উইলিয়ামের মোড়ে এসে সৌরেন বলল, —দেখলেন রায়চৌধুরী, শুদ্ধশীল আমাকে কেমন অপমান করল !

চন্দন কিছুটা শান্ত হয়েছে, বাদ দিন।

—কেন বাদ দেব ? আমি সত্যিই এক সময়ে মুভমেন্ট করেছি ! ডেবরা গোপীবল্লভপুরের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছি ! চাষিদের দাওয়ায় কত রাত কাটিয়েছি জানেন ?

চন্দনের গলা আবার জড়িয়ে গেল, আরে, বাদ দিন।

—আপনি কোনওদিন রাজনীতি করেননি রায়চৌধুরী, আপনি বুঝবেন না। কত স্বপ্ন ছিল আমাদের। দেশে অভাব থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, বৈষম্য থাকবে না। স্টিংকিং রিচ থাকবে না। মানুষ তার ক্ষমতা মতো পরিশ্রম করবে, প্রয়োজন মতো আহার শিক্ষা বাসস্থান পাবে, তা শালা আমাদের কেউ পাত্তাই দিল না !

চন্দন সান্ত্বনার স্বরে বলল, আহা, বাদ দিন।

—বাদই তো দিয়ে আছি রায়চৌধুরী। গলা অব্দি পাঁকে ডুবে নাক টিপে দাঁড়িয়ে আছি। সৌরেনের গলা ডুবে গেল, খোঁয়াড়ের শুয়োরদের মতো দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি। তবে আপনাকে আজ বলে রাখলাম রায়চৌধুরী, ওই বেঁটে ভট্‌চাজ্ যাই বলুক, যদি সত্যি সত্যি বিপ্লব আসে, তখন এই মালখোর ঘুষখোর সৌরেন মণ্ডলকে আর আপনারা খুঁজে পাবেন না। বৌ বাচ্চার মায়া কাটিয়ে, আপনাদের হাত নেড়ে টা-টা করে চলে যাব।

চন্দন সৌরেনের কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, থাক, বাদ দিন।

—অ। বিশ্বাস হচ্ছে না ? শুনুন, যে সৌরেন মণ্ডলকে আপনি দেখেন সে

হল বিপ্লবী সৌরেন মণ্ডলের ছদ্মবেশ। বিপ্লবের সময়ে ছদ্মবেশ ছেড়ে...

তিনটে গুলি লেগেছিল সমীরণের। মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল সরু গলিতে। সমীরণ হতে পারেনি বলেই কি সৌরেন এত বাচাল? সমীরণ জানল না তার বন্ধুই তাকে...! নিজের গায়ে থুতু ছেটাতে ইচ্ছে করল চন্দনের। সৌরেনের মুখেও। আচমকাই ধমকে উঠল, কী হচ্ছেটা কী? বলছি না বাদ দিন?

সৌরেন হোঁচট খেল, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আপনি যখন এত করে বলছেন, বাদ দিচ্ছি। ট্যাক্সি ধরবেন তো?

কালীঘাট টেন্টের সামনে ছোট্ট জটলা। জটলার মধ্যে অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছেন। আবছা আলোতেও চন্দন দেখতে পেল তাঁকে।

অবিনাশও চন্দনকে দেখে এগিয়ে আসছেন। চন্দন প্রমাদ গুনল। সঙ্গে এক পেঁচি মাতাল, নিজেও ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়, এ অবস্থায় কি শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলা যায়?

ইতস্তত করে এগোল চন্দন, এখনও বাড়ি ফেরেননি?

অবিনাশও বুঝি জামাইয়ের হাল টের পেয়েছেন, খুব কাছে এলেন না, দূর থেকে বললেন, এই এবার ফিরব। ফুটবল টিম নিয়ে জরুরি মিটিং ছিল।

এই এক ধরনের মানুষ! আলাদা করে কোনও সাধ নেই, আহ্লাদ নেই, জীবনটাকেই গড়ের মাঠ বানিয়ে ফেলেছেন!

চন্দন বলল, সোমবার থেকে তো আপনার নাতির পরীক্ষা। জানেন তো আপনাদের পাড়াতেই রাজার সিট পড়েছে?

—জানি। যামিনীচরণ স্কুলে। রাজা সকালে এসে বলে গেছে।

—রাজা সকালে গিয়েছিল!

—হুঁ। তার দিদিমার কাছেও বসেছিল অনেকক্ষণ। বলল তুমি নাকি আজ গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছ। অনু তোমার মাকে নিয়ে সারাদিন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছে!

চন্দন পলকে টানটান। অনুরাধা আজ মাকে নিয়ে লাজুর কাছে যাবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরেও এসেছে ওরা!

অবিনাশ উদাস হলেন, অনু অনেক বদলে গেছে। খুব ভক্তিমতী হয়ে উঠছে দিন দিন।

অবিনাশের গলায় কি শ্লেষ? চন্দন বুঝতে পারল না। সহসা অবিনাশ গলা নামালেন, —আচ্ছা, রাজার কী হয়েছে বলো তো? ছেলেটাকে কেমন মেন্টালি ডিসটার্বড মনে হল?

—কেন? ঠিকই তো আছে। পরীক্ষার টেনশানে হয়তো...

—কী জানি বাবা। অবিনাশ স্বগতোক্তি করলেন, —ছেলের মুখচোখ আমার সুবিধের লাগল না। তোমরা কি ওকে বকাঝকা করেছ?

—নাহ্!

—অনু কি পড়া নিয়ে বেশি চাপ দিচ্ছে?

www.boiRboi.blogspot.com

—আপনার মেয়েকে তো আপনি জানেনই। ছেলে নিয়ে সবসময় একটু বাড়াবাড়ি করে ফ্যালে।

—উচিত নয়। ছেলে বড় হয়েছে, এখন তোমাদের বুঝে শুনে চলা দরকার। অবিনাশ অর্থপূর্ণ চোখে চন্দনের আপাদমস্তক দেখলেন। জরিপ করলেন সৌরেনকেও, চলি। পরে কথা হবে।

সৌরেন চন্দনকে টানল, এখানে ট্যাক্সি দাঁড়াবে না। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে যাই চলুন।

চন্দনের পা দুলে গেল। যে অফিসার শীলা সেনের ফ্ল্যাট থেকে তাকে ধরেছিল, এর মধ্যে দুদিন তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। ওই পার্ক স্ট্রিট মোড়েই। লোকটা চন্দনের সঙ্গে কথা বলেনি, পরিচিতের ভাবও দেখায়নি, তবু কী অশ্লীল হাসি খেলেছিল লোকটার ঠোঁটে।

হয়তো বা লোকটা হাসেওনি। চন্দন নিজেই কল্পনা করেছে হাসিটা। নিমেষে চন্দনের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। দুবারই। ভয়ে? নাকি লোকটা তার নগ্ন চেহারা দেখেছে, সেই অপমানে?

আরেকজনকেও ওই মোড়ে দেখেছে চন্দন। লাল শিফন। শাড়ির বদলে সালোয়ার কামিজ। একদিন স্কার্টব্লাউজ। কোমল বালিকা প্রায়। ভিড় মিনিবাসে ঠেলেঠুলে উঠে গেল মেয়েটা। চন্দনের দিকে ফিরেও তাকাল না।

সৌরেন যাবে যাদবপুর। চন্দনের পথের ওপর দিয়ে। চন্দন কায়দা করে সৌরেনকে কাটাল, —আপনি এগোন। চ্যাটার্জিকে একটা দরকারি কথা বলতে ভুলে গেছি, বলে আসি।

—দেরি না হলে ওয়েট করতে পারি।

—দেরি হবে। আপনি যান।

সৌরেন দূরে মিলিয়ে গেল। চন্দন বৃক্ষের মতো নিশ্চল। দীর্ঘ সময় পর অদ্ভুত এক মুক্তির অনুভূতি ছেয়ে যাচ্ছে শরীরে। দুপুরে চন্দন কত টাকা জিতেছিল? ট্যাক্স বাদ দিয়ে প্রায় ন হাজার। তাসের আসরে অঙ্কটা বেড়েছিল আরও। অত টাকা রোজ রোজ মুঠোয় আসে না। টাকাটাকে কী ভারী লাগছিল আজ!

এখন চন্দন নাঙ্গা ফকির।

চন্দন দৌড়ে রাস্তা পার হল। যুদ্ধের ট্যাঙ্ক পিছনে ফেলে নেমে পড়েছে ময়দানে। মাঠের প্রান্তে প্রচুর গাছপালা, অন্ধকারও বেশি নিবিড়। তমসাকে পর্দা করে আদিম খেলার মহড়া দিচ্ছে নরনারী। মাঠপরীরা ভেসে বেড়াচ্ছে ঘাসে। তাদের পার হতেই সামনে হুহু প্রান্তর। অতিকায় কচ্ছপের মতো শুয়ে। কচ্ছপের পিঠ মায়া জ্যোৎস্নায় মাখামাখি।

কচ্ছপের পিঠ বেয়ে চন্দন টলমল হাঁটছে। গঙ্গার দিক থেকে বাতাস ছুটে এল হা হা। মিঠেন। দামাল। শরীর ছুঁয়ে শিহরন তুলে চলে গেল মেট্রোস্টেশানের দিকে।

অকস্মাৎ চন্দনের গতি রুদ্ধ। এতকাল পর কোথ্থেকে আবার সামনে এসে ফণা তুলেছে সাপটা! কৈশোরের সেই শঙ্খচূড়!

চন্দন দরদর ঘামছে। কচ্ছপের পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে- টাল সামলাল। সাপ দুলছে মৃদু মৃদু। আজ আর রক্ষা নেই। ছোবল এবার মারবেই। চন্দন ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। চোখ খুলতেই মাঠ শুনশান। সাপ উধাও।

অদ্রিনাথ বলতেন, ভয়কে জয় করতে শেখ্ চাঁদু। ভিতু মানুষরা বড় লোভী হয়। আবার লালসার জন্যে কষ্টেও ভোগে বড়।

শৈশবের ভয় যৌবনের আত্মধিক্কার হয়ে এখন শুধু গ্লানি। না। মোটেই না। চাওয়া যদি নাই থাকে তবে মানুষ হয়ে জন্মানো কেন? বেঁচে থাকার লোভ ছিল বলেই না সাপটাকে ভয় পেয়েছিল চন্দন! আর ভয় বুকে নিয়েও তো দিব্যি দেড়ে মুশে এখনও ভোগ করছে জীবনকে! কাকে পরোয়া তার।

চন্দন ধীরেসুস্থে মাঠ পার হল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আলো নিভে গেছে। অনুপম স্থাপত্য এক অতিকায় প্রাণীর হাড়ের স্তূপ যেন।

চন্দন শার্টের একটা বোতাম খুলে দিল। লাজু তাকে ঘৃণা করে।

চন্দনের তাতে কাঁচকলা!

দ্বিতীয় বোতাম খুলল। অনুরাধা বিশ্বাস হারাবে। হারাক। চন্দন ভয় পায় না!

তৃতীয় বোতাম খুলল। মা ধরে ফেলেছে চন্দনের সাজানো চেহারা।

ধরুক। বয়েই গেল!

চন্দন এক সফল মানুষ। চন্দনের রাজা আছে।

শার্টের শেষ বোতামটাও খুলে দিল চন্দন।

তেরো

রাজার চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্নও পড়তে পারছে না সে, সব যেন দুর্বোধ্য খরোষ্ঠী লিপি। রাজা দুহাতে মাথা চেপে ধরল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে স্থিত করতে চাইছে নিজেকে। আজ তাকে পারতেই হবে।

মাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষার আজই শেষ দিন। আজকের পর আর শুধু ওয়ার্ক এডুকেশন বাকি। এ বছর প্রশ্ন নিয়ে কোথাও তেমন কোনও গুরুতর অভিযোগ নেই, অভিভাবক ছাত্রছাত্রীরাও মোটামুটি সন্তুষ্ট। অঙ্ক নিয়ে মফস্বলের দিকে মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল, তবে রাজ্যের কোথাও তেমন বড় গণ্ডগোল হয়নি।

মামার বাড়ির কাছে এক মাধ্যমিক স্কুলে রাজাদের সিট পড়েছে। মাঝারি মাপের স্কুল, দোতলা অসম্পূর্ণ, ঘরগুলোও কেমন খুপরি খুপরি। আলো

www.boiRboi.blogspot.com

বাতাস বেশ কম। রাজাদের ঘরে, তিরিশজন পরীক্ষার্থীর মাথার ওপর একটা মাত্র ঢাউস ফ্যান টিকটিক ঘুরছে।

রাজা ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাল। এ ঘরের পরীক্ষার্থীরা সকলে রাজাদের স্কুলের নয়, জনা দশেক অন্য স্কুলেরও আছে। সকলেরই কলম সচল। অয়ন সাগ্নিক কণাদ মাথা নিচু করে লেখা শুরু করেছে। দীপ কিছুক্ষণ সিলিং-এর দিকে তাকিয়েছিল, ঝপ করে ঘাড় নামাল খাতায়। পিছনের দেবাংশু অঞ্জনরা লেখাপড়ায় তেমন ভাল নয়, তারাও টুকটুক করে উত্তর লিখে চলেছে। শুধু রাজাই এ ঘরের ব্যতিক্রম।

রাজা উঠে দাঁড়াল, জল খাব স্যার।

দুই প্রহরীশিক্ষকের একজন সিগারেট হাতে বারান্দায়, দশাসই চেহারার অন্যজন প্রশ্নপত্র বিলি করে খবরের কাগজে তন্ময়। দশাসই পরিহাসের সুরে বললেন, পাঁচ মিনিটেই গলা শুকিয়ে গেল বাবা?

রাজা ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শিক্ষক নিজের হাতেই জলের জগ আনলেন, বেশি খেয়ো না। এরপর তো আবার ঘন ঘন বাথরুমে যাবে।

কয়েক ঢোক গলায় ঢেলে হাতের আঁজলায় জল নিল রাজা। চোখেমুখে ছেটাল। ঘাড়ে গলায় বোলালো জল হাত। মাথা ঝিমঝিম তবু যায় না।

প্রথম দিন থেকেই রাজার পরীক্ষা একদম ভাল হচ্ছে না। বাংলা পরীক্ষায় বাঙালি বিজ্ঞানীর জীবনীই রচনায় এসেছিল, লেখার সময় তাঁর বাবা মা-র নাম পর্যন্ত ভুলে গেল রাজা। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানও। শেষ পর্যন্ত ঘষে ঘষে অন্য রচনা লিখল। ছাত্রদের সামাজিক দায়িত্ব। কী যে লিখল রাজা নিজেই জানে না। অনুবাদ করতে গিয়ে সহজ ইংরিজির বাংলা প্রতিশব্দ মন থেকে নিখোঁজ। তাও ব্যাকরণের অংশ কণাদ আর সাগ্নিককে জিজ্ঞাসা করে লিখেছিল খানিকটা। কণাদ সাগ্নিকরাও যথেষ্ট সেয়ানা, সহজে মুখ খুলতে চায় না, তাদের বাড়িতেও একটা করে অনুরাধা আছে। মাঝখান থেকে বার বার কথা বলার অপরাধে শিক্ষকদের বকুনি খেল রাজা। অঙ্ক পরীক্ষার দিন তো তাকে উঠিয়ে অন্য স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হল। সহজ পরিমিতির অঙ্ক পারল না, অ্যালজেব্রায় পাঁচ নম্বর ভুল হল, জ্যামিতির এক্সট্রার চেনা ছবি কিছুতেই রাজা আঁকতে পারল না গুছিয়ে। সব মিলিয়ে অঙ্কে সত্তরও পাবে কিনা সন্দেহ। ফিজিকাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স মোটামুটি হয়েছিল, ইতিহাসের দিন আবার ব্রেন ফেল। মনকে বশে এনে সারারাত ইতিহাসের সাল তারিখ ঝালিয়েছিল, হলে এসেই সব স্মৃতি থেকে গায়েব। বিগড়ে যাওয়া মেজাজ জেদি হয়ে উঠেছে আজ। ভাল পরীক্ষা দিতে সে বদ্ধপরিকর, কিন্তু কিছুতেই কব্জা করতে পারছে না পেপারগুলোকে।

নতুন করে রাজা মনঃসংযোগ করতে চাইল। আবার গোড়া থেকে প্রশ্নপত্র পড়ছে। শান্ত মাথায়। ধীরে ধীরে। কালো অক্ষরের জট ছাড়ল একটু। এই

তো চেনা প্রশ্ন ! হাউ দা ডেজার্ট থর ওয়াজ ফর্মড্ ইন রাজস্থান ? রাজা আঙুলে কলম চাপল। কিভাবে যেন তৈরি হয়েছিল থর মরুভূমি ? বহুবার মুখস্থ করা উত্তর উগরে দিতে চাইছে। বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চ অফ সাউথওয়েস্ট মনসুন্ ডাজ নট রিচ ... কয়েক লাইন লিখে রাজা খেই হারিয়ে ফেলল। আর কী পয়েন্ট আছে ? আরাবল্লী রেঞ্জের সঙ্গে কি একটা সম্পর্ক আছে না ? আর সিনধ্ নিয়েও কী যেন মনে পড়ছে...কিছুতেই মনে পড়ছে না। রাজার স্মৃতিকোষ এখন ঊষর মরুভূমি।

উত্তর অসমাপ্ত রেখে রাজা দ্বিতীয় প্রশ্ন ধরল। হোয়াট ইজ আ গ্লেসিয়ার ? ইস, শুরুটা পেলেই লিখে ফেলা যাবে।

রাজা নিচু গলায় ডাকল, এই অয়ন, গ্লেসিয়ারের ডেফিনেশানটা একবার বল তো।

দশাসই ঘরের অন্য প্রান্তে ছাত্রদের খাতায় সই করছেন। সেদিকে তাকিয়ে নিল অয়ন। ঈষৎ ঘাড় বেঁকাল, ওই তো লেখ্ না স্নো লাইনের ওপরে হেভি স্নো ডিপোজিট হলে স্নো আর ফার্ন গ্র্যাভিটেশানের টানে জমাট বেঁধে যায় ...

—ওভাবে না। এগ্জ্যাক্ট শুরুটা বল্।

—অ্যাই, একদম কথা বোলো না। ধূমপায়ী শিক্ষক বারান্দার জানলা দিয়ে হুঙ্কার ছুড়লেন, সোজা হয়ে বোসো। একদম গুজগুজ ফুশফুশ নয়।

অয়ন চমকে সিধে হয়েছে।

রাজা সেকেন্ডে ভুলে গেল অয়নের উত্তর। খাতায় ঘাড় ঝুঁকিয়ে গুনগুন করল, আরেকবার বল্ প্লিজ, না না ঘাড় ঘোরাতে হবে না।

অয়ন ভীষণ মনোযোগ দিয়ে লিখে চলেছে।

রাজা বলল, বল নারে। এই অয়ন ?

অয়ন বধির।

রাজা অসহায় মুখে খানিকক্ষণ ডটপেন চিবোল। মরুক গে যাক, যেটা মনে আছে লিখবে। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে চোখ রাখল। ডিফাইন অ্যাভালাঞ্চে, বার্গস্রুন্ড। মুখস্থ সংজ্ঞা সঠিক সময়ে রিফিলের মুখে এসেও আসছে না। পাহাড়ে বরফের ওপর ক্রমান্বয়ে বরফ জমতে থাকলে অথবা হঠাৎ গরমে চাঁই চাঁই তুষার গলতে শুরু করলে টন টন পাথর বরফ গড়িয়ে আসে নীচে ! সেটাই তো অ্যাভালাঞ্চে ! আর বার্গস্রুন্ড্ হল গিয়ে পাহাড় আর বরফের মাঝের ফাটল !

যতটা সম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে উত্তর দুটো লিখল রাজা। আবার সব অন্ধকার। আফগানিস্তানের ভূপ্রকৃতি স্মরণে আসছে না। কলকাতা বন্দরের ক্রম অবনতির একটা কারণও মগজে নেই। আবহাওয়া জলবায়ুর পার্থক্যটুকু পর্যন্ত ভুলে হজম !

অ্যাভালাঞ্চে আর বার্গস্রুন্ড্ই বা কেন মনে থাকল ! বুকের ভেতর অনন্ত বরফ জমে আছে রাজার। পাহাড় আর বরফের মাঝে অতলস্পর্শী ফাটল নিরবচ্ছিন্ন

www.boiRboi.blogspot.com

ঘা মেরে চলছে মস্তিষ্কে।

বাবা জেল খাটছিল ! কোনও নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল বাবা !

দেয়ার মা বলল, রক্তের ধারা ! রক্তের ধারা !

দেয়ার সঙ্গে কত দিন দেখা হয়নি রাজার !

দেয়া রাজাকে ঘৃণা করে ! রাজার প্রিয় বন্ধু রাজাকে ঘৃণা করে ! রাজার বাবার জন্য !

রাজার বাবা মাতাল ! রাজার বাবা ঘুষখোর ! রাজার বাবা দুশ্চরিত্র !

দেয়া কী করছে এখন ? মন দিয়ে ভূগোলের উত্তর লিখছে ? গ্লেসিয়ার ! মরুভূমি ! ফাটল ! গতিময় কলম থামিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁকিয়ে নিচ্ছে চুল !

কণাদ পিছন থেকে স্কেলের খোঁচা দিল, অ্যাই সৌভিক, চুপ করে বসে আছিস কেন ? লেখ্।

ঢং করে ঘণ্টা বাজল। এক ঘণ্টা শেষ। এখনও পুরো দুটো পাতাও ভর্তি হয়নি রাজার। দেয়ার বাড়ি থেকে ফিরে অন্ধ রাগে রাজা উন্মত্ত ছিল সারারাত। রাগের তীব্রতা অনন্তকাল একই রকম থাকে না ; ক্রমশ তরল হয়ে ক্ষোভে পরিণত হয়। তারপরে আসে অভিমান। এক অন্তহীন অভিমান থকথকে মিউকাসের মতো হৃদয়ে ছেয়ে যায়। এবং অবশেষে এক দুঃখ খরস্রোতা পাহাড়ি নদী হয়ে বুক চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। তখন কি আর চোখের সামনে অক্ষরের অস্তিত্ব থাকে ? রাজা কত চেষ্টা করেছে পড়তে ! হয়নি। শূন্য সাদা পাতা খুলে বসে থাকা শুধু। মিনিটের পর মিনিট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনের পর দিন। লাভের মধ্যে আগে যা পড়েছিল তাও কেউ মুছে নিল স্মৃতিকোষ থেকে। ব্লটিংপেপার দিয়ে।

রাজার বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ছিটকে এল। হিমানী সম্প্রপাতের মতো। এত যন্ত্রণা তবু এই মুহূর্তে রাজার কেমন নিজেকে অপরাধী লাগছে ! বাবা ঘুষ খাক, মদ খাক, যা ইচ্ছে নোংরামি করুক, তার পিছনে কম টাকা তো খরচ করেনি লোকটা ! ফোঁটা ফোঁটা শক্তিক্ষয় করে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে মা ! এগুলো তো মিথ্যে নয় ! রাজা কি প্রতিদানে কিছুই দেবে না তাদের ?

না। হারবে না রাজা। আজ তাকে পারতেই হবে। যেমন করে হোক। আজ পরীক্ষায় এরকম অবস্থা হবে অনুমান করেই বেশ কয়েকটা নোটের পাতা ছিঁড়ে এনেছে সে। প্রশ্ন বেছে বেছে। ইতিহাসের দিনও এনেছিল, বার করতে সাহসে কুলোয়নি। এক হীনম্মন্যতাবোধ হাত চেপে ধরেছিল তার। আজ রাজা মরিয়া।

পকেটে হাত ঢোকানোর আগে রাজা চারদিক দেখে নিল ভাল করে। দুই প্রহরীশিক্ষক নিম্ন স্বরে গল্প করছেন, ধূমপায়ীর রসিকতায় হেসে উঠলেন দশাসই। ফার্স্ট বেঞ্চে উপবিষ্ট সাগ্নিক কাগজ নিল একটা। অংশুমান ছোট্ট করে আড়মোড়া ভাঙল। অন্য স্কুলের একটি ছেলে বাইরে থেকে ফিরে

রুমালে মুখ মুছছে। রাজা কম্পিত হাতে নোটসের পাতা বাঁ হাঁটুতে রাখল। বুকপকেট থেকে চুয়িংগাম বার করে চিবোল একটু, তারপর আঠাল চুয়িংগাম পাতাটার ওপর দিকে সেঁটে আটকে দিল হাইবেঞ্চের নীচে। নিখুঁত। বাঁ হাঁটু চেপে রেখেছে হাইবেঞ্চের সঙ্গে, ডান হাতে কলম চলছে রাজার। মিনিট দশেকের মধ্যে কলকাতা বন্দরের ক্রমাবনতি শেষ।

রাজা উঠে দাঁড়াল, একটু বাইরে যাব স্যার ?

—দাঁড়াও। দুজন গেছে, ওরা ফিরুক।

রাজা পলকে অসহিষ্ণু। সময় চলে যাচ্ছে। সময় চলে যাচ্ছে। মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরেছে একজন, রাজা আবার দাঁড়াল, স্যার, এবার যাই ?

ধূমপায়ীর আড্ডার তাল কেটে গেল যেন, বিরক্ত মুখে বললেন, এ তো মহা জ্বালালো দেখছি। যাও যাও।

রাজা গঙ্গাফড়িং-এর মতো উড়ে এল টয়লেটে। দ্রুত কাগজগুলোকে সাজিয়ে নিল পর পর। এই তো কত সহজ রাস্তা! মিছিমিছিই উদ্বেগে ভুগছিল সে! হাহ্। স্যাররা শুধু গল্প করুক। আলোর গতিতে সমস্ত উত্তর নেমে যাবে রাজার খাতায়।

চুয়িংগাম চিবোতে চিবোতে ফিরল রাজা। ধূমপায়ী টেরচা চোখে রাজাকে দেখে হাসলেন, কী হে, ফুটবল খেলছ নাকি ?

রাজা বোকা বোকা মুখ করল, কেন স্যার ?

—চুয়িংগাম চিবোচ্ছ তো। ভাবলাম দম ফম কমে গেছে। যাও, লেখো।

ঝটিকা গতিতে লিখছে রাজা। মূল খাতা শেষ। একটা লুজ শিট নিল। তৃতীয় গ্রুপের তিনটে প্রশ্ন হয়ে গেল। সময়ও তেজি ঘোড়ার মতো ছুটছে সঙ্গে। দ্বিতীয় ঘণ্টা ফুরিয়ে গেছে। দুটো দশ। দুটো কুড়ি। একদম শেষে ম্যাপ পয়েন্টিং করবে। তার আগে আরও তিনটে উত্তর লিখতেই হবে। লুজশিট নিল। সাঁই সাঁই এশিয়ার নদীগুলো সম্পর্কে বিবরণ টুকে ফেলছে। দুটো পঁয়ত্রিশ। এবার পর পর টীকা। অ্যান্টিপোডাল। ফেরেলস্ ল। আইসোথার্ম। আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতে এবার এসেছে রাজা। দুটো পঞ্চাশ। রাজা দিশেহারা। এখনও ম্যাপ পয়েন্টিং ধরা হয়নি। হঠাৎই কাঁধে প্রকাণ্ড এক থাবা। দশাসই কখন চিতাবাঘের পায়ে নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। রাজা চমকে তাকাতেই এক টানে ছিনিয়ে নিয়েছেন পাতা। তীক্ষ্ণ বল্লমের মতো কণ্ঠস্বর, এগুলো কী ?

রাজা ইলেক্ট্রিক শক খেয়েছে। নিমেষে সমস্ত স্নায়ু বিকল। দশাসই বুঝি হৃৎপিণ্ড খামচে ধরেছে তার।

—বাহ্ বাহ্! চুয়িংগাম দিয়ে পাতা আটকে টোকা! এই বয়সেই বেশ ওস্তাদ হয়েছ তো!

রাজা নিস্তেজ। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপছে, সরি স্যার। আর হবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

দশাসই গলা ওঠালেন, দেখুন রমেনবাবু, দেখে যান্। একেবারে প্রফেশনাল ক্রিমিনাল!

রাজার বন্ধুরা হাঁ করে দেখছে রাজাকে, রাজা মিনমিন করে তর্ক জুড়ল, এ-সব কথা বলছেন কেন স্যার ? কে ক্রিমিনাল ?

দশাসই হাইবেঞ্চ থেকে রাজার উত্তরপত্র তুলে নিলেন, যাও। বাড়ি যাও। মা বাবার অনেক আশা পূর্ণ করেছ, এবার ভালয় ভালয় বিদেয় হও।

রাজার ঘাড় আচমকাই ট্যারা, খাতা নেবেন না স্যার। খাতা দিয়ে দিন।

—একটা কথা নয়। মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাও। চুরি করে আবার গলা বাজানো হচ্ছে!

রাজা চকিতে বুনো ভেড়া। লাফিয়ে উঠে টান মেরেছে খাতায়।

ধূমপায়ী ছুটে এসেছেন সামনে, এ তো সাংঘাতিক ছেলে! কীসব ফ্যামিলি থেকে আসে এরা! বাড়িতে বাবা মা এই শিক্ষা দেয়!

রাজা ভাঙা ভাঙা গলায় গর্জে উঠল, মুখ সামলে কথা বলবেন। আপনি বাবা মা তুলে কথা বলছেন কেন ?

দশাসই ঘাড় ধরে সিট থেকে বার করেছে রাজাকে, খুব রোয়াব অ্যাঁ ? মস্তানি দেখানো হচ্ছে ? এই বয়সেই কী ফেরোশাস! চোখের দিকে তাকান, যেন দৃষ্টি দিয়ে খুন করে ফেলবে!

দুই শিক্ষকের হ্যাঁচকা টানে রাজা পৌঁছে গেছে দরজায়। সাগ্নিক কণাদ অয়নরা লেখা থামিয়ে দিয়েছে।

রাজা ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল। তার হিতাহিতজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত, বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, আপনার এত বড় সাহস আপনি আমার খাতা ছিনিয়ে নিলেন! আমার বাপ মা তুলে গালাগাল! আমি আপনাকে ছাড়ব না। আপনি স্কুল থেকে বেরোন একবার, দেখব কে আপনাকে বাঁচায়।

রাজার উন্মত্ত ভঙ্গি দেখে দুই শিক্ষকই স্তম্ভিত। দশাসই কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে সামলালেন নিজেকে, রমেনবাবু, এক্ষুনি ফাইনাল বেল পড়বে। আপনি খাতাগুলো কালেক্ট করুন। আমি এই ছোকরাকে দেখছি। ওর খাতাটা আমার হাতে দিন।

ধূমপায়ী বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যান। এরা সব হচ্ছে পোটেনশিয়াল সোসাল ডেঞ্জার। এদের অঙ্কুরেই নির্মূল করা দরকার। বেশি ঝামেলা করলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দিন।

রাজার হাত মুচড়ে ধরেছেন দশাসই। প্রাণপণ চেষ্টাতেও রাজা নিজেকে ছাড়াতে পারল না। অক্ষম ক্রোধে আরও অশ্রাব্য ভাষা বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে হেডস্যার নিজেই ছুটে আসছিলেন এদিকে। সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রের আরও দুএকজন লোক। বোর্ডের প্রতিনিধিও। রাজার হিস্টিরিক আচরণ দেখে তাঁদেরও চোখ কপালে।

রাজা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হেডমাস্টারের দেরি হল না। পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান হিসেবে রাজার বিরুদ্ধে লিখিত রিপোর্ট জমা দিলেন বোর্ডের প্রতিনিধির হাতে। রাজাকে পুলিশের হাতে দিলেন না বটে, তবে ছাড়লেনও না। নিজের ঘরে আটকে রাখলেন। এ বছরের মতো রাজার পরীক্ষার ইতি।

অয়ন সাগ্নিকদের মুখে খবর পেয়ে অনুরাধা যখন ছুটে এসেছে প্রধানশিক্ষকের ঘরে, তখন রাজার গর্জন থেমে গেছে। এককোণে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার মুখমণ্ডল টকটকে লাল, সেখানে কোনও কোমল মায়ার চিহ্নমাত্র নেই। থেকে থেকে বিশাল বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে, পরক্ষণে আগুনের হল্কার মতো নাকমুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ফুসফুসের বাতাস। দরদর করে ঘামছে রাজা।

অনুরাধার মুখে বাক্য সরছিল না। ছেলেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাপের বাড়ি জিরোতে যাচ্ছে কদিন। পরীক্ষা শেষের পর রাজাকে নিতে এসে তার আজ মূর্ছা যাওয়ার দশা। এমন দৃশ্য গভীর দুঃস্বপ্নেও অনুরাধা কল্পনা করতে পারেনি কখনও।

দরজায় রাজার অনেক সহপাঠী দাঁড়িয়ে, বেশ কয়েক জন অভিভাবকও উঁকি দিচ্ছে ঘরটায়। প্রধানশিক্ষক অনুরাধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মা?

মা শব্দটা এত ব্যঞ্জনাহীন! শুধুই যেন এক সম্পর্কবাচক ধ্বনি!

অনুরাধা কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল।

—আমি খুব দুঃখিত আপনার ছেলেকে আর এ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

অনুরাধা আবারও মাথা নাড়ল শুধু। কেন নাড়ল নিজেও জানে না। পরে বহু বার মনে হয়েছে ওই সময় তার আর্তনাদ করা উচিত ছিল। বুক চাপড়ে কান্নায় ফেটে পড়া উচিত ছিল। সেটাই হত তার স্বপ্নভঙ্গের প্রকৃত অভিব্যক্তি। কিন্তু সেসব সে কিছুই করল না, এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতার ভেতর হেঁটে গিয়ে হাত ধরল ছেলের।

প্রধানশিক্ষক বললেন, শুধু টোকাটুকি করলে আমরা খাতা কেড়ে ছেড়ে দিই। কিন্তু ও যা আচরণ করেছে ...! আমার খুব ভয় লাগছে ম্যাডাম। বি কেয়ারফুল অফ ইওর সান। কী করে যে এতটুকু বয়সে এরকম ...! এত হিংস্র ...! আই অ্যাম কম্পেলড্ টু সে, এ আপনাদেরই শিক্ষার দোষ।

এক রাশ কৌতূহলী চোখ ভেদ করে অনুরাধা ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে এল। গোটা পথ মা ছেলেতে একটা কথাও হয়নি। বাড়ি ফিরে অনুরাধা ফেটে পড়ল। কান্নায় নয়, ক্রোধে। অপমানে। সপাটে চড় কষাল ছেলের গালে, এত বখে গিয়েছিস তুই! আমাদের মান ইজ্জৎ সব এভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিলি! তোর মনে এই ছিল!

রাজা এক নিস্পন্দ আগ্নেয়গিরি।

অনুরাধা ছেলেকে ধাক্কা দিল, মরে যা তুই। তোর মুখ দেখতে চাই না

www.boiRboi.blogspot.com

আমি, মরে যা।

প্রতিভা হাঁ হাঁ করে ঘর থেকে ছুটে এসেছেন, হল কী অনু? ওরকম করছ কেন? রাজা কী পরীক্ষা খারাপ দিয়েছে আজ?

—জিজ্ঞেস করুন নাতিকে কী করেছে। অনুরাধা ছেলের শার্ট ধরে ঝাঁকাল, বল্। বল্। নিজের কীর্তির কথা বল্। কী হল? কথা ফুটছে না মুখে?

রাজা তবু নির্বাক। শুধু নাকের পাটা ফুলছে তার।

অনুরাধা প্রায় ডুকরে উঠল,—ও যা করেছে, আর কোনওদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব আমরা? আপনার ছেলে কোথাও মুখ দেখাতে পারবে? আমি কোথাও মুখ দেখাতে পারব? রাজার ওপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল অনুরাধা,—এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস তুই? দূর হয়ে যা সামনে থেকে। দূর হ। এই ছেলেকে পেটে ধরেছিলাম আমি?

রাজার ধৈর্যের বাঁধ এতক্ষণে ভেঙেছে। ঠেলে সরিয়ে দিল অনুরাধাকে। গলা ঘড়ঘড় করছে, লজ্জা করে না আমাকে গালাগাল করতে? আমার জন্য তোমরা মুখ দেখাতে পারবে না? নাকি তোমাদের জন্য আমি মুখ দেখাতে পারি না?

অনুরাধা আবার ঠাস করে চড় মারল, ফের মুখে মুখে কথা? দোষ করে কোথায় মাথা নিচু করে থাকবি...?

প্রচণ্ড উত্তাপে বিস্ফোরিত হল আগ্নেয়গিরি। বয়ঃসন্ধির ভাঙা গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমাকে দেখার আগে আয়নায় নিজেদের মুখ দ্যাখো।

অনুরাধা আবারও হাত তুলেছিল, রাজা মুচড়ে ধরেছে তার হাত, —খবরদার বলছি আমার গায়ে হাত তুলবে না। তোমরা নিজেরা কী? বাবা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘুষ খাচ্ছে, তুমি যত্ন করে সেই টাকা আলমারিতে গুছিয়ে রাখছ! ভাবছ আমি কিছু বুঝি না, অ্যাঁ? দুধের খোকা? বাবা কোথায় থাকে, কী করে বেড়ায়, সবই তো জানো তুমি! তারপরেও ছেলের গায়ে হাত তোলার স্পর্ধা হয় তোমার?

অনুরাধার দু চোখ বিস্ফারিত। এই রাজাকে সে দেখেনি কোনওদিন। কোনওরকমে অস্ফুটে বলল, কী বলতে চাস তুই?

—ন্যাকা সেজো না। তুমিও কম লোভী নও। বাবা যে একটা মুখোশ পরা নোংরা লোক, তুমিও জানো। তুমিই বাবাকে মদত দিয়েছ। তুমিই লোভে লোভে নোংরা রাস্তায় ঠেলেছ। অনুরাধার একদম কাছে এগিয়ে গেল রাজা, বাবা যে অফিসের নাম করে দুদিন জেল খেটে এল, বলো সে কথাও তুমি জানো না? কোথায় কোন মেয়েমানুষের কেসে ফেঁসেছিল, ...সবই তো জানো। জেনেশুনেও বাবার টাকা হাত পেতে নিতে তোমার কি কখনও হাত কেঁপেছে? তা হলে আমারই বা টুকতে গিয়ে হাত কাঁপবে কেন? ধরা পড়ে জুজুর ভয়ে কাঁপবই বা কোনও দুঃখে? অবিরাম লাভা উদ্গিরণ করে চলেছে রাজা। তরল লাভার স্রোত গলিয়ে দিচ্ছে কানের পর্দা। এখনও কেন

অনুরাধা বধির হল না ?

প্রতিভা রাজাকে জড়িয়ে ধরলেন। দু চোখ বেয়ে অসাড়ে অশ্রু নেমেছে তাঁর, শান্ত হ বাবা। বাবা মাকে কষ্ট দিতে নেই। তুই ছাড়া ওদের আর কে আছে বল ?

রাজা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল—আমার কেউ নেই। আমি কাউকে চাই না। আই হেট দেম। আই হেট বোথ অফ দেম।

চৈত্রদিনের সূর্য ক্ষয়ে আসছে ক্রমশ। পশ্চিমের জানলায় মরা হলুদ আলো। পাখিরা ফিরছে।

পাশের জুডো ক্লাব থেকে মহড়ার নিনাদ ভেসে এল। এক তালে হুঙ্কার তুলছে নবীন প্রজন্ম। হু হা। হুহ্ হা। হুহ্ হা।

রাজা বিবেকানন্দর ছবি আছড়ে আছড়ে ভাঙছিল।

চোদ্দ

চন্দনের অস্বস্তি হচ্ছিল। সাত্যকির ঘর ভর্তি লোক, সকলেই গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। ঘরময় ছড়ানো অসংখ্য চায়ের ভাঁড়। একজন একটা ইলেকটোরাল রোল ধরে পর পর নাম পড়ে চলেছে, দু তিনটে ছেলে ছোট ছোট স্লিপে লিখে নিচ্ছে সেই নাম আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক। চন্দন কি ভুল সময়ে এল ?

চন্দন আমতা আমতা করে বলল, তোমার তো অনেক দেরি হবে। আমি একটা জরুরি কাজে...। তুমি সেরে নাও, আমি ওয়েট করছি।

চন্দনের চোখেমুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। চুল উশকো খুশকো, গালে একদিনের না কামানো দাড়ি, পোশাক আশাকও তেমন সুবিন্যস্ত নয়। দেখলেই বোঝা যায় আজ সারাদিন চরকি মেরেছে সে, নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত পায়নি।

সাত্যকি চন্দনকে দেখে অবাক, তবে তার মুখচোখ সেভাবে লক্ষ করেনি। প্রায় স্বাভাবিক গলায় বলল, আর বলবেন না, সামনের রোববার ইলেকশান, লাস্ট মিনিটের কাজকর্ম চলছে।

—ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বসছি।

—পাঁচ মিনিট প্লিজ। পোলিং এজেন্টদের নামের লিস্ট এসেছে, একবার চোখ বুলিয়ে নিই। আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন না। বাবা পরশু ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরেছে, বাবার সঙ্গে...সাত্যকি একটু হোঁচট খেল, আপনি অবশ্য এখানেও বসতে পারেন। এমন কিছু সিক্রেট কাজ হচ্ছে না।

বুকের ভেতর উথাল পাথাল ঢেউ, তাও চন্দন সেকেন্ডের জন্য বিরক্ত। লাজু ঘর ছেড়ে চলে গেছে, সাত্যকির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই! একবার শুধু লাজুর বাপের বাড়িতে খবর দিয়েই ঝাড়া হাতপা! দিব্যি এক পাল চেলা

www.boiRboi.blogspot.com

জুটিয়ে রাজনীতির ছক কাটতে বসেছে, এত উদাসীন!

চন্দন বসেও উঠে দাঁড়াল, তুমি কাজ সারো, আমি ভেতরেই যাচ্ছি।

ইন্দুভূষণ খাটে বসে পেশেন্স খেলছিলেন, চন্দনকে দেখে বললেন, —ভালই হল তুমি এসে গেছ। আমিই তোমাদের বাড়ি যাব ভাবছিলাম। বেয়ানের এখন শরীর কেমন ?

—বেটার। চন্দন কথার পিঠে কথা জুড়ল, —আপনার ব্যাঙ্গালোর কেমন লাগল ?

—ভাল। বেশ ভাল। শহরটা সুন্দর। পরিচ্ছন্ন। ছিমছাম।

—খুব বেড়ালেন ?

—আর বেড়ানো! ইন্দুভূষণ দুম করে প্রসঙ্গ বদলালেন, কদিনের জন্য গেছি, তার মধ্যে সব তছনছ হয়ে গেল! কেন এরকম হল বলো তো চন্দন ?

কখন কোথায় কিভাবে যে সংসার তছনছ হয়ে যায়!

বর্ষশেষের অভিশপ্ত রাতে শীলা সেনের ফ্ল্যাটে মৌজ করে মাছভাজা চাখছিল চন্দন। তখন কি সে একবারও ভেবেছিল কত দূর গড়াতে পারে ঘটনাটা! সব চাপা পড়ে যাওয়ার পরও!

নাকি চাপা পড়েনি! ভেতরে ভেতরে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল রাতটা! চন্দন দেখতে পায়নি, বুঝতে পারেনি, হঠাৎই জ্বলে উঠল জতুগৃহ!

নিচু গলায় চন্দন বলল, আপনি বয়ঃবৃদ্ধ মানুষ, আপনাকে আর কী বলব! দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক, বুঝদার। তারা যদি একসঙ্গে থাকতে না চায়...

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন। কেন তারা থাকতে চায় না ? ইন্দুভূষণ দুহাতে তাসগুলোকে জড়ো করলেন, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো।

ছোট ঘর জুড়ে সাবেকি আমলের বিশাল খাট। কাঠের আলমারি, আলনা, তিন আর্শিঅলা নীলিমার ঢাউস ড্রেসিংটেবিল অনেকটাই জুড়ে আছে ঘরের, হাঁটা চলার জায়গা খুব কম।

চন্দন উঁচু খাটের এক ধারে বসল। ইন্দুভূষণ প্যাকেটে ভরে তাস সরিয়ে রাখলেন, তুমি তো নিশ্চয়ই অফিস থেকে ফিরছ ? খাবে কিছু ? চা টা ?

—না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—বউমা নেই, পঙ্কজ নেই, তুমি বুঝি ভাবছ আমার অসুবিধে হবে ? চিন্তা করো না, নতুন কাজের লোক আছে। বৃদ্ধের গলা অভিমানে থরথর, বউমা আমাকেও তো একটা চিঠি লিখতে পারত। হ্যাঁ, আমি বোকাসোকা মানুষ, সংসারের মারপ্যাঁচ বুঝি না, আজীবন দশটা পাঁচটা অফিস করে গেছি, একটু আধটু তাস দাবা খেলেছি, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মেরেছি, বাজারহাট করা ছাড়া সংসারের কোনও ঝঞ্ঝাটেই ঢুকিনি কোনওদিন। সবই ঠিক। গিন্নি এই নিয়ে কত চোটপাট করেছে, দুঃখ করেছে, তবু নিজেকে বদলাতে পারিনি। কিন্তু বাবা, যতই সরে সরে থাকি, আমি কি আমার ছেলেকে চিনি না ? নাকি আমার বউমাকে চিনি না ?

একসঙ্গে থাকলেই কি চেনা যায়! রাজাকে কতটুকু চিনেছিল চন্দন? তার বিশ্বাস ছিল ঝকঝকে ইস্পাতের মত গড়ে উঠছে রাজা। মরচেহীন। কলঙ্কহীন।

ইন্দুভূষণ সোজাসুজি চন্দনের দিকে তাকালেন, তুমিই বলো সাত্যকি আমার ছেলে খারাপ? নেশাভাঙ করে না, বদ দোষ নেই, রোজগারপাতি ভাল, সংসারের ওপর টান আছে। বড়দের ভক্তিশ্রদ্ধা করে। উঁচু গলায় কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আজকালকার দিনে এমন ছেলে তুমি কটা পাবে? আবার বউমাও আমার ধীর-স্থির, বুদ্ধিমতী। সংসারের লক্ষ্মী হয়ে মাথায় করে রেখেছিল সংসারটাকে, আমাকে কোনওদিন চা পর্যন্ত চেয়ে খেতে হয়নি। অত যে খুঁতখুঁতে শাশুড়ি সেও মৃত্যু পর্যন্ত বউমা বলতে অজ্ঞান ছিল। ওরকম মেয়েই বা কটা আছে দুনিয়ায়? তা হলে কেন দুটো ভাল মানুষ জোড় বেঁধে থাকতে পারবে না?

ভাল মন্দের সংজ্ঞা এত সরল! তা হলে চন্দন কী? সে তার বউকে ভালবাসে, ছেলেকে ভালবাসে, মাকে ভালবাসে, বোনকে ভালবাসে, সংসারের প্রতি তারও টান কম নয়, কর্তব্যে ত্রুটি করে না, বরং বেশি কর্তব্যপরায়ণ। ভাতের বদলে সে বিরিয়ানির সুখ কিনে দিতে চেয়েছে। সব্বাইকেই। অথচ সে আজ ছেলের চোখে নর্দমার পোকা। আর অনুরাধার চোখে শুধুই এক ইন্দ্রিয়সর্বস্ব ক্রিমি কীট।

কাল রাতে অনুরাধার চোখে কী নিষ্ঠুর জল্লাদের দৃষ্টি দেখেছে চন্দন! ঘাড় নিচু করে চন্দন আত্মসমর্পণ করেছে, হাঁটু গেড়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছে, তবু চন্দনের সমস্ত পাপের অংশীদার একটি মাত্র গোপন অপরাধের জন্য ক্ষমাহীন।

চন্দন তেতো মুখে হাসল, লাজু বলে ওদের আদর্শ মিলছে না। তাই ওরা একসঙ্গে থাকবে না।

আদর্শ শব্দটাকে বিড়বিড় করে বার কয়েক উচ্চারণ করলেন ইন্দুভূষণ, আদর্শ না মেলার জন্য কেউ স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়! স্বামী যা করবে, স্ত্রী তার সঙ্গিনী হবে, তাকে উৎসাহ দেবে, সেটাই তো মেয়েদের আদর্শ!

চন্দনের রক্তস্রোত দ্রুত হল। সেও তো তাই জানে। অনুরাধাও। তবে কেন রাজার এই পরিণতি?

সাত্যকি ঘরে ঢুকেছে। সরি চন্দনদা, লেট হয়ে গেল।

চন্দন আড়চোখে ইন্দুভূষণকে দেখল, তোমার বাইরের ঘরের সবাই চলে গেছে?

—হ্যাঁ। চলুন ও ঘরে গিয়ে বসা যাক।

বাইরের ঘরে এসে চন্দন সিগারেট ধরাল। সাত্যকির সঙ্গে কিভাবে কথা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না। কতটুকু বলবে, কতটুকুই বা গোপন রাখবে?

সাত্যকিই কথা শুরু করেছে, আপনার সঙ্গে আমার আগেই যোগাযোগ করা

www.boiRboi.blogspot.com

উচিত ছিল। বিলিভ মি, একদম সময় পাচ্ছি না।

চন্দন সাত্যকিকে সিগারেট এগিয়ে দিল। সাত্যকি সঙ্গে সঙ্গে চন্দনের হাত চেপে ধরেছে, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে চন্দনদা। আমি কথাটা লাজুকে বলতে চাইনি, রাগের মাথায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আপনি আমার ওপর খুউব রেগে আছেন, না?

সত্যিই সাত্যকির কাছে আসায় অনীহা ছিল চন্দনের। তবু কেন যে চরম উৎকণ্ঠার মুহূর্তে সাত্যকিরই দ্বারস্থ হল! এ যেন বিধি নির্ধারিত প্রথা।

চন্দনদের জন্য সাত্যকি! সাত্যকিদের জন্য চন্দন!

চন্দন সাত্যকির কাঁধে চাপ দিল, ছাড়ো। বাদ দাও। আমি তোমার কাছে অন্য কাজে এসেছি।

—না চন্দনদা, বাদ দেওয়া যায় না। সাত্যকি সিগারেট ধরিয়ে ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। ধরা-ধরা গলায় বলল, আমি একটা স্কাউনড্রেল। লাজুর সঙ্গে আমি যে ব্যবহারটা করেছি... আমি জানি লাজু আমাকে কখনই ক্ষমা করবে না।

অন্য সময় হলে চন্দন হয়ত দুর্বল হয়ে পড়ত, আজ সাত্যকির আবেগ ছুঁল না চন্দনকে। পলকা স্তোকবাক্য শোনাল তবু, —একটু সময় যেতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হুঁহ্। সময়! জানেন লাজু আমার সঙ্গে মিউচুয়াল সেপারেশন চায়? এর মধ্যেই!

—লাজুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—দুদিন ওর বন্ধু কৃষ্ণার বাড়ি গেছি। হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়েছি। এক গোঁ, তুমি নোংরা পলিটিক্স ছেড়ে দাও, ব্যবসাপাতি ছেড়ে দাও, আমরা আবার আগের জীবনে ফিরে যাব। আপনিই বলুন, এ কি আর হয়?

নিজের কথা বলার জন্য ছটফট করছে চন্দন, তবু আনমনে বলে ফেলল, হয় না, না?

—সত্যিই হয় না। যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে আবার কেন ফিরব? কাল একটা আদর্শ সত্যি মনে হত, তার পেছনে তাই ছুটেছি। আজ দেখছি সেটা ধ্রুব সত্য নয়, ওই আদর্শের মধ্যেও বহু গলদ আছে। আমি কেন মূর্খর মতো ফাঁপা আদর্শ আঁকড়ে ধরে বসে থাকব? পার্টি আমি আজ হোক কাল হোক ছেড়েই দেব। কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে যাব, ব্যস। যে কানেকশানগুলো ওই আদর্শের জন্যই আমি পেয়েছি, সেগুলোকে কেন ছাড়ব! এত দেশবিদেশের ইনভেস্টমেন্ট হবে, কিছুই আমাদের ভাগ্যে জুটবে না! সাত্যকি সামান্য দম নিল, ইলেকশানের পর আমি আর কাজল আরেকটা বিজনেস শুরু করছি। ফরেন কোলাবরেশনে। সাউথ চব্বিশ পরগনায় আমাদের পার্টির লোকজন কিছু ভেড়ি কনট্রোল করে, আমরা কয়েকটা ভেড়ি লিজ নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। প্রন কালচার করব। প্রন এক্সপোর্ট করব।

কোটি টাকার ব্যবসা। এ-সব ছেড়ে দেব আমি ? আপনার বোনটা এত বোকা কেন চন্দনদা ?

—যা ভাল বোঝ করো। সাত্যকির বকবকানিতে মাথা ধরে যাচ্ছে চন্দনের, তুমি আমার দরকারটা শুনবে ?

সাত্যকি থমকাল।

—আমার একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই। তোমার বোর্ড অফিসে কোনও জানাশুনো আছে ?

—কোন্ বোর্ড ?

—মাধ্যমিকের বোর্ড। বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান। কী আর বলব তোমাকে ! চন্দন ঢোক গিলল, রাজাকে পরীক্ষার হল থেকে এক্সপেল করে দিয়েছে।

—কেন ? কবে ? যাহ ! আপনি কী বলছেন চন্দনদা ! কী করেছিল রাজা ?

রাজা-অনুরাধার বিকারগ্রস্ত রূপটা এড়িয়ে গেল চন্দন, শুধু ঘটনার রক্তমাংসহীন কাঠামোটা বলল সাত্যকিকে।

সাত্যকি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ, একটা সিগারেট নিভিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল, আপনি নিজে একবার এগজামিনেশান সেন্টারে গিয়েছিলেন ?

—আজ গেছিলাম। সেখান থেকেই সোজা আসছি। ওরা বলল এক্সপেলড ছাত্রের খাতা আলাদা প্যাকেটে সিলড হয়ে বোর্ড অফিসে চলে গেছে। ওদের রিপোর্ট সুদ্ধ। এখন নাকি ওদের আর কিছু করার নেই। করতে পারলে একমাত্র বোর্ডের অফিস থেকেই...

সাত্যকি দু-এক পল ভাবল, তারপর বলল, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমার বোর্ডের অফিসে কোনও জানাশোনা নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের পার্টির একটা নেটওয়ার্ক আছে, সুবলদা আছেন এডুকেশান সেলে, আমি একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। কী করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে বলুন তো।

পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান চন্দনকে কোনও আশা দেননি। তিনি বলেছেন, রেজাল্ট বেরনোর সময় রাজার রোলের পাশে আর এ লেখা থাকবে। বোর্ড অফিসে যেতে হবে রাজাকে। যদি রাজার উত্তরে তাঁরা সন্তুষ্ট হন, তা হলে শুধু এ বছরটাই নষ্ট হবে রাজার, তেমন কিছু ঘটলে আরও দু-এক বছর নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। যে শিক্ষক রাজাকে পরীক্ষাহলে ধরেছিলেন তাঁর সঙ্গেও কথা হয়েছে চন্দনের। চন্দনের কাতর দশা দেখে তিনিও ব্যথিত, তিনিই চন্দনকে বোর্ড অফিসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে তেমন তেমন লোককে ধরতে পারলে কত কিছুই ওলোটপালট হয়ে যায় আজকাল, এ তো সামান্য একটা এক্সপালশান !

চন্দন দ্বিধা কাটিয়ে স্পষ্ট করে বলল, ভেতর থেকে স্কুলের রিপোর্টটা হাওয়া করে দিতে হবে। বুঝতেই পারছ, রাজার শুধু একটা বছর নষ্টই না,

www.boiRboi.blogspot.com

সারাজীবনের মতো ব্ল্যাক স্পট !...

—ঠিক আছে দেখি।

—দেখি নয়, আই ওয়ান্ট ইট টু বি ডান। প্লিইজ। যেভাবে হোক, যত টাকা লাগুক, তুমি রাজার কেসটা ক্লিয়ার করে দাও।

—টাকাপয়সার ব্যাপার নয়। আগে সুবলদাকে বলি, তিনি কী বলেন শুনি... লাখ লাখ ছেলের ভিড় থেকে একটা খাতা খুঁজে বার করে ম্যানেজ করা... সব কিছু কি টাকা দিয়ে হয় !

—আলবাত হয়। আমার অফিসে যারা চোর ধরার জন্য বসে রয়েছে তারা টাকা খেয়ে এনকোয়ারি রিপোর্ট উল্টে দিচ্ছে, আর এটা তো লাখ লাখ ছেলের ভিড় থেকে একটা সিঙ্গল কেস !

চন্দন নতুন করে উত্তেজিত বোধ করছিল। একটা লিঙ্ক যখন পাওয়া গেছে, তখন কেসটা ঠিক বার করে আনতে পারবে সাত্যকি।

হঠাৎ দমকা হাওয়া উঠেছে বাইরে। চৈত্রের ধুলোর ঝড়। একটা ধুলোর কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে ছুটে এল ঘরে। সঙ্গে দুটো শুকনো পাতা।

সাত্যকি দৌড়ে জানালা বন্ধ করল। তার আগেই দু জোড়া চোখ ঢুকে পড়েছে ঘরের বাতাসে। ভাসছে। দুলছে। কিন্তু নিষ্পলক। ওই দৃষ্টিতে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই।

চন্দনের গা ছমছম।

ওই দৃষ্টি চন্দন মুছে দেবেই। তার জন্য সর্বস্ব খুইয়ে তাকে যদি রাস্তার ভিখিরিও হয়ে যেতে হয়, তাও প্রস্তুত সে। মানুষ সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু প্রিয়জনদের ঘৃণা নিয়ে বাঁচা যে কী দুঃসহ !

রাজাকে উদ্ধার করলেই একমাত্র দায়মুক্ত হতে পারে চন্দন। একটা অসতর্ক পাপের গ্লানি থেকেও মুক্তি। পাপ, নাকি ভুল ? ভুলের প্রায়শ্চিত্ত !

চন্দন সাত্যকির হাত চেপে ধরল, আমাকে তুমি আর একটাবার বাঁচাও ভাই। আমি কথা দিচ্ছি লাজুকে তোমায় ফিরিয়ে দেবই। ওয়ার্ড অফ অনার।

—সম্পর্ক নিয়ে কি বারগেন চলে চন্দনদা ? সাত্যকি তার আবেগহীন চেহারায় ফিরে এসেছে। নিরাসক্ত গলায় বলল, আমি লাজুকে ভালবাসি চন্দনদা। এই ভালবাসাটাই আমার জীবনের একমাত্র সত্যি। আমি এও জানি, লাজুও আমাকে ভালবাসে।

—তা হলে তো ঝামেলা মিটেই গেল।

—উঁহু। সমস্যা তো অন্য জায়গায়। আমাদের মাঝখানে ঘষা কাচের পর্দা উঠে গেছে। একদিকে আমার অ্যাম্বিশান, অন্যদিকে লাজুর আদর্শ। এখন দেখতে হবে কে ঠিক ! আমি মনে করি আমি ঠিক, লাজু মনে করে লাজু। আমাদের মধ্যে যদি কেউ বুঝতে পারে সে ভুল, সে অন্যের কাছে ফিরে যাবে। আর আমরা যদি দুজনেই ঠিক হই, তা হলে আমাদের রাস্তা আলাদা

থাকাই ভাল। অ্যাম আই ক্লিয়ার ?

চন্দন চুপ। এই মুহূর্তে সাত্যকিকে ঠিক বুঝতে পারছে না সে।

সাত্যকি আরেকটা সিগারেট ধরাল, চন্দনদা, আপনার রুদ্রকে মনে আছে ?

—কে রুদ্র ?

—রুদ্র দাশগুপ্ত। স্যারের সব থেকে প্রিয় ছাত্র !

—ও এখন এম পির দিকে কোথাও থাকে না ? লাজুর সঙ্গে খুব খাতির ছিল। চন্দনের চোখ ছোট হল, রুদ্রকে নিয়েই কি তোমাদের গণ্ডগোল ?

—আপনি যেরকম ভাবছেন, সেরকম নয়। সাত্যকি বিষণ্ণ হাসল, রুদ্র সর্বস্ব ত্যাগ করে লেবারদের নিয়ে পড়ে আছে। ওনলি ফর আইডিয়ালস। আপনার বোনের প্রবলেম হল ও আমাকেও চায়, আবার আমার মধ্যে রুদ্রকেও চায়। কিন্তু আমি তো আমিই, আমি কি করে একসঙ্গে দুটো মানুষ হব ? তা ছাড়া সাত্যকি রুদ্র দুটো একসঙ্গে হওয়াও যায় না। সাত্যকির মধ্যে রুদ্র ঢুকে পড়লে বড় যন্ত্রণা হয় চন্দনদা।

চন্দনের মধ্যে অদ্রিনাথের ছেলে ঢুকে পড়লে চন্দনেরও যে কষ্ট ! এই কষ্ট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় নিজেকে শুধুই চন্দন করে রাখা। গড্ডলিকার ভেড়া হয়ে।

সাত্যকি আত্মগতভাবে বলল, আমি যে চাকরির কথা বললাম, লাজু সে চাকরি নিল না। ভাল কথা। নিজে চাকরি জোগাড় করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে ! আরও ভাল।

চন্দন বিড়বিড় করে বলল, তোমরা যেভাবে থেকে শান্তি পাও, সুখী হও...

—সুখশান্তির কথা বলবেন না চন্দনদা। সাত্যকি অকস্মাৎ উত্তেজিত, ওই শব্দ দুটো মানুষের জন্য নয়, বোধবুদ্ধিহীন পশুদের জন্য। সুখ মানে হল থেমে যাওয়া। শান্তি মানে হল জড়তা। ওসব কি মানুষকে মানায় ?

চন্দন সাত্যকিকে দেখে ভয় পাচ্ছিল। তোতলা গলায় বলল, তুমি.... তুমি... তুমি রাজার জন্য চেষ্টা করবে তো ভাই ?

—করব। অবশ্যই করব। আমি লাজুকে দেখিয়ে দেব ক্ষমতা মানুষের উপকারে লাগে কি না। সাত্যকি নিশ্বাস চাপল। লাজু সত্যিই বোকা।

চন্দন মনশ্চক্ষে অনুরাধাদের দেখতে পাচ্ছে। অনুরাধার চোখে আর ঘৃণা নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে কৃতজ্ঞতা। রাজার শক্ত চোয়াল আবার নরম। মায়াবী। প্রতিভার চোখেও জল।

পনেরো

লাফিয়ে লাফিয়ে জ্বর বাড়ছে রাজার। সন্ধে সাতটায় একশো এক ছিল, রাত নটায় দুই, সাড়ে দশটায় থার্মোমিটারের পারা একশো চার ছুঁই ছুঁই।

উদভ্রান্ত অনুরাধা ছেলের মুখের ওপর ঝুঁকল, কী হয়েছে বাবা ? কী কষ্ট

www.boiRboi.blogspot.com

হচ্ছে ?

গলা অবধি কাঁথা ঢাকা রাজা নিঃসাড়। তার মুখমণ্ডল চিতার আগুনের মতো রক্তিম। জবা ফুলের মতো লাল চোখ মাঝে মাঝে খুলে যাচ্ছে। ধূসর কালো মণি ভাষাহীন। তপ্ত নিশ্বাসের ঝলক পুড়িয়ে দিল অনুরাধার গাল।

অনুরাধা ছেলের বুকে হাত বোলালো, জল তেষ্টা পেয়েছে ? জল খাবি ?

রাজা সজোরে দু দিকে মাথা নাড়ল। চোখ বন্ধ রেখেই।

অনুরাধার বুক ধকধক। এ কি বিদ্রোহ রাজার ! রাজাকে ছাড়া অনুরাধা বাঁচবে কী করে !

সন্ধেবেলা প্রতিভা বলছিলেন, এত উতলা হয়ে পড়ছ কেন অনু ? ছেলেটা এত বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে, ওকে একটু থিতু হতে দাও।

থিতু হওয়া মানে কি প্রমত্ত জ্বর ? অনুরাধা আইসব্যাগ চেপে ধরল ছেলের মাথায়। এক হাতে ব্যাগ ধরে অন্য হাতে ছেলের কপাল থেকে চুল সরাচ্ছে।

প্রতিভা বললেন, ব্যাগটা আমি ধরছি দাও, তুমি বরং বালতি করে জল নিয়ে এসো। আবার মাথা ধোওয়াতে হবে।

কাল সন্ধেবেলা রাজা ঘর বন্ধ করেছিল, প্রতিভার হাজার ডাকাডাকিতেও দরজা খোলেনি সারা রাত। অনুরাধা তখন ছেলের কথা ভুলে গেছে, রাগে ক্ষোভে সে তখন উন্মত্তপ্রায়। চন্দনকে জর্জরিত করেছে আঘাতে আঘাতে, নিজেও ক্ষতবিক্ষত ক্রমশ।

ধীরে ধীরে অনুরাধার রাগটাও কেমন ঝিমিয়ে এল। তীব্র অভিমানে আচ্ছন্ন হল মন। আঠেরো বছর ঘর করার পর কোনও স্ত্রী যদি শোনে তার ভদ্রলোক স্বামী শরীরের খিদে মেটাতে মেয়েমানুষের বাড়ি যায়, হয়তো বা নিয়মিতই, এবং রাস্তার মেয়ের সঙ্গে ফুর্তি মারতে গিয়ে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে, তখন সেই স্ত্রীর মনের অবস্থা কী যে হয় ! আর সেই কীর্তির কথা অনুরাধাকে শুনতে হল কিনা রাজার মুখ থেকে !

রাজা আঙুল তুলছিল অনুরাধার দিকে, তুমিও দায়ী। তুমিও কম লোভী নও !

মাগোঃ, অনুরাধা কেন আগেই মরে গেল না !

মগে করে রাজার মাথায় জল ঢালছেন প্রতিভা, অনুরাধা মৃদু চাপড় দিচ্ছে ছেলের মাথায়, চুল মাথা ভিজিয়ে জল পড়ছে বালতিতে।

বাইরে খুব আস্তে বেল বাজল। চন্দন।

প্রতিভা বললেন, তুমি ভাল করে মাথাটা মুছিয়ে দাও, আমি দেখছি।

মা-ছেলেতে বাইরের ঘরে কী কথা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছিল না অনুরাধা। চন্দন একবার দরজায় এসে দাঁড়াল। এক্ষুনি যেন কাঁপা গলায় ডাকবে, হাই প্রিন্স ! ডাকল না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

কাল সারা রাত সোফায় নিথর বসেছিল চন্দন, প্রতিভার ঘরের দরজাও বন্ধ হয়নি রাতভর। অনুরাধা তার নিজের ঘরের অন্ধকারে জাগছিল। ক্রমে ক্রমে

অভিমানও কেমন মরে এল তার। হঠাৎই এক তীব্র আতঙ্কে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। বন্ধ ঘরে রাজা কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলল না তো!

—রাজা, দরজা খোল্।

রাজার সাড়া নেই।

—লক্ষ্মীটি দরজা খোল্, আমাকে আর কষ্ট দিস না বাবা।

রাজা তবু নিঝুম।

অনুরাধা দিশেহারা। দিগবিদিকজ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করছে, খোল্ বলছি, নইলে কিন্তু এবার দরজা ভেঙে ফেলব।

প্রতিভা মিনতি করলেন,—রাজা, আমাকেও তুই দরজা খুলে দিবি না?

বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর সত্যিই চন্দন দরজা ভাঙতে উদ্যত, রাজা থমথমে মুখে ছিটকিনি নামিয়েছে। অনুরাধা পাগলের মতো জড়িয়ে ধরেছিল ছেলেকে। রাজা কাঠের মতো শক্ত, মায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। সারাদিন ওঠেনি, স্নান খাওয়াদাওয়াও করেনি, তারপর বিকেল থেকে এই বিপত্তি।

রাজার চোখে লাগবে বলে বড় আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে। নীলাভ রাতবাতি জ্বলা ঘরে এখন অপ্রাকৃত আলোছায়া। সিলিংফ্যান খুব ধীর লয়ে বাতাস ছড়াচ্ছে। মৃদু বাতাসে রাজার টেবিলের বইখাতারা টলমল। দেওয়ালে বিবেকানন্দর ফাঁকা জায়গা আলোআঁধারেও কী প্রকট!

প্রতিভা আবার এসে বসেছেন রাজার পাশে, রাজার কপালে আইসব্যাগ ছোঁয়াচ্ছেন আলতো করে। অনুরাধা বাথরুমে বালতি রাখতে গেল। প্রচণ্ড মাথা ধরে আছে। কল খুলে মুখচোখে জল ছিটোল খানিকটা। নরম ভারী তোয়ালে চেপেছে মুখে। হঠাৎই বেসিনের আয়নায় চোখ পড়ল। দর্পণে এ কার মুখ? কোন্ অনুরাধা বিম্বিত হয়েছে আয়নায়? কে এ?

খুব ছোটবেলায় অনুরাধা একবার হারিয়ে গিয়েছিল। বেশি দূরে নয়, গড়িয়াহাটের মোড়ে। মার সঙ্গে দোকানে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে ছিটকে গেল! ছোট্ট মেয়ে সিঁটিয়ে গেছে ভয়ে, এলোপাথাড়ি ছুটে মরছে একা। মাকে খুঁজছে। একসময় ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল।

অচেনা এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসেছিলেন, কাঁদছ কেন খুকি?

—আমি হারিয়ে গেছি। অনুরাধা নাক টানল, —অনুরাধা হারিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ মজা পেয়েছিলেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু অনুরাধা কে?

সত্যিই তো অনুরাধা কে?

চন্দনের স্ত্রী? স্বামীর গরবে গরবিনী এক নির্বোধ রমণী মাত্র?

নাকি রাজার মা? ছেলের সাফল্যের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা এক মূর্খ নারী?

নাকি প্রতিভা অদ্রিনাথের পুত্রবধূ? অর্থহীন কর্তৃত্বের দাপটে উজ্জ্বল হতে চেয়েও মলিন এক স্ত্রীলোক?

নাকি লাজুর বউদি? অকারণ ঈর্ষায় পীড়িত নিছক এক মানবী?

www.boiRboi.blogspot.com

নাকি এর বাইরেও অন্য অনুরাধা আছে? হয়তো ওই আয়নায়?

অনুরাধা জানে না।

চন্দন ডাক্তার নিয়ে এসেছে। অনুরাধা ত্বরিত পায়ে ছেলের ঘরে ফিরল।

বড় আলো জ্বলেছে। ফ্যাটফ্যাটে টিউবলাইটের আলোতে বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে রাজাকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জ্বরেই।

ডাক্তার বললেন, হাঁ করো। হাঁ করো। জিভ দেখাও।

রাজা অল্প মুখ ফাঁক করল।

টর্চ জ্বেলে রাজার মুখ চোখ দেখলেন ডাক্তার, নাড়ি টিপলেন, স্টেথো ধরলেন বুকে পিঠে, —পালস বিট একটু ইর‍্যাটিক আছে। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, তিনদিন খাওয়ান। জ্বর ছাড়লেও অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স পুরো করবেন। এখন একটা পাইরাজেসিক খাইয়ে দিন, জ্বর নেমে যাবে। যদি তিনদিনের মধ্যে পুরো রেমিশান না হয়, তা হলে ব্লাড টেস্ট করতে হবে। বাঁধাধরা গতে ডাক্তারি বুলি আউড়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, ঘরের জানলা সব বন্ধ করে রেখেছেন কেন? খুলে দিন। পাখা ফুলস্পিডে ঘুরুক। কাঁথাও সরিয়ে দিন গা থেকে। শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যাক।

বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে চরাচর। চাঁদ এখন অস্তগামী। এবার নিকষ আঁধারে তলিয়ে যাবে পৃথিবী। তারপর আলো ফুটবে। ধীরে, অতি ধীরে। দিন রাত্রির সন্ধিক্ষণ এখন।

ওষুধ খেয়ে জ্বর নেমেছে রাজার। অনুরাধা থার্মোমিটার দেখল। একশো এক।

রাজা ঘুমোচ্ছে। প্রতিভা চলে গেছেন ঘরে। দীর্ঘক্ষণ পর অনুরাধা ছেলেকে ছেড়ে বাইরের ঘরে এসে বসল। সামনের সোফায় আধশোয়া চন্দনের চোখেও তন্দ্রার ঘোর। অনুরাধার শব্দ পেয়ে চমকে উঠে বসল সে। তার পরনে এখনও কালকের প্যান্টশার্ট।

চন্দন কয়েক সেকেন্ড নিষ্পলক তাকিয়ে রইল অনুরাধার দিকে। অনুরাধা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

চন্দন নিচু স্বরে বলল, চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শুনেও না শোনার ভান করল অনুরাধা। কী ঠিক হয়ে যাবে? রাজা আবার শ্রদ্ধা করবে বাবা মাকে? অনুরাধা চন্দনের সম্পর্কে ফিরে আসবে পুরনো বিশ্বাস?

চন্দন নত মুখে বলল, আমার কথা শোনো অনু, সব ঠিক হয়ে যাবে। সময় সবই ভুলিয়ে দেয়।

অনুরাধা এতটুকু সান্ত্বনা পেল না। কত দিন, কত মাস, কত বছর সময় লাগে এমন গ্লানি মুছতে?

—জানি আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারছ না। কিন্তু আমি কী নিয়ে বাঁচব